প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রচ্ছদপট :
আলোকচিত্র : সুনীল নন্দী
অঙ্কন : শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

অন্যান্য আলোকচিত্র :
সুনীল নন্দী
গৌর চন্দ্র
ও
ইন্‌টুর‍্যর-এর সৌজন্যে

মানচিত্র : অর্ধেন্দু দত্তের সৌজন্যে

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

অমরতীর্থের অমরযাত্রী
শ্রীকালিদাস রায় গোষ্ঠীপতি
ও
শ্রীমতী সুজাতা রায় গোষ্ঠীপতির
অমর স্মৃতির উদ্দেশে—
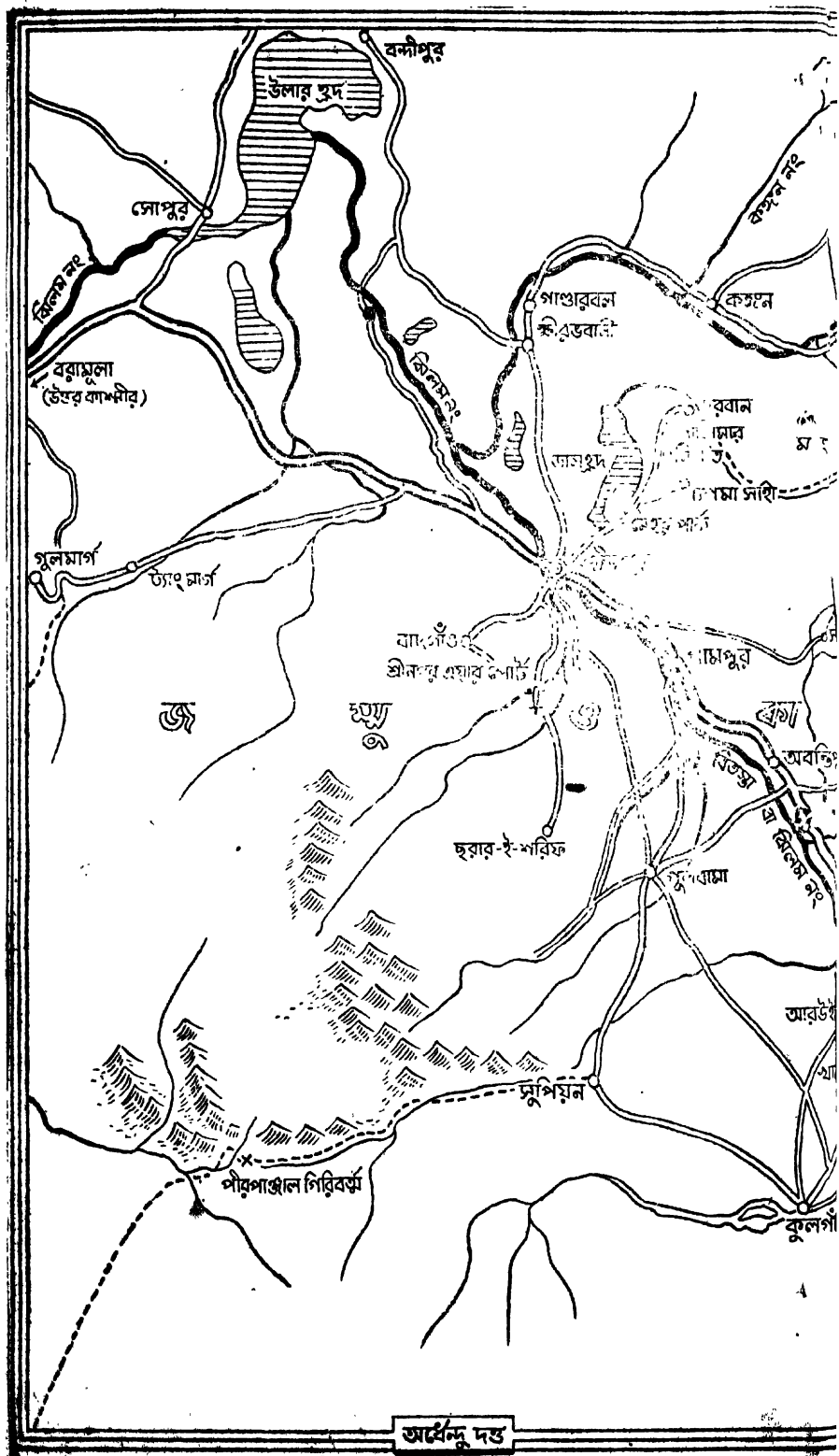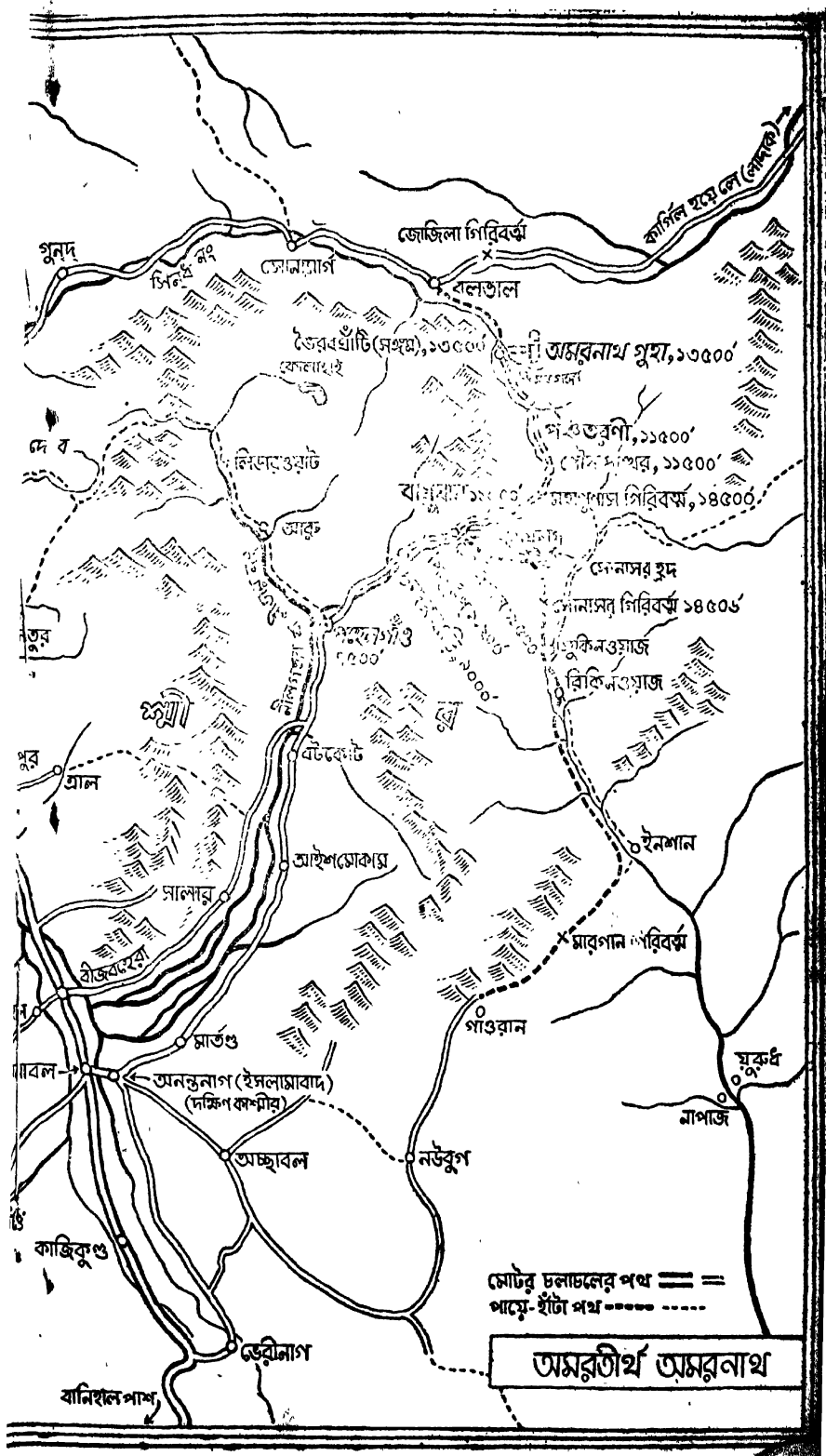
AMARTIRTHA AMARNATH

A Bengali Travelogue

on

Pahalgam & the Holy Cave Amarnath of Kashmir

by

Soncu Moharaj

হিমালয়ের ওপরে রচিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

নীল-দুর্গম

পঞ্চপ্রয়াগ

গহন-গিরি-কন্দরে

গিরি-কান্তার

তমসার তীরে তীরে

মানালীর মালঞ্চে

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে

হিমতীর্থ-হিমাচল

লীলাভূমি-লাহুল

গঙ্গা-যমুনার দেশে

অমরতীর্থ অমরনাথ

শেষনাগ

পঞ্চতরণী

অমরনাথের পথে হিমবাহ

সঙ্গম (ভৈরবঘাটি)
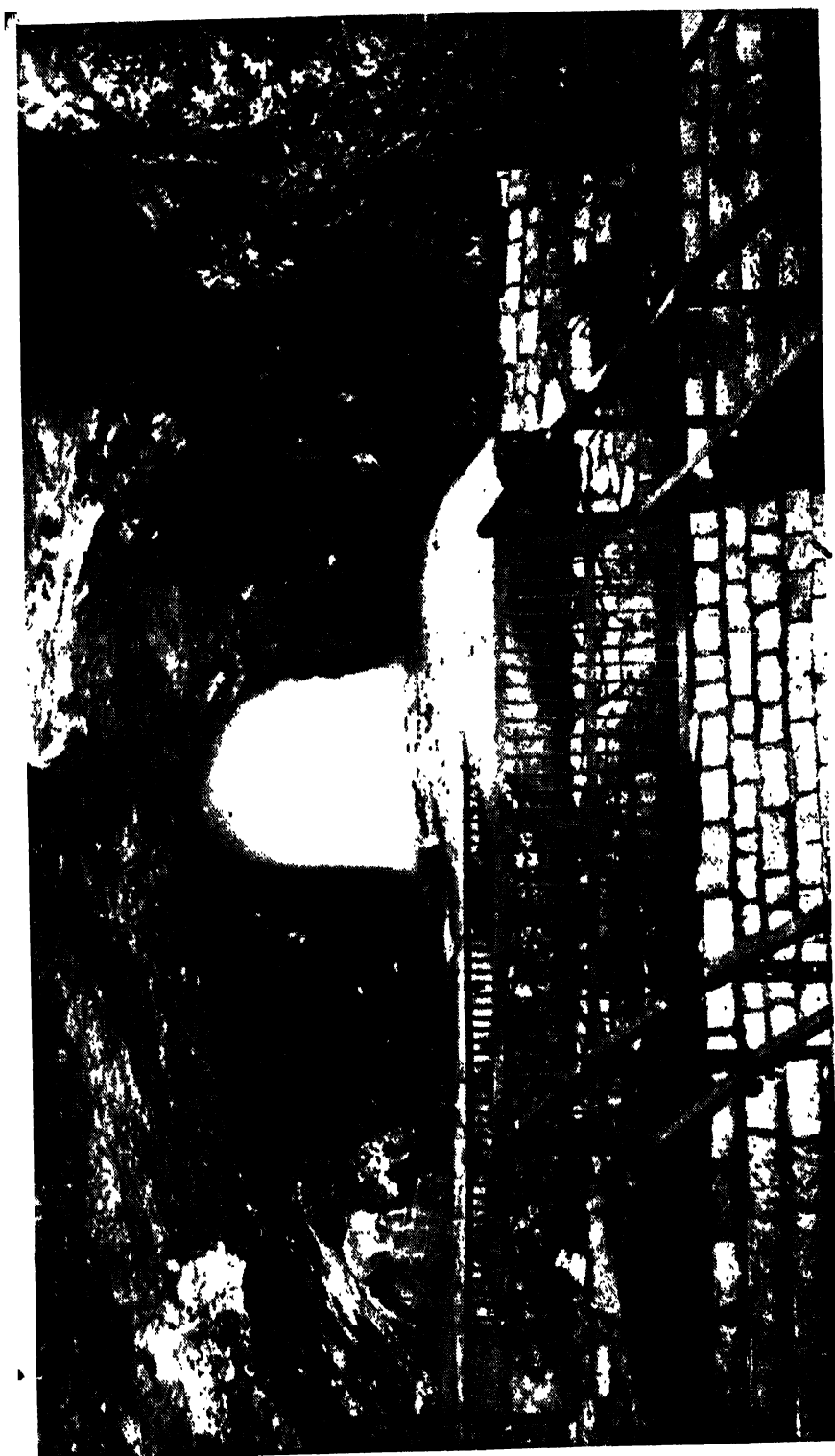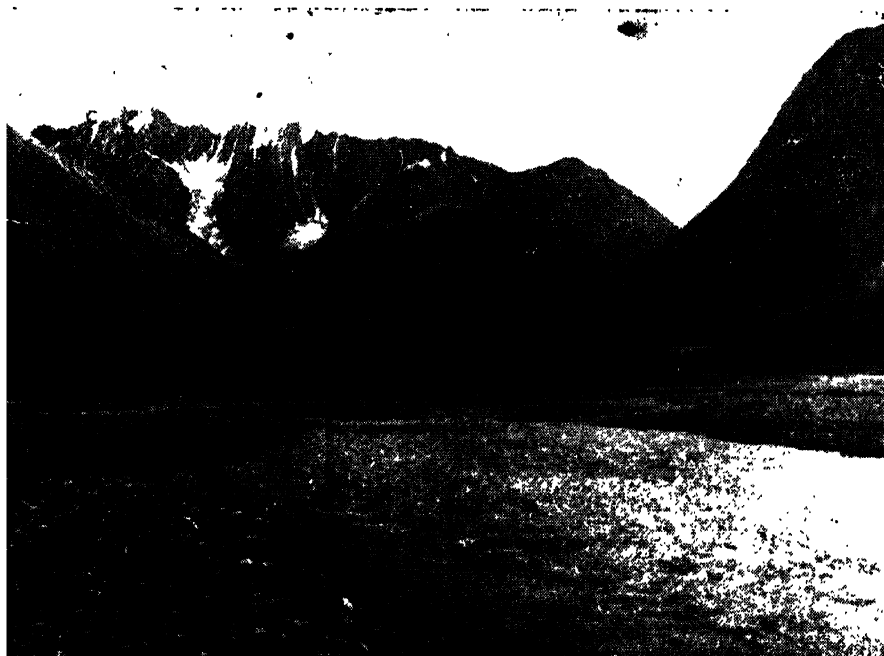
সোনাসর হ্রদ

বলতাল

তীর্থের দেবতা ডাক না দিলে তীর্থদর্শন হয় না।

এ সত্যটি জীবনে আমি বার বার প্রত্যক্ষ করেছি। সমস্ত আয়োজন শেষ করার পরেও যাত্রা শুরু করতে পারি নি। আবার প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে পথে নেমে পড়েছি, তীর্থদর্শন করে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেছি।

এবারের এই অমরনাথ যাত্রার কথাই ধরা যাক। বাষট্টি সালে কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছিলাম। প্রায় মাসখানেক কাটিয়েছি ভূস্বর্গে। দিন সাতেক পহেলগাঁয়ে থেকেছি কিন্তু অমরতীর্থ-অমরনাথ দর্শন করতে পারি নি।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিবছর হিমালয়ে এসেছি। কিন্তু অমৃতময়-অমরনাথে যাওয়া হয় নি আমার। সুযোগ এসেছিল এবারেও। মাত্র মাস দুয়েক আগের কথা। আমারই পরামর্শে বিভাস অমরনাথ যাত্রার আয়োজন করল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমন একটা বাধা এলো যে আমি তাদের সঙ্গী হতে পারলাম না। ভাবলাম অমিত-অমরনাথকে দর্শন করা অদৃষ্টে নেই আমার।

কিন্তু মাত্র দিন দশেক আগে, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ফকিরবাবু ফোন করে বসলেন—১২ই অগাস্ট অমরনাথ যাত্রা করছি। এবারে ভাদ্র মাসে যাত্রা পড়েছে। পথে বৃষ্টি কম হবে। এমন সুযোগ পাবেন না। চলুন, দর্শন করে আসবেন।

কথায় কথায় সেদিন তাঁকে বিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। বলেছি—অমিয়-অমরনাথকে দর্শন করা আমার অদৃষ্টে নেই।

গম্ভীর স্বরে ফকিরবাবু বলে উঠেছেন – এবারে বাবা অমরনাথ ডাক দিয়েছেন আপনাকে।

চমকে উঠেছি! আমার মন বলেছে—ফকিরবাবু হয়তো ঠিকই বলছেন। নইলে আমি তো কখনও তাঁর কাছে অনাদি-অমরনাথকে দর্শন করার ইচ্ছা

প্রকাশ করি নি। বহুদিন দেখাও হয় নি তাঁর সঙ্গে। তবু তিনি এভাবে হঠাৎ আমাকে অমরনাথ যাত্রায় যাবার আমন্ত্রণ জানাবেন কেন?

অতএব কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই ফকিরবাবুকে সেদিন সম্মতি জানিয়ে দিয়েছি।

বাধা কিন্তু এবারেও এসেছে। সম্মতি জানাবার তিনদিন পরে আমার 'ফুড পয়জন' হল। দু'দিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলাম। সবচেয়ে বড় বাধা এলো তারপরে, রওনা হবার মাত্র দু'দিন আগে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে দেখি গৌতমের খুব জ্বর। সারারাত তার শিয়রে বসে থাকতে হল। গৌতম আমার একমাত্র বংশধর। সুতরাং যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। জ্বর কমেছে কিন্তু ছেড়ে যায় নি। শেষ পর্যন্ত তাকে শয্যাশায়ী রেখেই রওনা হয়েছি অমরনাথের পথে। কারও নিষেধ শুনি নি। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে—এবারে বাবা ডাক দিয়েছেন আমাকে।

বাধা? হ্যাঁ, তীর্থদেবতা ডাক দিলেও তীর্থযাত্রায় বাধা আসতে পারে। তীর্থের দেবতা বাধার ভেতর দিয়ে তীর্থযাত্রীর আন্তরিকতা পরীক্ষা করেন। গৌতমের আকস্মিক অসুখ আমার প্রতি অমরনাথের সেই পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এবারে আমাকে কৃতকার্য হতেই হবে।

অমিত-অমরনাথকে অবলম্বন করে এযাত্রা আয়োজিত হলেও, আমার সহযাত্রীরা শুধু অমরতীর্থ দর্শনের জন্য ঘর ছাড়েন নি। তাঁরা 'কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স'-এর যাত্রী। তাঁদের পুণ্যসঞ্চয়ের প্রভূত আয়োজন করেছেন ফকির কুণ্ডু। তাই আমরা কাশী হরিদ্বার ঋষিকেশ ও অমৃতসর দেখে আজ সকালে জম্মু-তাওয়াই এসেছি। ফেরার পথে সাতদিন শ্রীনগরে থেকে কাশ্মীরের যাবতীয় দ্রষ্টব্যস্থল দেখব। তারপরে জ্বালামুখী ও দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরব।

কিন্তু আমার এ কাহিনী অমরতীর্থ-অমরনাথ যাত্রা নিয়ে। কাজেই কাশী হরিদ্বার ও অমৃতসরের কথা থাক, অমরনাথে যাত্রার কথা থেকেই শুরু করা যাক।

আজকের যাত্রা শুরু হয়েছে জম্মু-তাওয়াই রেলস্টেশনের ট্যুরিস্ট্ প্লাটফর্ম থেকে। যাত্রী বেশি বলে এবারে ফকিরবাবু আর 'ট্যুরিস্ট্-কোচ' আনেন নি, একখানি 'থ্রি-টায়ার বগি' এনেছেন। তাহলেও রেলের ভাষায় আমরা ট্যুরিস্ট্। অতএব স্টেশন কর্তৃপক্ষ আমাদের বগিখানিও ট্যুরিস্ট প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছেন।

কাশ্মীর ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'ট্যুরিস্ট্ স্পট্।' জম্মু-তাওয়াই রেলস্টেশন কাশ্মীরের প্রধান প্রবেশ তোরণ। তাই কর্তৃপক্ষ এই বিশেষ ট্যুরিস্ট্ প্লাটফর্মটি নির্মাণ করেছেন।

প্লাটফর্মটি নির্মিত হয়েছে স্টেশনের শেষ প্রান্তে, বড় রাস্তার পাশে। বড় রাস্তা থেকে একটি মোটর-পথ নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্লাটফর্মে। বাস ও ট্রাক অনায়াসে উঠে যায় প্রশস্ত প্লাটফর্মের ওপরে। ফলে ট্যুরিস্ট্‌দের কুলিভাড়া ও সময় বেঁচে যায়। ভারতের সমস্ত তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানের রেলস্টেশনে এমনি প্লাটফর্ম থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের কথা ভারতের অধিকাংশ বড় বড় রেল স্টেশনে আলাদা ট্যুরিস্ট্‌ প্লাটফর্ম পর্যন্ত নেই।

যাক্‌গে, যাত্রার কথায় ফিরে আসা যাক। আজ খুব সকালে আমরা জম্মু-তাওয়াই এসেছি। কিছুক্ষণ আগে বাস ছেড়েছে স্টেশন থেকে। বাষট্টি সালে যখন কাশ্মীরে এসেছিলাম, তখন পাঠানকোট ছিল রেলপথের প্রান্তসীমা। সেখান থেকে দু-রকমের সরকারী ট্যুরিস্ট্‌ বাস ছাড়ত। একটি একদিনে ও একটি দেড়দিনে শ্রীনগর পৌঁছত। একদিনের বাস খুব সকালে পাঠানকোট থেকে রওনা হয়ে রাত দুপুরে শ্রীনগর যেতো। দেড়দিনের বাসযাত্রীদের পথের কোন ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করতে হত।

পাঠানকোট থেকে জম্মু রেলপথে ষাট মাইলের মতো। একে তো রেলগাড়ি এতটা পথ এগিয়ে এসেছে, তার ওপরে এখন পথও অনেক ভাল হয়েছে। ফলে এখন সব 'বাস' একদিনে শ্রীনগর কিংবা পহেলগাঁও যায়। তবে সকাল-সকাল রওনা হওয়া চাই। যেটি আমরা পেরে উঠি নি।

কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স এবার নাকি শ' আড়াই পুণ্যার্থীকে অমরনাথ দর্শন করাবেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর জন আজ আমরা ফকিরবাবুর সঙ্গে এসেছি। বাকিরা পরে আসছেন। আমরা যাঁরা আজ এলাম, তাঁরাও কিন্তু একদিনে যাত্রায় যাচ্ছি না। আমি যাবো প্রথম দলে, তাই এখন সোজা পহেলগাঁও চলেছি। যাঁরা দ্বিতীয় দলে যাবেন, তাঁরা চলে গেলেন শ্রীনগর। দিন সাতেক বাদে তাঁরা পহেলগাঁও আসবেন। ওঁদের একখানি বাস, আমাদের দু'খানি।

ফকিরবাবু ও মিসেস ঝরণা মণ্ডল অর্থাৎ কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর কর্তৃপক্ষ রয়েছে আমাদের বাসে। সুতরাং আমাদের বাস ছেড়েছে সবার শেষে। একে তো অন্য দু'খানি বাস রওনা করে দিয়ে ফকিরবাবু গাড়িতে উঠেছেন, তার ওপরে আমাদের পায়লট স্টেশন থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন বাসডিপোতে। সেখানে গাড়িকে তেল-জল খাইয়ে নিজে জলখাবার খেয়ে নিয়েছেন।

অবশেষে অমরনাথজীর ফটোর সামনে ধূপ জ্বালিয়ে বাবা অমরনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে পায়লট যখন বাস ছেড়েছেন, বেলা তখন দশটা বেজে গিয়েছে।

পথে বাটোটে আমাদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে অন্তত

ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যাবে। কাজেই রাত দশটার আগে পহেলগাঁও পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

জম্মু শহর ছাড়িয়ে এসেছি। এখনও তেমন চড়াই-উৎরাই আরম্ভ হয় নি। উধমপুর পর্যন্ত এই রকম চলবে, তারপরে শুরু হবে প্রকৃত পাহাড়ী পথ। উধমপুর বেশ বড় শহর। জম্মু থেকে দূরত্ব ৪২ মাইল। উচ্চতা ২৩৪৮ ফুট। তার মানে ৪২ মাইলে আমাদের মাত্র ১৩৪৮ ফুট ওপরে উঠতে হবে। জম্মুর উচ্চতা ১০০০ ফুট।

এটি একালে সমতল ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকায় আসার প্রধান পথ হলেও সেকালের জনপ্রিয় পথ নয়। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য কোন্‌পথে কাশ্মীর এসেছিলেন জানা নেই আমার, তবে মোগল সম্রাটরা এপথে কাশ্মীর আসতেন না। স্বামী বিবেকানন্দও এপথে অমরনাথ আসেন নি।

স্বামীজী অমরনাথ এসেছিলেন রাওয়ালপিণ্ডি-বারমুলা-শ্রীনগর পথে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত সেটিই ছিল কাশ্মীরে আসার প্রধান পথ। সেপথে আর কাশ্মীরে আসার অধিকার নেই আমাদের।

কেন নেই, সে প্রসঙ্গে না গিয়ে স্বামীজীর কথায় ফিরে আসা যাক। স্বামীজী অমরনাথে এসেছিলেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। সেটি তাঁর দ্বিতীয়বার কাশ্মীর দর্শন। সেবারে স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকজন গুরুভাই, পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা অন্যতমা।

বাস ছুটে চলেছে। আমি অমৃতময়-অমরনাথের পথে এগিয়ে চলেছি। প্রায় আশি বছর আগে স্বামীজী অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। তিনি তার আগের বছরও শরৎকালে কাশ্মীর এসেছিলেন। সেবারে লোকমাতা নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু নিবেদিতার রচনা থেকেই আমরা সেবারের একটি সুন্দর ঘটনা জানতে পারি।

বাসে বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম সেই পরমা সুশ্রী বর্ষীয়সী কাশ্মীরী ভদ্রমহিলার কথা। শ্রীনগরের পথে এগিয়ে চলেছেন ভারত-পথিক বিবেকানন্দ। পথশ্রমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত স্বামীজী পথের পাশে একখানি বাড়ি দেখতে পেলেন। দেখলেন বাড়ির সামনে এক সুশ্রী প্রৌঢ়া বসে রয়েছেন। স্বামীজী তাঁর কাছে গিয়ে একগ্লাস জল চাইলেন।

ভদ্রমহিলা সস্নেহে স্বামীজীকে বসতে বললেন। যত্ন সহকারে তাঁকে জল এনে দিলেন। জল খেয়ে ও বিশ্রাম করে বিবেকানন্দের ক্লান্তি দূর হল। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আবার উঠে দাঁড়ালেন। বিদায় বেলায় সেই মহীয়সী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, আপনি কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ?

সগৌরবে জয়োল্লাসিত স্বরে ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী।

উত্তর শুনে ভারী খুশি হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি মাঝেমাঝেই ভক্তদের কাছে সেই ভদ্রমহিলার কথা বলতেন। নিবেদিতাকেও বলেছিলেন তাঁর কথা।

পরের বছর অর্থাৎ অমরনাথ দর্শনে যাবার পথেও স্বামীজী সবাইকে নিয়ে সেই ভদ্রমহিলার বাড়িতে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেদিন সেই মুসলমান পরিবারের সবাই মিলে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের প্রিয়জনের মতো অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।*

বাস এগিয়ে চলেছে। ছাড়িয়ে এসেছি উধমপুর। শুরু হয়েছে আঁকাবাঁকা চড়াই পথ। এমনি পথ চলবে আপার মুণ্ডা পর্যন্ত। তার আগে অতিক্রম করব বানিহাল টানেল। পৌছব কাশ্মীর উপত্যকায়।...

হ্যাঁ, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। অমরলোক-অমরনাথ ভূস্বর্গের অনিন্দ্যসুন্দর মোক্ষ-ক্ষেত্র। আমরা সেই তীর্থযাত্রার সামিল হয়েছি। কিন্তু যাত্রার কথা পরে হবে। প্রকৃত যাত্রা তো শুরু হবে পরশু সকালে, পহেলগাঁও থেকে। আজ বরং যাত্রীদের কথা হোক। যাত্রী মানে আমার সহযাত্রী। যাঁরা এই বাসে আমার সঙ্গে পহেলগাঁও চলেছেন।

প্রথমেই বলতে হবে করুণকৃষ্ণের কথা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের লেকচারার ডঃ করুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। বয়সে যুবক, অবিবাহিত। কিন্তু আচার-আচরণ ও নিয়ম-নিষ্ঠায় প্রবীণ সাত্ত্বিক-ব্রাহ্মণ। ত্রি-সন্ধ্যা জপ-তপ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় একাধিক সোনার মেডেল পেয়েছে। অসাধারণ স্মরণ-শক্তির অধিকারী। জাতীয় গ্রন্থাগারে অনেকে তাকে 'ওয়াকিং ডিক্শনারী' বলেন।

বহুদিন থেকেই তার ইচ্ছে ছিল, একবার আমার সঙ্গে হিমালয়ে আসে। তাই এবারে সে সানন্দে সঙ্গী হয়েছে।

আমার আরেকজন বন্ধুও সঙ্গে চলেছে। তার নাম অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশা ভ্রমণ। সস্ত্রীক প্রায় সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছে। স্ত্রী শ্রীমতী ইনা ইংরেজীর অধ্যাপিকা ও সুলেখিকা—স্টেট্সম্যানে নিয়মিত ফিচার লেখে। এবারে অবশ্য সে সঙ্গে আসে নি। ছেলে-মেয়েদের স্কুল চলেছে, তাই আসতে পারে নি।

---

* Notes of some 'Wanderings with the Swami Vivekananda'—by Sister Nivedita

ওদের দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। বড় মেয়ে পিয়া ক্লাশ এইটে পড়ে। ইংরেজী কবিতা লিখে 'রোটারী ইন্টারন্যাশনাল চিল্‌ড্রেনস কম্‌পিটিশন' জিতেছে। ভারত উপমহাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে তাঁদের খরচে য়ুরোপ বেড়িয়ে এসেছে।

ছেলে অশেষ ক্লাশ ফাইভ ও ছোটমেয়ে পাঞ্চালী ক্লাশ ওয়ানে পড়ে।

আগেই বলেছি অসীম অতিশয় ভ্রমণপিপাসু। কয়েকবছর আগে সে অমরনাথ দর্শন করে গিয়েছে। তবু আবার সঙ্গী হয়েছে আমার।

আমরা পাঁচজন বসেছি সবার পেছনে, বাসের লম্বা সীটটাতে। দুপাশে জানলার ধারে বসেছে ব্রহ্মচারী ও অসীম আর মাঝখানে আমরা তিনজন—ফকিরবাবু, মিসেস মণ্ডল এবং আমি।

আমাদের সামনে ডানদিকের সীটে বসেছেন মিস্টার ও মিসেস ভট্টাচার্য আর বাঁদিকের সীটে তুলতুল ও অশোক।

মিস্টার কালিপদ ভট্টাচার্যও ইঞ্জিনীয়ার। মধ্যবয়সী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। মিসেস কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া কিন্তু বেশ চলাফেরা করতে পারেন। ভদ্রমহিলা খুবই গুণী। নানা রকমের সেলাই ও বোনার কাজ জানেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি যেমন মজার মানুষ, তেমনি স্নেহশীলা। প্রচুর ফল বিস্কুট চানাচুর লজেন্স ও আচার ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বাসে উঠেছেন এবং সমানে বিলিয়ে চলেছেন।

এই বিলোবার ব্যাপারটাতে অবশ্য মিসেস মণ্ডলও পিছিয়ে পড়ছেন না। আমি তাঁর পাশেই বসেছি। সুতরাং সুখে ভ্রমণ করছি।

শ্রীমতী তুলতুল মিস্টার ভট্টাচার্যের ছোট মেয়ে। ওরা তিন ভাই-বোন। দিদি আভার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, দিল্লীতে থাকে। দাদা কল্যাণও ইঞ্জিনীয়ার।

তুলতুল সবে কৈশোর অতিক্রম করেছে। আমাদের দলের একমাত্র তরুণী। সুশ্রী স্মার্ট এবং আধুনিকা। সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছে। কবিতা লেখে, আবৃত্তি করতে ও গান গাইতে পারে। এর আগে সে আর কখনও কোন দুর্গম তীর্থে যায় নি।

তুলতুলের পাশে বসেছে অশোক সাহাচৌধুরী। অবিবাহিত যুবক। ছোট-খাটো কাঠ মানুষ। সর্বদা ফিটফাট থাকে। ভ্রমণ করতে খুবই ভালোবাসে। কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শন করেছে।

মিস্টার ভট্টাচার্যের সামনের সীটে বসেছে গৌরী ও সরকারদা। গৌরী আমার পূর্বপরিচিতা। গতবছর সে আমাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিল। গৌরী

দেখতে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী, বয়সে যুবতী, পেশায় শিক্ষয়িত্রী। ধর্মপরায়ণা পরিব্রাজিকা। রেলে উঠে আমাকে পেয়ে সে ভারী খুশি। এবং তখুনি বলে ফেলেছে, "ফকিরবাবুর কাছে ঘোড়াভাড়া জমা দিলেও আপনি যখন যাত্রায় যাচ্ছেন, আমি আর ঘোড়ায় উঠছি নে। আমি আপনার সঙ্গে হেঁটে যাবো শঙ্কুদা!"

সরকারদাও বলেছেন তিনি হেঁটে যাবেন। অথচ তাঁর মেয়ে-জামাই ও ছেলেরা বারবার বলে দিয়েছেন ঘোড়া নিতে। কেনই বা বলবেন না, তাঁরা সকলেই কৃতি। তার ওপরে সরকারদা ভাল চাকরি করতেন, এখন অবসর যাপন করছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর বয়স হয়েছে প্রায় পঁয়ষট্টি। তিনি আমাদের দলের প্রবীণতম সদস্য।

তাহলেও আমি কিন্তু সরকারদার প্রস্তাব অনুমোদন করেছি। কারণ বয়স হলেও তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। মানুষটিও ভারী অমায়িক। গতবছর তিনি হেঁটে কেদারনাথ গিয়েছিলেন। অতএব আপত্তি করব কেন?

হেঁটে যাবার কথা বলেছেন পরিতোষবাবু এবং মামা। বলেছে ভাগনে, অশোক ও ডাক্তার এবং আরও অনেকে। অতএব সেকথা এখন থাক। আর হাঁটাপথ তো শুরু হবে পরশু থেকে। তখন দেখা যাবে কে হেঁটে যায় আর কে ঘোড়-সওয়ার হয়?

সরকারদার পাশের সারিতে বসেছেন পরিতোষবাবু ও তাঁর স্ত্রী। পরিতোষ মুখোপাধ্যায়ের পেশা চাকরি, নেশা তন্ত্রসাধনা। তাঁর পরনে প্যান্ট-সার্ট কিন্তু মাথায় জটা। প্রতি সন্ধ্যায় লাল কাপড় পরে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে ধ্যানে বসেন। তাহলেও ভদ্রলোক বেশ মিশুকে মানুষ।

পরিতোষবাবু রোগা ও কালো কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেশ ফর্সা। স্বাস্থ্যটিও মন্দ নয়, তবে একটু খাটো। ভারী শান্ত-শিষ্ট ও মধুর স্বভাব। তিনিও নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন। ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে রেখে স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন। কি করবেন, তীর্থযাত্রার নেশা যে বড়ই দুর্জয় নেশা।

পরিতোষবাবুদের সামনে বসেছে মামা ও ভাগনে। মামা বিষ্ণুপদ পাল, ভাগনে সুনীল নন্দী। দুজনেই ভাল চাকুরে, দুজনেই অবিবাহিত। মামার বয়স পাঁচের কোঠায়। সুতরাং তার বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত। কিন্তু ভাগনে সবে তিনের ঘরে পা দিয়েছে। তার বেলায় সেকথা খাটে না। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন উৎসাহী শিষ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মামা কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় নি। ভাগনে সুদর্শন ও শিক্ষিত। ভাল চাকরি করে। তার যৌবন অতিক্রান্ত হয় নি। অতএব ভাগনের সংসারী হওয়া সম্পর্কে মামা খুবই আশাবাদী। সুযোগ পেলেই সে ভাগনের কাছে বিয়ে-না-করার অসুবিধেগুলোর বিষয়ে বিবৃতি দান করে। কিন্তু ভাগনের তাতে কোন চিত্তচাঞ্চল্য হতে দেখি নি এখনও। আমার ধারণা মামা বৃথাই বাক্যব্যয় করে চলেছে। শৈশবে পিতৃহীন ভাগনে মামার কাছে মানুষ হয়েছে, মামার কাছেই আছে, সুতরাং সে মামার মতোই হবে।

তবে ভাগনে কিন্তু মামার মতো সৌখীন নয়। মামা সব সময় ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে। তার দাড়িকাটা এবং স্নান ও প্রসাধন পর্ব দেখার মতো। মানুষটি উদার এবং রসিক। ভাগনেকে ছেলের মতো ভালোবাসে। আর সুযোগ পেলেই সবার জন্য খরচ করে।

মামা-ভাগনের পাশের সীটে বসেছে ডাক্তার ও তার মা। ডাক্তার অসিত মুখোপাধ্যায় উৎসাহী যুবক। এম. বি বি. এস পাস করে সবে ডাক্তারী শুরু করেছে। তার বাবা নেই। ছেলে মায়ের দু-চোখের মণি। তাই দুর্গম যাত্রায় মা পুত্রের সঙ্গী হয়েছেন।

কলকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে আরও একজন ডাক্তার এসেছে। নাম দীপক ভৌমিক। জলপাইগুড়ির ছেলে। সেও অসিতের সহপাঠী এবং আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। তার সাহিত্যপ্রীতি অসাধারণ। চমৎকার আবৃত্তি করে। দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যটি ভাল, অমায়িক ব্যবহার। এক কথায় হিমালয় পথের আদর্শ সঙ্গী। কিন্তু আমরা তার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হলাম। কারণ সে শ্রীনগর যাত্রীদের বাসে চলে গিয়েছে। দ্বিতীয় দলের সঙ্গে অমরনাথ দর্শন করবে।

আমাদের ডাক্তারও সঙ্গী হিসেবে মোটেই মন্দ নয়। খুবই ভাল ছেলে। ডাক্তারের মা-ও সুন্দর গল্প বলেন। ভারী ধর্মপ্রাণা। আর তাই ব্রহ্মচারী মানে করুণকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর খুবই মনের মিল হয়েছে। গাড়িতে ব্রহ্মচারী তাঁকে অনেক ধর্মকথা শুনিয়েছে।

ডাক্তারের বাঁ পাশের সীটে বসেছে বাসুদেব ও অর্পণা। বাসুদেব মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী। বয়সে যুবক কিন্তু একটু আয়েসী। তবে ভ্রমণ করতে খুবই ভালোবাসে। তাই বউ ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে রেখে নিজে অমরনাথ চলেছে। আগামী মাসে নাকি আবার মণিমহেশ যাবে।

বাসুদেবের পাশে বসেছে অর্পণা—শ্রীমতী অর্পণা অধিকারী। কৃষ্ণনগরের

মেয়ে। সেখানেই একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষয়িত্রী। আর তাই বাসে উঠবার পরে অসীম তাকে ব্রহ্মচারীর পাশে বসতে বলেছিল। বলেছিল—জুনিয়র কালিদাস আর জুনিয়র গার্গী, জমবে ভাল। ক্লাশ নিতে নিতে পহেলগাঁও পৌঁছে যাবেন।

অসীমের সে পরামর্শ মানতে পারে নি অর্পণা। সে বলেছে—তা যে হয় না অসীমদা!

—কেন? অসীম প্রশ্ন করেছে।

অর্পণা উত্তর দিয়েছে—উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর আমি কেষ্টনগরের স্কুল মাষ্টার। আমি কেমন করে ওঁর পাশে বসব? তার চেয়ে এই রেডিওর দোকানদারের পাশে পাশে থাকি, ভবিষ্যতে বিনে পয়সায় রেডিও সারানো যাবে।

রেডিওর দোকানদার বলায় বাসুদেব কিন্তু রেগে যায় নি, বরং সে বোধ করি খুশিই হয়েছে। কারণ অর্পণা যেমন হাসি-খুশি, তেমনি ভাল কীর্তন গায়। জমিয়ে রাখতে জুড়ি নেই তার। তাছাড়া সে রেগে যাবেই বা কেন? বাসুদেবের যে সত্যই একটা রেডিওর দোকান আছে।

আমার চিন্তায় বাধা পড়ে। পাশের থেকে ফকিরবাবু বলে ওঠেন, "আমরা কুদ এসে গেলাম। এর পরেই বাটোট।"

তিনি বোধহয় আমাদের একটু আশ্বস্ত করে তুলতে চাইছেন। কারণ বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। মিসেস ভট্টাচার্য ও মিসেস মণ্ডলের ফল-ফলাদি বহুক্ষণ আগে নিঃশেষিত। মুখে কেউ কিছু না বললেও সবারই খুব খিদে পেয়েছে। ফকিরবাবু তাই আশ্বস্ত করলেন—এর পরেই বাটোট অর্থাৎ আমাদের খাবার জায়গা।

কুদ জম্মু-শ্রীনগর পথের তৃতীয় উচ্চতম স্থান। উচ্চতা ৫৭০০ ফুট। আমরা জম্মু থেকে ৬৬ মাইল ও উধমপুর থেকে ২৪ মাইল এসেছি। এখান থেকে বাটোট মাত্র ১২ মাইল। তাছাড়া উৎরাই পথ। আমরা এবারে নিচে নামতে শুরু করব। বাটোটের উচ্চতা ৫১১৬ ফুট। সুতরাং খাবার জায়গা সত্যি এসে গেল।

কুদের ভেতর দিয়ে বাস চলেছে। মনে পড়েছে সেই ১৯৬২ সালের কাশ্মীর ভ্রমণের কথা। সেবারে সকালে পাঠানকোট থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাস কুদে পৌঁছেছিল। আমরা ডাক বাংলোয় রাত্রিবাস করেছিলাম। কুদ গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যাবাস। এখানে একটি চমৎকার ঝরণা আছে।

থাকৃগে, আবার আগের ভাবনায় ফিরে আসা যাক্। সহযাত্রীদের ভাবনা।

অপর্ণার সামনে পায়লটের বাঁদিকে লম্বা সীটটাতে বসেছে কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স-এর চারজন কর্মচারী, দু-জনের নাম জানি—গোপাল ও মায়া। ফকিরবাবুদের দার্জিলিঙে একটি হোটেল আছে, নাম—হোটেল কুণ্ডুস। মিসেস মণ্ডল সেটি দেখাশোনা করেন। মায়া সেখানকার কর্মচারী। এখন বর্ষাকাল, দার্জিলিঙের বাজার মন্দা। তাই মিসেস মণ্ডল মায়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ভালই করেছেন। তরুণী মায়া রোগা হলেও খুব খাটতে পারে। আর সে যেমন সেবাপরায়ণা, তেমনি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে।

মায়ার পাশে বসেছে গোপাল—ফকিরবাবুর বাবা, প্রথম ভারতীয় ট্যুর কণ্ডাকটার ৺শ্রীপতি কুণ্ডুর হাতে তৈরি গোপাল চক্রবর্তী। তার কথা আমি শুনেছিলাম অনেক দিন, এবারে পরিচয় হল। সত্যি খুশি হয়েছি ওর সঙ্গে পরিচিত হয়ে। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও মধুর স্বভাব। অসাধারণ কর্মঠ যুবক। চেহারাটি সুন্দর। এই ক'দিনেই সবাইকে আপন করে নিয়েছে। আমার সহযাত্রীদের অনেকেই ইতিপূর্বে তার সঙ্গে কোথাও না কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন। তাঁরা প্রায় সকলেই বয়স নির্বিশেষে তাকে গোপালদা বলে ডাকেন।

তাঁদেরই একজন হঠাৎ বলে উঠলেন, "এটা কি ভাল হচ্ছে গোপালদা ?"

"কেন মাসিমা ?" গোপাল অভিযোগটা বোধহয় বুঝতে পারে নি।

মাসিমা বলেন, "সেই সকাল থেকে এই বিকেল পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ।"

"ও আপনি গান গাইতে বলছেন ?" গোপাল নিজের থেকেই ধরা দেয়।

মাসিমা খুশি হন। বলেন, "আর যে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না।"

"আমি গাইতে পারি, তবে একটি শর্তে।"

"কী ?" সমস্বরে অনেকেই বলে ওঠেন।

"যে ক'খানা শুনতে চান গাইব, কিন্তু তারপরে আপনাদেরও গাইতে হবে।"

সবাই নীরব। একটু বাদে তুলতুল বলে, "বেশ, আমরাও গাইব। আপনি আরম্ভ করুন।"

গোপাল শুরু করে—

'আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার॥

আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার॥'...

সত্যই ভাল গায় গোপাল। গলাটি বেশ মিষ্টি। খুব ভাল লাগছে। সে হাত নেড়ে নেড়ে গেয়ে চলেছে—

'আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার॥'

॥ দুই ॥

গোরাদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডাকবাংলোর সামনে। বাস থামতেই তিনি তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিলেন।

গোরাদা মানে গোরা মিত্র। ফকিরবাবুর বন্ধু। বনেদি পরিবারের ছেলে। অকৃতদার। তীর্থদর্শন ও সাধুসঙ্গতেই তাঁর সবচেয়ে বেশি আনন্দ। এবছর কুম্ভ-মেলায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছে। কৈশোর বয়স থেকেই তিনি কুম্ভমেলায় যাচ্ছেন। আনন্দময়ী মা তাঁকে নাকি খুবই স্নেহ করেন।

বড় বড় যাত্রার আয়োজন করতে ফকিরবাবুকে সাহায্য করেন গোরাদা। কয়েকজন কর্মচারীকে নিয়ে তিনি তাই গতকাল সোজা চলে এসেছেন বাটোট। আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

গাড়ি থেকে নামতেই গোরাদা আমার একখানি হাত ধরলেন। পথ থেকে পাঁচধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ডাকবাংলোর চত্বরে—বাটোট ডাকবাংলো। পথের পাশে একটু উঁচুতে অনেকটা জায়গা জুড়ে ডাকবাংলো। সামনে সবুজ 'লন'। মাঝে মাঝে মরশুমী ফুলের গাছ। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

বেশ চকচকে রোদ উঠেছে। আগেই বলেছি বাটোটের উচ্চতা। ৫১২৬ ফুট। রোদটা ভারী মিঠে লাগছে। আগের বাসের অধিকাংশ যাত্রীরা তাই ডাকবাংলোর বারান্দায় কিংবা ভেতরে না গিয়ে থালা নিয়ে চত্বরেই বসে গিয়েছেন।

হঠাৎ কানে আসে, "দাদা! এখানে চলে আসুন।"

তাকিয়ে দেখি অজিত ও তার স্ত্রী একটু দূরে বসে খাচ্ছে। পাশে গৌরীদা ও তাঁর মা, অবিনাশদা ও বৌদি এবং মিস্টার ও মিসেস বোস।

কাছে এসে বসতেই অজিত বলে, "দাদা ট্রেনে পাশাপাশি সীটে এলাম আর আমাদের আলাদা বাসে দিয়ে দিলে?"

সহাস্যে বলি, "কি করবেন বলুন।"

"না, কি করবেন নয়, বলুন কি করবে।" অজিত আমাকে প্রায় ধমক লাগায়।

তাড়াতাড়ি বলি, "আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এখন থেকে তুমিই বলব
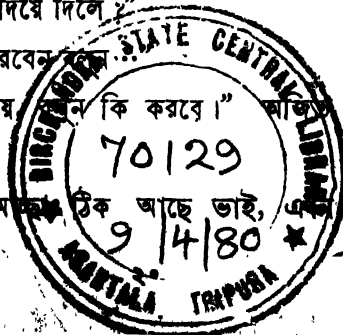
তোমাকে।" একবার থেমে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বলি, "কি করবে বলো, পঁচাত্তর জন যাত্রী এক ট্রেনে এসেছি, সবাই তো আর এক বাসে যেতে পারব না। একটা দিন বৈ তো নয়, রাতেই দেখা হবে। কাল থেকে তো আবার একসঙ্গে থাকা ও পথ-চলা।"

"ঠিকই বলেছেন দাদা! কিন্তু বাসে আমাদের বড্ড একা একা লাগছে। ট্রেনে যাদের সঙ্গে পাশাপাশি ছিলাম, তাঁরা প্রায় কেউ নেই। যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি ভাল করে।"

"তাছাড়া," অজিত থামতেই মিঃ বোস বলে ওঠেন, "আমরা আবার সাহেব-মেমদের পাল্লায় পড়েছি।"

"সাহেব-মেম!" আমি বিস্মিত। আমাদের সঙ্গে তো য়ুরোপ বা আমেরিকার কোন যাত্রী নেই। অতএব বোসবাবুর দিকে তাকাই।

হেসে ওঠেন মিসেস বোস। জিজ্ঞেস করেন, "বুঝতে পারলেন না তো?"

আমি মাথা নাড়ি।

বৌমা মানে অজিতের স্ত্রীও খিলখিল করে হেসে ওঠে। মিসেস বোস হাসি থামিয়ে বলেন, "ডাকবাংলোর বারান্দার দিকে তাকান, দেখতে পাবেন তাদের।"

তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাই। দেখি সেই অতিআধুনিক তিনজোড়া যুবক-যুবতী খেতে বসেছে। এবারে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। ওরা সবাই বাঙালী। কথাবার্তাও বাংলাতেই বলে, তবে পোষাক, প্রসাধন এবং চাল্-চলনে সাহেবীয়ানা প্রকট। ওদের সাহেব-মেম বলা যেতে পারে। কিন্তু সেটা ওদের নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ট্রেনে তো ওরা কোন গোলমাল করে নি। তাহলে বোসবাবু একথা বলছেন কেন?

বোসবাবুর হয়ে বৌমা জবাব দেয়, "আপনি জানেন দাদা, কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স থেকে বলে দিয়েছে বাসে কে কোন্ সীটে বসবে?"

"হ্যাঁ, জম্মু-তাওয়াই স্টেশনে প্রত্যেক বাসের ম্যানেজার লিস্ট দেখে বলে দিয়েছে কার কত নম্বর সীট।"

"ওরা তা মানে নি। বাস আসতেই ওরা হুড়মুড় করে বাসে উঠে সামনের দিকে নিজেদের ইচ্ছে মতো বসে পড়েছে। পরে তাই নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাসে যখন আমরা 'কোরাস' গাইতে শুরু করলাম, তখন ওরা ভুরু কুচকে বসে রইল। ভাবখানা—গান গাওয়ার চেয়ে বড় অসভ্যতা এ সংসারে যেন আর কিছুই নেই। আর তাই ওরা আমাদের সঙ্গে খেতে বসে নি, বারান্দায় বসে খাচ্ছে।"

আমাদের খাবার আসে। আমি অজিতের পাশে বসে পড়ি। ব্রহ্মচারী ও শচীন আমার পাশে বসে। আমরা খেতে শুরু করি।

অবিনাশদা ও অজিতদের খাওয়া হয়ে যায়। ওরা আমাদের আগে এসেছে। ওদের দু'খানি 'বাস'ই আমাদের আগে ছাড়বে। কিন্তু অজিতের ইচ্ছে সে আমাদের বাসে যায়। বলে, "ফকিরবাবুকে গিয়ে বলি, তিনি আর মিসেস মণ্ডল আমাদের সীটে চলে যান, আমরা দু-জন আপনাদের বাসে যাই।"

ফকিরবাবু হয়তো প্রস্তাবটা মেনে নেবেন, কিন্তু অজিতের বাস বদলটা অনেকের কাছে সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। যাত্রার শুরুতেই এমনটি হওয়া উচিত নয়। তাই বলি, "আর মাত্র ছ'-সাত ঘণ্টার ব্যাপার, তারপরেই তো আবার দেখা হচ্ছে। যাত্রার সময় এক সঙ্গে চলা যাবে। আজ বরং আর কোন 'চেঞ্জ' করো না।"

অজিত প্রতিবাদ করে না। তবে সে চুপ করে থাকে। বুঝতে পারছি কথাটা তার ঠিক মনের মতো হয় নি।

আমি নীরবে খেতে থাকি।

ওদের বাসের ম্যানেজাররা বাঁশি বাজাচ্ছে। তার মানে এখুনি বাস ছাড়বে। অজিত ও বৌমা উঠে দাঁড়ায়। বোসবাবুরা আগেই উঠেছিলেন।

"আসি তাহলে, আবার দেখা হবে।" বোসবাবু বলেন।

আমি মাথা নাড়ি।

বোসবাবু আবার বলেন, "একটা কথা বলা হয় নি আপনাকে।"

"বেশ তো বলুন।" আমি বলি।

একটু ভেবে নিয়ে বোসবাবু বলেন, "আমার হিমালয় প্রীতির মূলে কিন্তু আপনি। আপনার বই পড়েই আমি প্রথম হিমালয় দর্শন করেছি। তাই গাড়িতে উঠে যখন জানতে পারলাম আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, তখুনি ঠিক করলাম, আপনার সঙ্গেই বাবা অমরনাথকে দর্শন করব। নইলে আমরা ছিলাম দ্বিতীয় দলে, আজ আমাদের শ্রীনগর চলে যাবার কথা। ফকিরবাবুকে বলে দল বদল করলাম। অথচ দুর্ভাগ্য দেখুন, আপনি রইলেন ভিন্ন বাসে।"

"একে দুর্ভাগ্য বলে ভাবছেন কেন?" সহাস্যে প্রতিবাদ করি। বলি, "তাছাড়া আমরা তো একসঙ্গেই বাবা অমরনাথকে দর্শন করব।"

"অগত্যা!" হাসতে হাসতে মিসেস বোস মন্তব্য করেন।

ওদের বাস ছেড়ে দেয়। আমরা হাত নেড়ে বিদায় জানাই। আমাদের বাস ছাড়তে দেরি আছে এখনও। এই অবসরে বরং বাটোটের পথে একটু পায়চারি

করে নেওয়া যাক। আমি ও অসীম ডাকবাংলোর চত্বর থেকে নেমে আসি পথে। ব্রহ্মচারী অসিতের মায়ের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছে। সুতরাং তাকে 'ডিস্টার্ব' করা উচিত হবে না।

পীচঢালা মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। জায়গাটি বেশ নির্জন। পথের পাশে সারি সারি গাছ—চমৎকার ছায়া বিছিয়েছে। কিন্তু ক্লান্ত পথিক নেই বললেই চলে। লোকালয় কিংবা দোকানপাট নেই যে। দুজন মহিলা কেবল কিছু আপেল নিয়ে বসেছেন। মোটেই ভাল আপেল নয়। কিন্তু আমার সহযাত্রীরা যে কাশ্মীর ভ্রমণে এসে প্রথম আপেল কেনার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং তাঁরা ভরা পেটে আপেল খাচ্ছেন।

চন্দ্রভাগার তীরে বাটোট একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। 'ডরমিটারী' এবং ডাক-বাংলো এখানকার প্রধান আশ্রয়স্থল। এখান থেকে চন্দ্রভাগার তীর দিয়ে পথ চলে গিয়েছে ভাদরওয়া ও কিশ্‌তয়ার।

ডাকবাংলোয় ফিরে দেখি, বাস্ ছাড়তে দেরি আছে। কারণ ফকিরবাবুর খাওয়া হয় নি এখনও। খাবেন কেমন করে? তাঁর যে অনেক কাজ! কাল একদল যাত্রী আসছেন। দিন-চারেক বাদে আসবেন আরেকদল। তাঁরাও পহেলগাঁও এবং শ্রীনগরের পথে এখানেই লাঞ্চ করবেন। ফকিরবাবুকে সব ব্যবস্থা করে যেতে হবে। অতএব তিনি গোরাদার সঙ্গে কন্‌ফারেন্স করছেন।

কন্‌ফারেন্স শেষ হয়। ফকিরবাবু খেতে বসেন। গোরাদাও খান নি। কিন্তু তিনি বসবেন সবার শেষে। তিনি যে আমাদের হোস্ট্। গৃহস্বামী তো নিমন্ত্রিতদের খাবার পরেই খেতে বসেন।

খাবার জন্য নয়, গোরাদারও একই আপশোষ—একসঙ্গে কাশ্মীর এসেও আমার সঙ্গে অমরনাথ দর্শন করতে পারলেন না।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। এবারে আমার যাত্রায় আসার পেছনে তাঁরও কিছু অবদান রয়েছে। কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর অফিস থেকে তিনি আমাকে প্রায়ই ফোন করতেন। রওনা হবার আগের দিন যখন গৌতমের অসুখের কথা জানালাম তখন গোরাদা বলেছিলেন—যাঁর যাত্রায় যাচ্ছেন, তিনিই আপনার ছেলেকে দেখবেন। আপনি চলুন। কথাটা সেদিন বড় ভাল লেগেছিল।

ফকিরবাবু ভরসা দেন, "একসঙ্গে যাত্রায় না গেলেও যাত্রাপথে দেখা হবে আপনাদের। আর আপনারা একই সঙ্গে শ্রীনগর থাকবেন এবং কলকাতায় ফিরবেন।"

"অর্থাৎ দুধের সাধ ঘোল দিয়ে মেটাতে হবে, এই তো।" গোরাদা বলে উঠলেন।

গোরাদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডাকবাংলোর সামনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। আমরা বাসে বসে হাত নাড়ছি। বাস চলল এগিয়ে, গোরাদা গেলেন হারিয়ে।

জম্মুর পরে এতক্ষণ আমরা উত্তর-পূর্বে এসেছি। বাটোট থেকে পথের দিক পরিবর্তন ঘটল। এখন আমরা সোজা উত্তরে যাবো। এই ভাবে এগোবো বানিহাল পর্যন্ত। বানিহাল বাটোট থেকে ৪০ মাইল।

বানিহালের উচ্চতা ৫৮৮০ ফুট। তার মানে বানিহাল বাটোটের চেয়ে প্রায় আট শ' ফুট বেশি উঁচু।

তাহলেও এখন কিন্তু আমরা নেমে চলেছি। কুদের পর থেকে যে উৎরাই শুরু হয়েছে, তা শেষে হয়নি এখনও, বরং বেড়েছে।

বানিহাল নয়, আমরা এখন রামবান চলেছি। রামবান বাটোট থেকে ১৭ মাইল। রামবানের উচ্চতা ২২৫০ ফুট। তার মানে মাত্র ১৭ মাইলে আমাদের প্রায় তিন হাজার ফুট নেমে যেতে হবে। রামবানের পর থেকে শুরু হবে খাড়া চড়াই।

বাস এগিয়ে চলেছে। আমরা এগিয়ে চলেছি অমরতীর্থ-অমরনাথের পথে। আগামীকাল এসময় থাকব পহেলগাঁও। পরশু চন্দনবাড়ির পথে পদচারণা করছি। প্রায় দশমাস পরে আবার হিমালয়ের পথ। ভাবতেও ভাল লাগছে।

কিন্তু ভাবনা থামাতে হল। পাশের থেকে ফকিরবাবু প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, অমরনাথ যাত্রার ওপরে ক'খানা বাংলা বই আছে?"

বিপদে পড়ে যাই। আমি সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্য-সমালোচক নই। চট করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন আমার পক্ষে। তবু একটু ভেবে নিয়ে বলি, "যতদূর মনে পড়ছে শুধু অমরনাথ যাত্রাকে নিয়ে খানতিনেক বাংলা বই পড়েছি।"

"আরেকখানি হবে আশা করছি?" মাঝখান থেকে মিসেস মণ্ডল প্রশ্ন করে বসেন।

মৃদু হেসে বলি, "এখুনি বলা শক্ত। তবে ভাল লাগলে লিখব ভেবেছি।"

"তাহলে লিখতে হবে।" মিসেস মণ্ডলের কণ্ঠস্বরে গভীর আত্মপ্রত্যয়। "এপথ আপনার ভাল লাগবেই।"

আমি কোন প্রতিবাদ করি না। চুপ করে থাকি।

ফকিরবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, "শুধু অমরনাথের ওপরে কি কি বই আছে?"

"দেবপ্রসাদ দাসগুপ্তের 'একই আকাশ ভুবন জুড়ে', শঙ্করপ্রসাদ রায়ের 'তুষারতীর্থ অমরনাথ' এবং দ্বিজেশ ভট্টাচার্যের 'অমরনাথের পথে পথে'। তবে আরও কয়েকখানি বাংলা বইতে আমরা অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে অমরনাথ যাত্রার বিশদ বিবরণ পাই।"

"যেমন?" এবারে মিসেস মণ্ডল প্রশ্ন করেন।

উত্তর দিই, "ভগিনী নিবেদিতার বইখানির বাংলা অনুবাদে স্বামীজীর অমরনাথ দর্শনের কথা আছে।* আমরা অমরনাথের কথা পাই ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত বিশ্বকোষ প্রথমভাগে, স্বামী অভেদানন্দের 'কাশ্মীর ও তিব্বতে', প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়ে', স্বামী দিব্যাত্মানন্দেব 'পুণ্যতীর্থ ভারতে' এবং 'রম্যাণিবীক্ষ্যে'।"

"এর মধ্যে, কার বর্ণনাটি আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?"

"প্রবোধদা ও স্বামী অভেদানন্দের বর্ণনা।"

"প্রবোধবাবুর বই আমি পড়েছি, আপনি অভেদানন্দের কথা বলুন।"

একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, "স্বামী অভেদানন্দজী ১৯২১ সালের শেষ দিকে আমেরিকা থেকে বেলুড়ে ফিরে আসেন। পরের বছর জুলাই মাসেই তিনি হিমালয় ভ্রমণে বের হন এবং কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ করে ১২ই ডিসেম্বর বেলুড়ে ফিরে যান।"

"তার মানে তিনি সেবারে এক নাগাড়ে পাঁচ মাস হিমালয়ে ঘুরেছেন?"

"হ্যাঁ। ভৈরব চৈতন্য নামে জনৈক ব্রহ্মচারী সেই পদপরিক্রমায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনিই অভেদানন্দের ডায়েরী ও অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে বইখানির প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-এর মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'তে ভ্রমণকাহিনীটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে অভেদানন্দ প্রকাশিত কাহিনীটি সংশোধন করে 'পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ' নামে পুস্তক আকারে মুদ্রিত করেন। ২৩ বছর বাদে 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' নাম দিয়ে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বইখানি হিমালয়ের ওপরে রচিত বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একখানি অমূল্য সম্পদ।"

* 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে।'

আর কেউ কোন প্রশ্ন করে না। অতএব বাসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই। রামবানের রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে। রামবান বেশ বড় জায়গা। ডাকবাংলো আছে।

আমাদের সকলের গায়েই গরম পোষাক। অথচ রামবানের উচ্চতা মোটে ২২৫০ ফুট। ফলে বেশ গরম লাগছে।

কিন্তু সেকথা প্রথম বলে তুলতুল। সে গা থেকে কোট খুলে ফেলে বলে ওঠে, "বড্ড গরম লাগছে।"

"তাহলেও কোটটা গায়ে দিয়ে রাখো।" মিসেস মণ্ডল তুলতুলকে সাবধান করেন। বলেন, "এখুনি বাস আবার ওপরে উঠতে শুরু করবে, তখন ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

তুলতুল তাড়াতাড়ি কোট গায়ে দেয়।

মিসেস মণ্ডল ঠিকই বলেছেন। রামবান এপথের নিম্নতম স্থান। এখন আমরা বানিহালের দিকে চলেছি। বানিহাল ৫৮৮০ ফুট। রামবান থেকে বানিহাল মাত্র ২৩ মাইল। তার মানে ২৩ মাইলে ৩৬৫০ ফুট ওপরে উঠতে হবে। শুধু তাই নয়, তারপরেও উঠতে হবে ওপরে। পৌঁছব শ্রীনগর বাসপথের উচ্চতম স্থান আপার-মুণ্ডায়। আপার-মুণ্ডা ৭২২৪ ফুট উঁচু।

"আচ্ছা, স্বামী অভেদানন্দ যখন অমরনাথে এসেছিলেন, তখনও কি পহেল-গাঁও থেকেই মূলযাত্রা আরম্ভ হত?" মিসেস মণ্ডল আবার আমাকে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে চান।

ফিরে আসায় দোষ কি? এখনও দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। অতএব চুপচাপ বসে না থেকে সেকালের যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক না, সময়টা সুন্দর কেটে যাবে। সুতরাং বলি, "যাত্রা বলতে আমরা যা বুঝি, মানে অমরনাথজীর ছড়ি নিয়ে যে তীর্থযাত্রা, তা সেকালে তো বটেই একালেও প্রকৃতপক্ষে শ্রীনগর থেকে শুরু হয়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ছড়ি তো থাকে শ্রীনগরে দশনামী আখড়াতে।" কথাটা মনে পড়ে মিসেস মণ্ডলের। তিনি যে প্রায় প্রতিবার যাত্রায় আসেন। মিসেস বলেন, "যাক্‌গে, স্বামী অভেদানন্দজী কিভাবে যাত্রায় এসেছিলেন, তাই বলুন।"

আমি বলতে থাকি, "অভেদানন্দজী একখানি সরকারী মোটরে চড়ে ২রা অগাস্ট শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও যাত্রা করেছিলেন। আগেই দু'খানি সরকারী টাঙ্গায় করে তাঁর মালপত্র পহেলগাঁও রওনা করে দেওয়া হয়েছিল।"

"শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও মোটরপথে ৬০ মাইল। এখন এই পথটুকু যেতে যাত্রীদের মাত্র দু-তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু তখন দিন তিনেক সময় লাগত। অথচ তখনও আইশমোকাম অর্থাৎ শ্রীনগর থেকে ৪০ মাইল মোটরপথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।"

"তাহলে অত সময় লাগত কেন?"

"কারণ তখনকার মোটরপথও ছিল ভয়ঙ্কর এবং দুর্গম। তাই খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে হত।"

"তাছাড়া তখন তো এত শক্তিশালী মোটরগাড়িও ছিল না।" ফকিরবাবু মিসেস মণ্ডলকে মনে করিয়ে দেন।

মিসেস মাথা নাড়েন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তখনও কি সরকার থেকে যাত্রার ব্যবস্থা করা হত?"

"হ্যাঁ, তখনও কাশ্মীর রাজ-সরকারের ধর্মার্থ বিভাগ ছিল। তাঁরাই যাত্রার সব ব্যবস্থা করতেন। প্রতিবছর রাজভাণ্ডার থেকে তাঁদের হাতে বারো হাজার করে টাকা দেওয়া হত। তাঁরা সেই টাকা দিয়ে রাস্তা ও সেতু তৈরি করতেন, দরিদ্র যাত্রী ও সাধুদের খাবার ও কম্বল দান করতেন। তাঁদের স্বেচ্ছাসেবকরা যাত্রীদের দুধ কাঠ কুলি ও ঘোড়া যোগাড় করে দিতেন। ছোট একটি বাজারও যাত্রার সঙ্গে যেতো। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে প্রায় পাঁচ শ' যাত্রী যাত্রায় গিয়েছিলেন।"

"মোটে পাঁচ শ'!" মিসেস মণ্ডল বিস্মিতা। বলেন, "এবারে তো অনুমান করা হচ্ছে, শুধু পূর্ণিমার যাত্রাতেই পঁচিশ হাজার যাত্রী হবে।"

"খুবই স্বাভাবিক।" মাঝখান থেকে অসীম বলে ওঠে। "দেশ এগিয়ে চলেছে।"

প্রবল হাস্যরোল।

হাসি থামলে আবার বলতে শুরু করি, "শ্রীনগর থেকে আইশমোকাম পর্যন্ত রাস্তা কিন্তু বেশ চওড়া ছিল। তবে কাঁচা রাস্তা, বৃষ্টি পড়লেই অগম্য হয়ে উঠতো।

"আইশমোকাম জায়গাটি বেশ বড় ছিল। অভেদানন্দজীর প্রায় পঁচিশ বছর আগে স্বামীজী অমরনাথ এসেছিলেন। তখনও আইশমোকাম বেশ বড় জায়গা। স্বামীজী সদলবলে রাত্রিবাস করেছিলেন সেখানে।

"অভেদানন্দজী আইশমোকামে মোটর ছেড়ে দিয়ে ঝাম্পান বা ডাণ্ডিতে চড়ে পহেলগাঁও গিয়েছিলেন। আইশমোকাম থেকে পহেলগাঁও ১২ মাইল। তখন সেপথে মোটর চলতে পারত না, তবে মোটরপথ তৈরি হচ্ছিল। অভেদানন্দ সকালে আইশমোকাম থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় পহেলগাঁও পৌঁচেছিলেন।

অর্থাৎ শ্রীনগর থেকে মোটরে ও ঝাম্পানে ৬০ মাইল পথ যেতে তাঁর তিনদিন লেগেছিল।"

"শঙ্কুদা! দেখুন, দেখুন..."

তুলতুলের কথায় কথা থামিয়ে তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই—বানিহাল গিরিবর্ত্ম। সত্যি সুন্দর।

কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যে হয়েছে। আঁধার নেমে এসেছে পথ আর পাহাড়ের গায়ে, বন আর নদীর বুকে। বাসের আলো ছাড়া আর কোথাও কোন আলো ছিল না। আঁধারের যবনিকা ভেদ করে বাস এগিয়ে চলেছিল।

প্রায় ছ' হাজার ফুট উঁচু দিয়ে বাস চলেছে। শীত শীত করছিল বলে বাসের জানলাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে গল্প কবছিলাম আর কেউ বা ঝিমুচ্ছিলেন। শুধু তুলতুল বোধহয় তাকিয়েছিল সামনেব উইণ্ড্স্ক্রীনের ভেতর দিয়ে, তাই সে প্রথম দেখতে পেয়েছে!

দেখতে পেয়েছে ঐ আলোর সুড়ঙ্গ। একটি নয়, পাশাপাশি দুটি সুড়ঙ্গ—বানিহাল গিরিবর্ত্ম। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আমবা অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি।

যাঁরা ঝিমোচ্ছিলেন, তাঁদের তন্দ্রা টুটে গিয়েছে। যাঁরা কাত হয়ে ছিলেন, তাঁরা সোজা হয়ে বসেছেন। আমরা যারা গল্প করছিলাম, তারা নীরব হযেছি। নীরবে অপরূপ আলোর গুহাদুটিকে দেখছি।

গতবার দিনের আলোয় দেখেছিলাম এই বানিহাল নেহেরু টানেল। কিন্তু তখন এত ভাল লাগে নি। আজ রাতের আঁধারে দেখলাম তাব প্রকৃত রূপ। অবশ্য এ রূপ আলোর রূপ—বৈদ্যুতিক আলোর। ভাগ্যিস 'লোড-শেডিং' হয় নি।

১৯৫৬ সালে এই টানেল নির্মিত হয়েছে, তার আগে ৯০০০ ফুট উঁচু বানিহাল গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে কাশ্মীরে আসতে হত। শীতকালে তুষারঝড় ও তুষারপাতের জন্য সে পথ হয়ে উঠত অগম্য। 'বানিহাল' শব্দের অর্থই তুষারঝড়। শীতের চারমাস ঐ গিরিবর্ত্মে তুষারঝড় লেগেই থাকে। ফলে তখন কাশ্মীর ও লাদাকের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের কোন যোগাযোগ থাকত না। এই টানেল তৈরি হবার পর থেকে সেই অসুবিধে দূর হয়েছে। এখন কাশ্মীর আমাদের নিকটতর।

টানেলের ভেতরে সারি সারি আলো জ্বলছে। একপাশে পথচারীদের জন্য ফুটপাত। পাশে নর্দমা, কারণ গুহার গা বেয়ে অবিরত জল চুইয়ে পড়ছে। আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের একটি অনবদ্য অবদান এই টানেল। সহযাত্রীরা তাই মুগ্ধ নেত্রে আলোর সুড়ঙ্গ দেখছেন।

পেরিয়ে এলাম বানিহাল টানেল, পৌঁছলাম কাশ্মীর উপত্যকায়। কিন্তু ভূস্বর্গের স্বর্গীয় রূপের সামান্যই দেখতে পাচ্ছি কাচের জানলার ভেতর দিয়ে। শুধু বলতে পারি মেটে জোছনা তাকে মোহময়ী করে তুলেছে।

তাছাড়া আমার অধিকাংশ সহযাত্রী বাসযাত্রার ধকলে রীতিমত ক্লান্ত। বানিহাল ছাড়াবার পরেই আবার তাঁরা সীটের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়েছেন, চোখ বুজে তন্দ্রার আরাধনায় মনোনিবেশ করেছেন।

আমার হাসি পাচ্ছে, নিজেদের শারীরিক শক্তির কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। বিজ্ঞান আমাদের কি রকম শ্রমবিমুখ করে তুলেছে! আর তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের মমত্ববোধ হ্রাস পেয়েছে, বৈচিত্র্যের প্রতি আমাদের আগ্রহ গিয়েছে কমে।

জম্মু থেকে ডিলাক্স বাসে চড়ে এই পথটুকু আসতেই আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি! আর সেকালে, বিশেষ করে মোগল যুগে? সম্রাটগণ? তাঁরা তো আগ্রা কিংবা দিল্লী থেকে হাতি চড়ে নিয়মিত কাশ্মীরে আসতেন।

কাশ্মীরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে সম্রাট আকবর ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর অধিকার করেন। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম স্থান ছিল কাশ্মীর। তিনি বার বার কাশ্মীরে এসেছেন। এই কাশ্মীর থেকে ফেরার পথেই ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। এখানে এসেছেন শাজাহান। তাঁরাই নির্মাণ করেছেন মোগল উদ্যান—চশমা শাহী, নিশাত বাগ, শালিমার বাগ ও নাসীম বাগ। তৈরি করেছেন অচ্ছাবল ও ভেরীনাগ। প্রকৃতিকে কতখানি ভালোবাসলে অত কষ্ট করে এত দূরে আসা যায়? সত্যই তাঁদের প্রকৃতিপ্রেম অতুলনীয়।

যাকগে, যেকথা ভাবছিলাম। গতবার বানিহাল গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে এপারে এসে আমরা বাস থামিয়েছিলাম। দিনের আলোয় প্রথম ভূস্বর্গকে দেখেছিলাম। আমি মুগ্ধ আবেশে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম প্রকৃতির অপরূপ লীলা-নিকেতনের দিকে। দু'দিকে দিগন্তের কাছে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ধূসর রেখা। নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলা। আর মাটিতে···। মাটিতে সবুজ, শুধুই সবুজ-সমতল। আমাদের পথটি সেই সবুজের জগতে গিয়ে মিলে মিশে একাকার। সবুজ উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি রূপোলী নদী। অনেক দূরে গিয়ে সে-ও সবুজের মাঝে গিয়েছে হারিয়ে।

আজ ভূস্বর্গের সেই অপরূপ রূপ আমি দেখতে পেলাম না দু'চোখ ভরে। রাতের আঁধার আজ আড়াল করে রেখেছে তাকে।

তাই পায়লট গাড়ি থামায় নি। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আরও ২৪ মাইল

এগিয়ে আমরা পৌঁছব ভেরীনাগ পথের সঙ্গমে। সেখান থেকে কাশ্মীরের প্রাণধারা ঝিলমের উৎস ভেরীনাগ মাত্র ২ মাইল। যাতায়াতের পথে সব সরকারী ট্যুরিস্ট বাস যাত্রীদের ভেরীনাগ নিয়ে যায়।

"ফকিরকাকু, আমরা কি তাহলে ভেরীনাগ দেখছি না?" তুলতুল হঠাৎ প্রশ্ন করে। সে-ও বোধকরি আমার মতই ভেরীনাগের কথা ভাবছিল বসে বসে। আমি তো তবু একবার দেখেছি সেই মনোরম স্থান। কিন্তু তুলতুল এই প্রথম কাশ্মীরে এলো।

ফকিরবাবু আশ্বস্ত করেন তাকে। বলেন, "দেখবে বৈকি! তবে আজ নয়, আজ যে রাত হয়ে গেল। ফেরার দিন তোমাদের ভেরীনাগ দেখিয়ে দেব।"

"সেদিন আবার রাত হবে না তো?" তুলতুল নিশ্চিন্ত হতে চাইছে।

এবারে মিসেস মণ্ডল জবাব দেন। মৃদু হেসে বলেন, "সেদিন তো সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা হবে। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবে ভেরীনাগ।"

"মনে থাকে যেন।"

ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল সমস্বরে প্রতিশ্রুতি দেন, "নিশ্চয়ই থাকবে।"

আর সে প্রতিশ্রুতিতে শুধু তুলতুল নয়, সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই পুলকিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ফেরার যে অনেক দেরি। সুতরাং সে ভাবনা এখন থাক। আজ যাবার কথা হোক।

ভেরীনাগ পথের সঙ্গম ছাড়িয়ে মাইল পাঁচেক এগিয়ে গেলে আপার-মুণ্ডা—জম্মু-শ্রীনগর পথের উচ্চতম স্থান, ৭২২৭ ফুট। আপার-মুণ্ডা স্বাস্থ্যকর স্থান। সেখানে একটি ডাকবাংলো আছে।

আপার মুণ্ডা থেকে ১০ মাইল এগিয়ে আমরা পৌঁছব কাজিগুণ্ড্—একটি ছোট জনপদ। ডাকবাংলো আছে।

কাজিগুণ্ড্ থেকে আরও ১২ মাইল এগিয়ে খানাবল—জম্মু-শ্রীনগর-পহেলগাঁও পথের সঙ্গম। তার মানে সেখান থেকে আমাদের পথ যাবে বেঁকে। খানাবল থেকে শ্রীনগর ৩২ মাইল ও পহেলগাঁও ২৮ মাইল। খানাবল একটি সমৃদ্ধ শহর, উচ্চতা ৫২৩৬ ফুট। সেখান থেকে আরেকটি পথ গিয়েছে জেলাসদর অনন্তনাগে।

অমরনাথ থেকে শ্রীনগরে ফিরে একদিন যেতে হবে অনন্তনাগ। দেখতে হবে সেই অভিনব উদারতীর্থটিকে। একই ঝরণার তীরে পাশাপাশি তিনটি তীর্থ—একটি মন্দির, একটি গুরুদ্বার ও একটি মসজিদ। একই ঝরণার জলে পুণ্যস্নান করেন হিন্দু শিখ ও মুসলমান ভক্তবৃন্দ। কাশ্মীরে যখন এসেছি,

আমাকে আরেকবার যেতেই হবে সেই মহামানবের মিলনতীর্থে।

কিন্তু সে-ও তো ফেরার পথে। ফেরার এখনও অনেক দেরি। সুতরাং সেকথা আজ নয়। আজ যাবার পথের কথা হোক, পহেলগাঁও পথের কথা—অমরতীর্থ-অমরনাথের পথ।

খানাবল থেকে পথের দিক পরিবর্তিত হবে। উত্তরের পথ ছেড়ে আমরা উত্তর-পুবের পথে এগিয়ে যাবো। পথে পড়বে মার্তণ্ড মন্দির ও আইশমোকাম।

ঝরণাবিধৌত নতুন মার্তণ্ড মন্দিরটি ভারী সুন্দর। মার্তণ্ড একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ। অমরনাথের পূজারীরা বাস করেন সেখানে। তার চেয়েও বড় কথা সেই জনপদের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মার্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭৫ সালের অগাস্ট মাসে ডঃ এরিক ফন্ দানিকেন এসেছিলেন সেখানে। 'গাইগার কাউণ্টার' যন্ত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে মন্দিরের উত্তরদ্বারে বাহান্ন মিটার দীর্ঘ ও দেড় মিটার প্রশস্ত জায়গা অসম্ভব রকম তেজস্ক্রিয়। জায়গাটি উত্তর দ্বারের বাইরে থেকে মন্দিরের বেদী পর্যন্ত প্রসারিত। বেদির নিচের অংশে তেজস্ক্রিয়তা সবচেয়ে তীব্র। তাঁর বক্তব্য আড়াই হাজার বছর আগে গ্রহান্তরের মানুষদের সেই মহাকাশযান ইজেকিয়েলকে নিয়ে ওখানে অবতরণ করেছিল।*

মহাকাশযান অবতরণ করার পরে সেখানে তেজস্ক্রিয়তার অবশেষ ফেলে গেলে সেখানকার মাটি তেজস্ক্রিয় হবে কিন্তু সেই তেজস্ক্রিয়তা আড়াই হাজার বছর পরেও এত বেশি থাকতে পারে কিনা এবং বেদিমূলেই বা তেজস্ক্রিয়তা তীব্রতম কেন—তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা আলোচনা চলেছে। আমি পণ্ডিত নই সুতরাং সে আলোচনার অধিকার আমার নেই। আমার শুধু ইচ্ছে, কাশ্মীরে যখন আবার এসেছি, তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটিকে দেখে যাবো একবার।

কথাটা ফকিরবাবুকে বলতে তিনি সেই একই কথা বলে- "ফেরার পথে শ্রীনগর থেকে ট্যাক্সি নিয়ে একদিন এসে দেখে যাবেন Martand ruins। গোপাল সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

অতএব চুপ করে থাকি। কাচের জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কাশ্মীর উপত্যকাকে এখনও তেমনি মোহময়ী মনে হচ্ছে।

বাস এগিয়ে চলেছে পহেলগাঁওয়ের পথে—যে পহেলগাঁও থেকে শুরু হবে অমরতীর্থ-অমরনাথের পথ-পরিক্রমা।

* ডঃ দানিকেনের 'দেবতারা কি গ্রহান্তরের মানুষ' ও 'আবির্ভাব' গ্রন্থ দু'খানি দ্রষ্টব্য।

॥ তিন ॥

সকালে জলখাবার খেয়ে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম নিউ পাইনভিউ হোটেল থেকে। আমরা মানে সরকারদা মামা-ভাগনে বাসুদেব অশোক অসীম ব্রহ্মচারী ও আমি। সঙ্গে কোন মহিলা নেই বলে ফকিরবাবু হোটেলের তিনতলায় একপ্রান্তে পাশাপাশি দু'খানি ঘর দিয়েছেন আমাদের। ঘরগুলো ভালই—সামনে প্রশস্ত বারান্দা, লাগোয়া বাথরুম। চারখানি করে খাট। ব্রহ্মচারী সরকারদা ও অসীমের সঙ্গে আমি একঘরে রয়েছি। পাশের ঘরে মামা-ভাগনে বাসুদেব ও অশোক।

গতকাল রাত এগারোটায় বাস পহেলগাঁও পৌঁচেছে। পহেলগাঁও ৭৫০০ ফুট উঁচু। কাজেই তখন বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। একে গভীর রাত, তার ওপরে শীত। সুতরাং কাল পহেলগাঁওয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি বললেই চলে। ভালই হয়েছে। আজ সকালে সোনালী রোদের ওড়না মাথায় পহেলগাঁওয়ের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হল।

হোটেল থেকে বাঁধানো উৎরাই পথ বেয়ে আমরা বাজারের দিকে চলেছি। পথের ডানদিকে ঘাসে-ছাওয়া সবুজ প্রান্তর। আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে পাশের পাহাড়ে মিশেছে। পাহাড়ে পাইনের সারি। এখানকার ফিকে-সবুজ ওখানে গিয়ে ঘন-সবুজ হয়েছে।

পথের বাঁদিকে বাড়ি-ঘর—হোটেল আর কটেজ। তারপরে প্রধান সড়ক, আরেক সারি বাড়ি-ঘর। অবশেষে লিডার-পহেলগাঁওয়ের প্রাণধারা নীলগঙ্গা। এই রমণীয় শৈলাবাসের আরেকনাম লিডার উপত্যকা।

লিডার নদীর মূল-ধারাটির জন্ম হয়েছে পহেলগাঁও থেকে ২২ মাইল দূরের কোলাহাই হিমবাহে। 'কোল্‌হা' শব্দের অর্থ নদী। পর্যটকরা অনেকেই এখানে এসে উৎসটি দেখে যান। তিন দিন সময় লাগে। খুব সকালে পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করলে ৭ মাইল চড়াই ভেঙে দুপুরে ৮৯৫২ ফুট উঁচু আরু গ্রামে পৌছন যায়। আরুতে খাওয়া সেরে আরও ৮ মাইল চড়াই পেরিয়ে লিডারওয়াট (৯৭২০´)। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে তাঁরা ৮ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে কোলাহাই (প্রায় ১১,০০০´) যান। লিডারের অপরূপ উৎস

দর্শন করে সন্ধ্যের আগেই লিডারওয়াটে নেমে আসেন। পরদিন তাঁরা ফিরে আসেন পহেলগাঁও। অনেকে অবশ্য আরও একটা দিন লিডারওয়াটে থেকে ৩ মাইল দূরের তারসার হ্রদটি দেখে আসেন। ১২,৫৩০ ফুট উঁচু সেই নীলাভ হ্রদটির সৌন্দর্য নাকি অবিস্মরণীয়।

লিডার নামটি সম্পর্কে ছুটি মত রয়েছে। কেউ বলেছেন—পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অসংখ্য পাহাড়ী নদী এখানে এসে প্রথম সমতলে অবতরণ করেছে। কোলাহাই থেকে নিঃসৃত নদীটি তাদের নেতা—'Leader' তাই তাদের মিলিত ধারার নাম লিডার নদী।

আবার কেউ বলেছেন—পহেলগাঁও থেকে কয়েকমাইল দূরে মামলীশ্বর নামে একটি পাহাড়ী গ্রাম আছে। এই মামলীশ্বর নামটি এসেছে সংস্কৃত 'মা' অর্থাৎ 'না' শব্দ থেকে।

কথিত আছে একবার পুত্র গণপতিকে নিয়ে মহাদেব উপস্থিত হলেন সেই গ্রামে। জায়গাটি খুব ভাল লাগল তাঁর। তিনি সেখানে এক গুহায় আসন পাতলেন। গণেশকে বললেন—কাউকে ঢুকতে দিবি না এখানে। কেউ এলে বলে দিবি, এখন দেখা হবে না।

কিন্তু মহেশ্বর হচ্ছেন ত্রিভুবনের রক্ষক ও সংহারক। তিনি অজ্ঞাতবাসে থাকলে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে।

নানা পরামর্শ ও আদেশের জন্য একে একে দেবতারা শিবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে থাকলেন। পিতৃভক্ত গণেশ তাঁদের বাধা দিয়ে বলবেন—মা, মাস্ম, নৈব নৈব চ। না, না, না।

অবশেষে স্বর্গরাজ ইন্দ্র এসে হাজির হলেন সেখানে। তিনিও শিবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু লম্বোদরের সেই এক কথা। দেবরাজ সেকথা শুনবেন কেন? তিনি জোর করে ভেতরে যেতে চাইলেন। ফলে গণপতির সঙ্গে শচীপতির যুদ্ধ লেগে গেল। ভীষণ যুদ্ধ। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—যুদ্ধ চলতে থাকল।

কয়েকদিন বাদে শ্রান্ত হলেন গণেশ। তাঁর খুব পিপাসা পেলো। পাশেই বয়ে যাচ্ছে নদী। তৃষ্ণার্ত গণপতি এক চুমুকে নদীর সব জল খেয়ে ফেললেন।

বিশ্রামরত মহাদেব বুঝতে পারলেন একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ত্রিশূল হাতে ছুটে এলেন বাইরে। যুদ্ধরত লম্বোদর ও পুরন্দরকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি তিনি দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ থামালেন।

তারপরে নিরুপায় পিতা ত্রিশূল দিয়ে পুত্রের পেট ফুটো করে নদীকে মুক্ত

করে দিলেন। লম্বোদরের উদর থেকে সৃষ্ট সেই নদীর নাম হল লম্বোদরী। লিডার শব্দটি লম্বোদরীর অপভ্রংশ।

পথ চলতে চলতে অশোকও বোধ হয় আমার মতই লিডারের কথা ভাবছিল। আর তাই হয়তো সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "আচ্ছা শঙ্কুদা, লিডারের আরেক নাম তো নীলগঙ্গা?"

মাথা নেড়ে বলি, "হ্যাঁ।"

"নামটা কেন হয়েছে বলতে পারেন?"

"আমি পারি।" মামা মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"বেশ তো বলুন।" অশোক উৎসাহিত।

মামা প্রশ্ন করে, "তুমি তো জানো আমাদের চন্দনবাড়ি ও পিসু চড়াই হয়ে অমরনাথে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ।" অশোক মাথা নাড়ে।

মামা বলতে থাকে, "সেই চন্দনবাড়ি ও পিসু ঘাটির মাঝখানে লিডারের তীরে তীর্থস্থানেশ্বর নামে একটি রমণীয় স্থান আছে। একবার হর-পার্বতী সেখানে মধুযামিনী যাপন করেছিলেন। মিলনকালে মহাদেব একদিন চুম্বনে চুম্বনে রাঙিয়ে দিলেন মহাদেবীর কপোল আর নীলাঞ্জনা দুটি আঁখি পল্লব।"

শিব শান্ত হবার পরে পার্বতী লিডারের স্বচ্ছ শীতল ধারায় তাঁর চুম্বনসিক্ত চোখের নীল কাজল ধুয়ে ফেললেন। স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতস্বিনী নীলাঞ্জনে নীল-ধারায় রূপান্তরিত হল। তার নাম হল নীলগঙ্গা। আজও তাই নীলগঙ্গা হর-পার্বতীর প্রেমগীতি গেয়ে চলেছে।

কিন্তু নীলগঙ্গা এখান থেকে অনেকটা দূরে। তার কথা আর নয়। তার চেয়ে পথের কথা বলা যাক—পাইনবনে ছাওয়া পহেলগাঁওয়ের প্রাণজুড়ানো পথ।

পথের ওপরে অত ভিড় কেন ওখানে? শুধু মানুষের নয়, ঘোড়ার। ঘোড়ার সংখ্যাই বেশি। ব্যাপারটা কি?

জনৈক স্থানীয় পথচারীকে জিজ্ঞেস করি কথাটা। তিনি উত্তর দেন, "ট্যাক্স-টোকেন দেওয়া হচ্ছে।"

ট্যাক্স-টোকেন! সে তো নিতে হয় গাড়ির জন্য! তাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "মানুষ ও ঘোড়ার জন্য ট্যাক্স-টোকেন?"

"জী, হাঁ। হিমালয়ে মানুষ ঘোড়া ও গাড়ি একই কাজ করে—'দে আর মিডিয়াম্ অব্ ট্র্যান্সপোর্ট।' তাই যাত্রায় যাবার জন্য মানুষ ও ঘোড়াকে ট্যাক্স দিয়ে 'টোকেন' নিতে হচ্ছে।"

মানুষ ও ঘোড়ার জন্ম এ... ...।

ঘোড়ার অফিস ছাড়িয়েই পথটি বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে। এখন পথের দুধারেই বাড়ি-ঘর। বাড়ি মানে হোটেল। পহেলগাঁও পর্যটকের শহর, এখানে নিবাস মানেই পান্থনিবাস।

প্রধান সড়কে পৌঁছন গেল। বাঁদিকে পোস্টঅফিস, ডানদিকে বাসস্ট্যাণ্ড। আমরা বড় রাস্তা দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে চলি। এই রাস্তাটাই পহেলগাঁওয়ের হৃদপিণ্ড। দুপাশে ঝক্‌ঝকে দোকান ব্যাঙ্ক অফিস হোটেল ও রেস্তোরাঁ। ফুটপাত হকার্স-কর্ণার। হকারদের কাছে অবশ্য যাত্রার জিনিসই বেশি—সোয়েটার বর্ষাতি জুতো কম্বল প্লাস্টিক-শীট হ্যাভারস্যাক লাঠি টুপি মোজা—সবই রয়েছে। কেবল কেনার জন্য নয়, ভাড়া নেবার ব্যবস্থাও আছে। জিনিসের দাম জমা দিলেই জিনিস পাওয়া যাবে। ফিরে এসে ফেরৎ দিলে নির্দিষ্ট ভাড়া কেটে বাকি টাকা ফিরিয়ে দেবেন দোকানদার।

দোকান বসেছে বই মানচিত্র প্রসাদ ও পুজোর উপকরণের। পুজোর উপকরণ বলতে একটুকরো লাল কাপড়ে বাঁধা একটি নারকেল এবং কিছু ফুল ও বেলপাতা। বেলপাতা অবশ্য বেলগাছের পাতা নয়। বেলগাছ জন্মায় না এ অঞ্চলে। অন্য একরকম পাতাকে এঁরা বেলপাতা বলছেন। বলছেন—এই বেলপাতা পেলেই নাকি বাবা অমরনাথ সন্তুষ্ট হন। হতে পারেন। কারণ দেবতাদের মধ্যে ভোলানাথ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি 'এ-কমোডেটিভ'।

পথে বেশ ভিড়। পথচারীদের অধিকাংশ যাত্রী। প্রায় সকলেই কেনা-কাটা করছেন। আমাদেরও কিছু কেনা-কাটা আছে। কিন্তু এখন নয়, বিকেলে বাজার করা যাবে। এখন দেখে নিই সব।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। আমাদের সামনে একজন যুবক ও দুটি যুবতী। তাদের গায়ে দামী প্যাণ্ট-কোট কিন্তু পায়ে জুতো নেই। কি জানি, বোধহয় মন্দিরে যাচ্ছেন, তাই খালিপায়ে বেরিয়েছেন। কাজটা ভাল করেন নি। একে শিশিরসিক্ত শীতল পথ, তার ওপরে অশ্বপুরীষে প্রলিপ্ত।

"দেখুন, দেখুন!"

বাসুদেবের কথায় সেদিকে তাকাতে হয়। সত্যই অভিনব! না, পাগল কিংবা ভিক্ষুক নয়। এমনকি ভারতবাসী পর্যন্ত নয়। জনৈকা মেমসাহেব। বয়সে যুবতী, দেখতে সুশ্রী। সঙ্গে যুবক সাহেব। যুবকের মুখে খোচা খোচা দাড়ি, পিঠে রুকস্যাক্‌। দুজনেরই পরনে প্যাণ্ট-সার্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। যুবতী যুবকের হাত ধরে পথ চলেছে।

এ পর্যন্ত দেখবার কিছু ছিল না। এমন বহুজোড়া সাহেব-মেম আজ পহেলগাঁওয়ে এসেছে। তারা সবাই যাত্রায় যাবে। অমরনাথ শিবতীর্থ। জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার সেখানে।

আমরা ওদের, বিশেষ করে মেয়েটিকে দেখছি অন্য কারণে। কেউ বোধহয় তাকে একটুকরো চট দিয়েছে। টুকরোটার মাঝখানে খানিকটা কেটে তার ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে সেটাকে জামার মতো গায়ে দিয়ে নিয়েছে সে। শুধু তাই নয়, একহাতে সাহেবের হাত ধরে অপর হাতে নিয়ে চলেছে একটা নেড়ীকুকুরের বাচ্চা। কোথায় যেন কুড়িয়ে পেয়েছে বাচ্চাটাকে। গলায় দড়ি বেঁধে সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এবং তার চটের জামা ও হাতের কুকুরই বাসুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শুধু আমরা নই, আরও অনেক পথচারী মেমসাহেবের পোষাক আর পোষ-না-মানা কুকুরটাকে দেখছে। এবং তারা সবাই আমাদের মতো নীরব দর্শক নয়। কেউ-কেউ হাসি-ঠাট্টা করছে। মেমসাহেব অবশ্য নির্বিকার। বোধকরি সে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সেই উপদেশটি শুনে থাকবে—লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক।

মূল-পথ থেকে একটি পথ বাঁদিকে লিডারের কাছে চলে গেল। এখানে শেষ হল বাজার, শুরু হল মেলা—সাধুর মেলা। পথের ডানদিকে তারকাটার বেড়া দেওয়া একটা পার্ক, বাঁদিকে ময়দান—একেবারে লিডারের বেলাভূমি পর্যন্ত প্রসারিত।

না, ময়দান নয়, কলোনী—তাঁবুর কলোনী। ছোট-বড়, সাদা ও রঙীন সারি সারি তাঁবু। এ দৃশ্য কিছু নূতন নয় এখানে। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এখানে এসেছিলেন। সেদিন তিনি এই একই দৃশ্য দেখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'উপত্যকাটির নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনী পড়িল।... তিনি (স্বামীজী) তাঁহার কন্যাকে (নিবেদিতা) আশীর্বাদ লাভে ধন্য হইবার জন্য ছাউনীর চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন,—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে (স্বামীজীকে) ধনী ভাবিয়াই হউক, অথবা শক্তিমান বুঝিয়াই হউক, পরদিন আমাদের তাঁবুটি ছাউনীর পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়া নিয়াছিল।'

স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রায় এসেছিলেন। এই তাঁবুর কলোনী সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'নীলগঙ্গার তীরে [illegible] মাঠ আছে। তথায় চারিটি সমতলভূমিখণ্ডে যাত্রীদের তাঁবু পড়িয়াছে।'

আগেই বলেছি, আমাদের এই পথের বাঁদিক থেকে শুরু করে লিডারের তীর অবধি তাঁবু পড়েছে। তবে পথের সংলগ্ন অংশে তাঁবুর সংখ্যা কম। কারণ পরপর কয়েকটি মন্দির রয়েছে এখানে।

তাছাড়া পথের পাশে মেলা বসেছে। দোকান-পাট নয়, সাধুর মেলা। সারা ভারত থেকে সন্ন্যাসীরা এসেছেন এখানে।

কেউ ত্রিপল কিংবা 'প্লাস্টিক শীটে'র অস্থায়ী ছাউনী করে নিয়েছেন, কেউ-বা গাছের ছায়ায় আসন পেতেছেন। কেউ একা, কেউ শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত। তবে সবার সামনেই ধুনি জ্বলছে।

পহেলগাঁও আজ অমরনাথ যাত্রাপথের সঙ্গম। সারা ভারত থেকে যাত্রীরা সমবেত হয়েছেন এখানে। তাঁদের মধ্যে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা মোটেই সামান্য নয়। সাধুরা এসেছেন নির্বানী, নিরঞ্জনী ও জুনা প্রভৃতি আখড়া থেকে। এসেছেন শৃঙ্গেরী গোবর্ধন ও সারদা প্রভৃতি মঠ থেকে। এসেছেন রামেশ্বর, পুরুষোত্তম, দ্বারকা ও বদ্রীনাথ ধাম থেকে।

এসেছেন ভুরিবার, ভোগবার, কীটবার ও আনন্দবার ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু। এসেছেন নানা বয়সের, নানা চেহারার ও নানা পোষাকের সন্ন্যাসী। দণ্ডীধারী, দিগম্বর, ব্রহ্মচারী, অবধূত ও অবধূতানী কেউ বাদ পড়েন নি। কাপালিক-ভৈরবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সবাই আছেন। আছেন উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী থেকে নামাবলী গায়ে বাবাজী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক পোষাকের সন্ন্যাসী।

কেউ নেংটি পরে ভস্ম মেখে বসে আছেন। কারও মাথায় জটা, কারও সাঁইবাবার মতো চুল, কারও বা মুণ্ডিত মস্তক। কেউ কম্বল গায়ে ঘর ছালের ওপর বসে আছেন, কেউবা গেরুয়া গায়ে গাঁজায় দম দিচ্ছেন। সমস্ত আখড়ার সব মঠের সব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা আজ সমবেত হয়েছেন এখানে। এঁরা প্রত্যেকে যাত্রায় যাবেন। এঁরা সবাই আমার সহযাত্রী। আর তাই হয়তো অনেকেই পয়সা চাইছেন।

আমরা নির্বিকার চিত্তেই এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু এবারে থামতে হল। জনৈক ভস্মমাখা মুণ্ডিত মস্তক দিগম্বর যুবক সন্ন্যাসী আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা-বাংলায় বলছেন, "এ বঙালীবাবু! সাধু-মহাত্মাকে কুছ দে দে। হামি ডায়মণ্ডহারবারে থাকি, বাবা অমরনাথজীকা যাত্রায় যাচ্ছে। কুছ দে দে…"

আমার এবং মামার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, তাছাড়া আগেই বলেছি যাত্রীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। সুতরাং ডায়মণ্ডহারবারবাসী

সাধুজীর পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে আমরা বাঙালী। আর তিনি যখন বাংলায় থাকেন, তখন বাঙালীর পথ আগলে দাঁড়াবার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে।

অতএব একটা টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিই। তিনি পথ ছেড়ে দেন, আমরা এগিয়ে চলি।

কিন্তু আবার থামতে হয়। না, এবারে আর কেউ পথ আগলে দাঁড়ায় নি, নিজেরাই থামতে বাধ্য হয়েছি। পথের পাশে গাছের তলায় প্লাস্টিকের শীট বিছিয়ে বসে আছে জনৈক লাল কাপড় পরা স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ যুবক সন্ন্যাসী। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও সোনার হার, হাতে ঘড়ি। সামনে আগুন জ্বলছে, চকচকে চিমটা ও কমণ্ডলু পড়ে আছে। প্রোথিত রয়েছে একখানি সিঁদুরমাখা ঝকঝকে ত্রিশূল।

সন্ন্যাসীর নয়ন নিমীলিত, তিনি পদ্মাসীন। তাঁর একপাশে একটি তরুণ ব্রহ্মচারী, আরেকপাশে জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী। ব্রহ্মচারী গুরুজীর পা টিপছে। আর সুদর্শনা শ্বেতাঙ্গিনী ভৈরবী অর্ধনিমীলিত চোখে তার প্রার্থিত-পুরুষের দিকে রয়েছে তাকিয়ে।

হঠাৎ বাংলায় বেশ জোরে জোরে বলে ওঠে অসীম, "মেয়েটা মাইরি সত্যি সুন্দরী! স্বাস্থ্যখানা দেখেছেন?"

কথাটা মিথ্যে বলে নি সে, তবু আমরা তাকে সমর্থন করতে পারি না, সন্ন্যাসী চোখ মেলেছেন। তিনি কটমট করে অসীমের দিকে তাকিয়েছেন। সর্বনাশ হল দেখছি! বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এ কি করল অসীম?

সে কিন্তু মোটেই বিচলিত হয় নি। সন্ন্যাসীর চোখে চোখ রেখেই আবার বলল, "সত্যি বলছি ঘোষদা, এমন ভৈরবী পেলে আমি বউ-ছেলে ছেড়ে দিয়ে আজই কাপালিক হয়ে যেতে রাজী আছি।"

"চলে যাও এখান থেকে···" সন্ন্যাসী প্রায় লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছেন, মুহূর্তে ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে আবার অসীমকে বললেন, "চলে যাও বলছি, I say clear out..."

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু অসীম এখনও অবিচলিত। সে সহসা নত হয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে নমস্কার করে সন্ন্যাসীকে। তারপরে সবিনয়ে বলে, "আপনার আদেশ শিরোধার্য, আমরা চলে যাচ্ছি মহারাজ! কিছু মনে করবেন না। যা বলেছি, তা আমার মনের কথা নয়। আপনি বাঙালী কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্যই কথাগুলো বলেছি। অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা করবেন।"

আমাদের সঙ্গে সন্ন্যাসীও হো হো শব্দে হেসে ওঠেন। তিনি ত্রিশূল রেখে দিয়ে আবার বসে পড়েন। তাঁর ভৈরবী রীতিমত বিস্মিতা।

হাসি থামলে অসীম আবার বাংলায় সন্ন্যাসীকে বলে, "বাবা সুবিধেমত মেমসাহেবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন, উনি খুশি হবেন। মেয়েরা নিজের রূপের প্রসংসা শুনলে খুশি হন, তা তিনি যে দেশেরই মেয়ে হোন।"

"তুই ভারী দুষ্টু!" সন্ন্যাসী সহাস্যে বলে ওঠেন।

আমরা তাঁকে নমস্কার করে এগিয়ে চলি।

কয়েক পা এগিয়ে বাঁদিকে বেশ বড় একটি তাঁবু। সামনে ফেস্টুন—

'DIVINE THE MAN
RAJAYOGA EXHIBITION'

"এখন নয়, পরে কোন সময় দেখা যাবে।" অসীম আমাদের থামতে দেয় না। সে এগিয়ে চলে, আমরা তাকে অনুসরণ করি।

কয়েকটি কিশোর-কিশোরী ইউনিফর্ম পরে পিঠে হ্যাভারস্যাক্ নিয়ে সারি বেঁধে কোথায় যেন চলেছে। মনে হচ্ছে ওরাও যাত্রায় যাবে।

কেন? কিসের আশায় এই বয়সে ওরা সেই কষ্টকর পরিক্রমার সামিল হতে চাইছে? শুধুই কি এ্যাডভেঞ্চারের মোহে? না, আরও কিছু?

এই কিশোর-কিশোরীদের দেখে আমার মনে পড়ছে ভারতীয় পর্বতারোহণের জনক মেজর এন. ডি. জয়ালের কথা। তিনি চোদ্দ বছর বয়সে এক সহপাঠীর সঙ্গে হেঁটে অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। কে বলতে পারে, এদের মধ্য থেকে আরেকজন নান্দু জয়াল কিংবা সুজয়া গুহ তৈরি হবে না?

গানের শব্দে ভাবনা থেমে যায়। থমকে দাঁড়াই। পথের পাশে চায়ের দোকানে ট্রানজিস্টারে বিবিধ-ভারতীর গান বাজছে।

বিবিধ-ভারতী তো এখন সারা ভারতের আনন্দ-সুর। কাজেই বিবিধ-ভারতীর গান শুনে থমকে দাঁড়াই নি। থমকে দাঁড়িয়েছি দোকানীকে দেখে। তাঁর পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, পা দু'খানি পাদুকাহীন। তীর্থপথে আর কখনও আমি কোন সাধুকে চায়ের দোকান খুলতে দেখি নি।

কিশোরকুমারের গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি। মনে পড়ছে গৌতমের কথা। সে কিশোরকুমারকে বড়ই ভালোবাসে। আসার সময় তাকে শয্যাশায়ী দেখে এসেছি। অসুস্থ ছেলেকে বাড়িতে ফেলে যাত্রায় বেরিয়েছি। তারপর থেকে আর তার কোন খবর পাই নি। অথচ কথা ছিল এখানকার ঠিকানায় ওর একটা খবর আসবে।

সময় যায় নি। আজও চিঠি আসতে পারে। তাছাড়া বাবা অমরনাথের কৃপায় গৌতম এতদিনে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে গিয়েছে।

সামনে সাইনবোর্ড—'GURUDWARA, Pahalgam.' পাশেই একটু উঁচু খুঁটির সঙ্গে ঝাণ্ডা উড়ছে—শিখদের ধর্মীয় পতাকা।

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি। কয়েক পা এগিয়ে ডানদিকে গুরুদ্বার। কাঠ ও টিনের বাড়ি। সামনে বারান্দা, তারপরে একখানি প্রশস্ত হল-ঘর—মন্দির।

আমরা বারান্দা পেরিয়ে মন্দিরদ্বারে আসি। ভেতরে ঢুকতে পারি না। সারা ঘর জুড়ে ভক্তরা বসে রয়েছেন। জনৈক ভক্ত হারমনিয়াম বাজিয়ে ভজন গাইছেন। ধূপ ও ফুলের গন্ধে আমোদিত মন্দির। বাইরে কোলাহল কিন্তু ভেতরে একটা আশ্চর্য সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ।

মন্দিরের মাঝখানে বেদির ওপরে গ্রন্থসাহেব। অজ্ঞানতা অধর্মের মূল-কারণ। তাই প্রত্যেক ধর্মের অবতার ও মহাপুরুষগণ মানুষকে জ্ঞান আহরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু শিখরা ছাড়া আর কেউ ধর্মগ্রন্থকে বিগ্রহ জ্ঞানে পূজা করেন বলে জানা নেই আমার।

প্রণাম করে নেমে আসি গুরুদ্বার থেকে। সামনের প্রাঙ্গণে কয়েকটি তাঁবু। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রায় যাবার জন্য যে-সব শিখ তীর্থযাত্রী পহেলগাঁও এসেছেন, গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষ তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন এখানে। শুধু থাকা নয়, খাবার ব্যবস্থাও রয়েছে। একটা ত্রিপলের ছাউনীর নিচে বিরাট বিরাট উনুনে রান্না হচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

একজন বৃদ্ধ শিখ কাছে আসেন। মামা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেন, "মহোৎসব হবে নাকি?"

সর্দারজী সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করেন, "আপনারা প্রসাদ পেতে চান কি?"

"পেলে তো ভালই হয়।" অসীম মামার হয়ে উত্তর দেয়।

সর্দারজী বলেন, "তাহলে চলে আসুন বেলা একটা নাগাদ।"

"ধন্যবাদ।"

সর্দারজীকে নমস্কার করে আমরা বেরিয়ে আসি গুরুদ্বার থেকে। রাস্তায় এসে ব্রহ্মচারী বলে, "অসীমদা, আপনি নিশ্চয়ই ভাল অভিনয় করেন?"

"পণ্ডিত, তুমি দার্শনিক মানুষ।" অসীম গোড়া থেকেই ব্রহ্মচারীকে পণ্ডিত বলে ডাকছে। "তুমি এসব ঠিক বুঝতে পারবে না।"

"সত্যি পারছি না দাদা!" ব্রহ্মচারী বলে, "আমরা কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্-এর যাত্রী,

নিউ পাইনভিউ হোটেলে রয়েছি। আমাদের পক্ষে এঁদের মহোৎসবের খবর নেওয়া নিতান্তই রসিকতা।"

"পণ্ডিত তুমি দার্শনিক মানুষ, তাই তোমার কাছে এটা অভিনয় অথবা রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আমি ওঁদের উদারতা যাচাই করার জন্য প্রসাদ পেতে চাইলাম।" একবার থামে অসীম। তারপরে আবার বলে, "তার চেয়ে বড় কথা, এখানে এসে শিখদের সংগঠনটি দেখে গেলে। ভেবে দেখো, কত বাঙালী আজ এখানে এসেছেন! তাঁরা অনেকেই খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। যাঁরা পেরেছেন, তাঁদের জলের মতো পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। আর এইমাত্র দেখে এলে শিখরা সবাই এখানে আশ্রয় ও খাদ্য পাচ্ছেন। যাত্রাপথেও তাঁদের জন্য এমনি ব্যবস্থা থাকবে। ফলে কত কম খরচে, কত ভালভাবে শিখ ভক্তরা তীর্থযাত্রা শেষ করতে পারবেন। এই সংগঠন শক্তির জন্যই পাঞ্জাবে আজ উদ্বাস্তু সমস্যা বলে কিছু নেই। স্বাধীন হবার পরেও পাঞ্জাব দুবার বিভক্ত হয়েছে। তবু আজ পাঞ্জাব ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাজ্য।"

অসীম থামতেই সরকারদা বলেন, "আমাদের দেশের সর্বত্রই কিন্তু তীর্থযাত্রার এটাই নিয়ম ছিল। এখন শুধু শিখ ও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ের মাঝে পুরনো নিয়মটা টিকে আছে।"

ব্রহ্মচারী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে বলতে পারে না। তার আগেই নজর পড়ে ওদের দিকে—বিবদমান সন্ন্যাসীদ্বয়ের দিকে। একজনের হাতে ত্রিশূল, আরেকজনের হাতে প্রকাণ্ড একটা চিমটা। তাঁরা কুৎসিৎ ভাষায় উভয়কে গালাগালি করছে এবং একে অপরকে আঘাত করতে উদ · হয়েছে।

অশোক আর ভাগনে ছুটে গিয়ে দুজনে দুজনকে ধরে ফেলে। আমরাও হাত লাগিয়ে ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাত থেকে ত্রিশূল ও চিমটা কেড়ে নিই। কয়েকজন সাধু এগিয়ে আসেন। তাঁরা ব্যাপারটার ফয়সালায় লেগে যান। অতএব এখনকার মতো মারামারিটা মুলতবী রইল।

জানি না সেটা ভবিষ্যতের জন্য জমা রইল কিনা? কারণ এঁরা একই সঙ্গে যাত্রায় যাবেন। পথে বিবাদের বহু সুযোগ পাবেন। কিন্তু বিবাদের মনোভাব নিয়ে যাত্রায় যোগ দিলে, সে যাত্রা তীর্থযাত্রা হবে কি?

যাক্ গে। ওঁদের ভাবনা ওঁরা ভাবুন। ভাগনে ও অশোক ছাড়া পেয়েছে। আমরা এগিয়ে চলি।

মনে মনে কিন্তু বিবদমান সন্ন্যাসীদের কথাই ভাবতে থাকি। লোভ মোহ

এবং ক্রোধকে জয় না করতে পারলে নাকি সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এঁরা তাহলে কি করে সন্ন্যাসী হলেন?

অবশেষে অকুস্থলে পৌঁছন গেল। যে তীর্থযাত্রাকে অবলম্বন করে আজ পহেলগাঁও উৎসব-মুখর, যাত্রার সেই ছড়ি রয়েছেন এখানে।

পথের বাঁদিকে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। কয়েকটি তাঁবুও পড়েছে সেখানে। তবে ছড়ি বিশ্রাম করছেন উন্মুক্ত মন্দিরে।

পথের পাশে সুসজ্জিত তোরণ। লেখা রয়েছে—

'CHHARI
SHREE SWAMI AMARNATHJI'S
RESTING PLACE, PAHALGAM'

আমরা ভেতরে ঢুকি। তোরণের ঠিক সোজাসুজি খানিকটা দূরে একটি বেশ বড় বাঁধানো বেদি, অনেকটা মঞ্চের মতো। মঞ্চের একদিকে সিঁড়ি, তিনদিকে লোহার রেলিং। ঠিক কেন্দ্রস্থলে লাল ও নীল রঙের বিবাট একটা প্লাস্টিকের ছাতা, তার নিচে একখানি ত্রিশূলের সঙ্গে দু-খানি ছড়ি—রূপার পাত দিয়ে মোড়া বড় লাঠি। এঁরাই অমরতীর্থ-অমরনাথ যাত্রার ছড়ি—হর-পার্বতীর প্রতিনিধি।

ছড়ির সামনে ধূপ জ্বলছে। অনেকেই ফুল ও মালা প্রণামী দিচ্ছেন। সুগন্ধী ধূপ ও ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত।

আমরা প্রণাম করি।

জনৈক তরুণ সন্ন্যাসী এগিয়ে আসেন সামনে। আমাদের বিস্মিত করে পরিষ্কার বাংলায় বলে ওঠেন, "আসুন, ওপরে আসুন।"

বিস্মিত হওয়া অবশ্য উচিত হয় নি আমার। সনাতন ধর্মের শাশ্বত-সূত্রে আজও আসমুদ্র-হিমাচল গ্রথিত। সুতরাং শ্রীনগর দশনামী আখড়ায় দু-একজন বাঙালী সন্ন্যাসী থাকতেই পারেন।

সন্ন্যাসী আবার তাগিদ দেন, "উঠে আসুন, ওপরে এসে বসুন।"

দ্বিধা ত্যাগ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বেদির ওপরে। অমরনাথজীর পুণ্য-ছড়িকে পুনরায় প্রণাম করে একপাশে এসে বসি।

তরুণ সন্ন্যাসীও আমাদের পাশে বসেন। বিনা প্রস্তাবনায় পরিচয় দেন, "আমার নাম লোকেশ্বরানন্দ গিরি। ছোটবেলা থেকেই আমি দশনামী আখড়ায় আছি। শ্রীনগর বর্বাচকে আমার আখড়া। বাবা অমরনাথজীর ছড়ি আমাদের আখড়াতেই থাকেন।"

"আচ্ছা স্বামীজী, এই ছড়ি কবেকার?" সন্ন্যাসী থামতেই বাসুদেব প্রশ্ন করে।

সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "অনেকের মতে শ্রীরামচন্দ্রের আমলের, আবার অনেকে বলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য এবং আচার্য মণ্ডন মিশ্র এই ছড়ি নিয়ে অমরনাথ যাত্রায় গিয়েছিলেন। ছড়ি যে-যুগেরই হয়ে থাক, ওপরের রূপার পাত কিন্তু বহুবার মেরামত করা হয়েছে। আর এ-ছড়ির প্রাচীনত্ব বুঝতে হলে আপনাদের পুরাকালের কাশ্মীর কাহিনী জানতে হবে।"

"একটু বলুন না মহারাজ!" মামা অনুরোধ করে।

সন্ন্যাসী শুরু করেন, "পুরাকালে কাশ্মীর উপত্যকা ছিল দানবদের দেশ। মহামুনি কশ্যপ মহামায়ার তপস্যা করে তাঁকে বশীভূতা করলেন। তাঁকে দিয়ে কশ্যপ এদেশের সমস্ত দানব ধ্বংস করালেন। বারামুলার কঠিন পাহাড় কেটে তিনি এ উপত্যকায় জল নিয়ে এলেন। সারা উপত্যকা সুজলা ও সুফলা হয়ে উঠল। দলে দলে মানুষ ছুটে এলো এখানে। মহামুনি কশ্যপের নামানুসারে রমণীয় উপত্যকার নাম হল কাশ্যপমার · পরবর্তী কালে কাশ্মীর। তিনি নাগরাজ তক্ষকের হাতে এদেশের শাসনভার অর্পণ করে ফিরে গেলেন অযোধ্যায়।"

"কিন্তু এ-কাহিনীর সঙ্গে অমরনাথ যাত্রার সম্পর্ক কি মহারাজ?" সন্ন্যাসী থামতেই ভাগনে জিজ্ঞেস করে।

সন্ন্যাসী সহাস্যে উত্তর করেন, "আছে। কাশ্যপমারের নর-নারীরা দু-হাত ভরে অন্নপূর্ণা প্রকৃতির দান গ্রহণ করলেন। সুখ ও সমৃদ্ধিতে তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—যুগের পরে যুগ অতিবাহিত হতে থাকল।

"একদিন মহাতপা ভৃগুমুনি এসে উপস্থিত হলেন. এই ভূ-স্বর্গে। এদেশের মানুষদের কাছে তিনি প্রচার করলেন অমরনাথজীর তীর্থমাহাত্ম্য। মহামুনি ভৃগু শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, দেবদণ্ড সামনে নিয়ে এই যাত্রা করতে হবে। শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে গুহাতীর্থে অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ দর্শন করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করবে। আর ঐ গুহাতীর্থের অপর নাম হবে অমরতীর্থ—অমরতীর্থ-অমরনাথ।"

একবার থামলেন সন্ন্যাসী। তারপরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে শুরু করলেন। "আমরা চিরকাল আত্মবিস্মৃত জাতি। স্বাভাবিকভাবেই কিছুকাল বাদে সবাই বিস্মৃত হয়েছিলেন অমরতীর্থের কথা। অবশেষে এলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য। তৎকালীন কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রকে তর্ক-

যুদ্ধে পরাজিত করার পরে সর্বজ্ঞ শঙ্কর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথ দর্শন করলেন।

"তিনি আবার যাত্রার প্রচলন করেন।"

"সেই থেকে চলেছে। অর্থাৎ বর্তমান যাত্রার বয়স প্রায় বারো/তেরো শ' বছর। তবে মুসলমান আমলে যাত্রার জনপ্রিয়তা খুবই কমে গিয়েছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই যাত্রায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন পণ্ডিত হরদাস টিকু। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ধনী। পণ্ডিত হরদাস তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দু-লক্ষ টাকা সেবারে যাত্রার জন্য ব্যয় করেছিলেন। পথ তৈরি ও পথের আশ্রয় এবং সন্ন্যাসী ও দরিদ্র যাত্রীদের খাদ্যের জন্য তিনি সেই টাকা খরচ করেন। আর তার ফলে এই যাত্রা এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে কাশ্মীরের রাজসরকার পরের বছর থেকেই যাত্রার জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন।"

"কিন্তু সে অর্থ তো খুবই সামান্য!" সন্ন্যাসী থামতেই আমি বলি।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, "কি রকম?"

উত্তর দিই, "স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অমরনাথ যাত্রায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' বইতে লিখেছেন—তখন কাশ্মীর সরকার অমরনাথ যাত্রার সুবন্দোবস্ত করার জন্য ধর্মার্থ বিভাগের হাতে মাত্র বারো হাজার টাকা দিতেন।"

"তা হতে পারে।" সন্ন্যাসী বলেন। "এখন অবশ্য রাজ্য সরকার অনেক বেশি ব্যয় করেন।"

"তাদের আয়ও হয় প্রচুর। তাছাড়া যাত্রীরা প্রতিবছর এ রাজ্যে এসে অন্তত লাখ পঞ্চাশ টাকা খরচ করে যান।" অসীম মন্তব্য করে।

"তা হয়তো যান। এবং সে তুলনায় সরকার যাত্রার জন্য যা খরচ করেন, তা কিছুই নয়।" সন্ন্যাসী অসীমের উক্তি সমর্থন করেন।

"যাক্ গে সেকথা" মামা বলে, "মহারাজ আপনি একটু ছড়ি যাত্রার কথা বলুন।"

সন্ন্যাসী শুরু করেন, "প্রতিবছর শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে শ্রীনগরের দশনামী আখড়া থেকে ছড়িযাত্রা শুরু হয়। আগে যখন পহেলগাঁয়ের মোটরপথ তৈরি হয় নি, তখন অধিকাংশ যাত্রী শ্রীনগরে সমবেত হতেন—সেখান থেকেই ছড়িযাত্রার সামিল হতেন। সাধু ও দরিদ্র যাত্রীদের খাবার যোগাতেন কাশ্মীর সরকার।"

"আচ্ছা, কারা এখন এই ছড়ির অধিকারী?" অশোক জিজ্ঞেস করে।

সন্ন্যাসী জবাব দেন, "ছড়ির অধিকার নিয়ে যুগে যুগে বিবাদ হয়েছে।

অনেক ঝগড়া-ঝাটির পরে সাব্যস্ত হয়েছে এই ছড়ি ধর্মার্থ সংস্থার মহান্তর।
আপনারা তাঁকে দর্শন করতে পারেন।"

"কোথায়?" ব্রহ্মচারী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

"ঐ যে ওখানে।" সন্ন্যাসী ইসারা করে পাশের.তাঁবুটি দেখিয়ে দেন।

ব্রহ্মচারী পুলকিত। আর শুধু ব্রহ্মচারীর কথাই বা বলি কেন? হয়তো সবাই—এমনকি আমিও। কি করব? আমি যে ভারতবাসী, সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি মিশে আছে আমার রক্তে।

বোধকরি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যই অসীম বলে ওঠে, "শ্রীনগর থেকে আসার পথে ছড়িযাত্রা কোথায় কোথায় থামে?"

"পামপুর অনন্তনাগ মার্টন আইশমোকাম ও পহেলগাঁও। তার মানে আমরা পঞ্চম দিনে এখানে আসি, তিন দিন এখানে থাকি। তারপরে এখান থেকে যাত্রা করে চতুর্থদিন সকালে অমরনাথে পৌঁছই।"

"এখান থেকে অথবা পথের অন্যান্য চটি থেকে ছড়ি কখন বের হন?" এবারে বাসুদেব প্রশ্ন করে।

সন্ন্যাসী বলেন, "খুব সকালে, শেষ রাতেও বলা যেতে পারে। ছড়ি যাত্রা করার পরে দু-ঘণ্টা যাত্রীদের যেতে দেওয়া হয় না। দু-ঘণ্টা পরে সাধারণ যাত্রীদের জন্য পথ খুলে দেওয়া হয়।"

"যাত্রার ঠিক আগে নিশ্চয়ই পুজো হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যাত্রা শেষ করে এখানে এসে ছড়ি কিভাবে শ্রীনগর যাবেন? আপনারা কি হেঁটে ফিরবেন?" অশোক প্রশ্ন রাখে।

সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "না। এখানে ফিরে আসার পরে আমরা নীলগঙ্গায় ছড়ি স্নান করাবো, তারপরে আবার বাবার পুজো হবে। পুজোর পরে একটা বড় বাক্সে ছড়ি রেখে বাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে। একবছর আর সে বাক্স খোলা হবে না। বন্ধ বাক্স ঐ গাড়িতে করে শ্রীনগর নিয়ে যাওয়া হবে।"

তাকিয়ে দেখি একটু দূরে একখানি ত্রিপল ঢাকা মোটরগাড়ি। তাহলে বাবা অমরনাথজীকেও শেষ পর্যন্ত গাড়ি কিনতে হয়েছে।

কি করবেন? যে যুগের যে নিয়ম। এ-যুগে যে গাড়ি না থাকলে কেউ মানতে চায় না।

॥ চার ॥

গিরিজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসি নিচে। এগিয়ে চলি মহান্তজীর তাঁবুর দিকে। মহান্তজীর নাম শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী।

ভয়ানক ভিড়। তাঁবুর ভেতরে ও বাইরে দাঁড়াবার জায়গা নেই। তবু কোনমতে পথ করে নিয়ে একসময় আমরা মহান্তজীর পায়ের কাছে পৌঁছই, তাঁকে প্রণাম করি।

"যাত্রা সফল হোক।" ভাঙা বাংলায় মহান্তজী আশীর্বাদ করেন।

এর চেয়ে বড় প্রত্যাশা আজ আর কিছু নেই আমাদের। আমরা পুলকিত। সকৃতজ্ঞ চিত্তে সৌম্যদর্শন মধ্যবয়সী মহান্তকে পুনরায় প্রণাম করি। তারপরে আবার তেমনি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসি তাঁবুর বাইরে।

বড় রাস্তায় এসে এগিয়ে চলি সামনে। এখনও যে শেষ হয় নি পহেলগাঁও পরিক্রমা।

কয়েক পা এগিয়ে মন্দির—পহেলগাঁয়ের বৃহত্তম মন্দির। সামনে সাইনবোর্ড—

'SHRI GOURISHANKAR TEMPLE, PAHALGAM

Constructed by

DHARMARTH TRUST, JAMMU & KASHMIR

Opening Ceremony performed

by

The Sole Trustee

Maharaja Dr. Karan Singhji

On 9th July, 1962'

কাশ্মীরে হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায়, বিশেষ করে অমরনাথ যাত্রাকে জনপ্রিয় করে তুলবার প্রচেষ্টায় মহারাজা করণ সিংজীর অবদান অসামান্য। এবং অনেকের ধারণা এবারে সরকারী ব্যবস্থায় প্রচুর ত্রুটি দেখা যাবে কারণ করণ সিংজী সরকারে নেই।

কিন্তু সে-সব ভবিষ্যতের কথা। এখন মন্দির দেখতে এসেছি, মন্দির দেখা যাক।

তোরণ পেরিয়ে পাথরকুচির পথ। আমরা সেই পথে এগিয়ে চলি। পথের দুদিকে বাগান। বাগানের শেষে পথ শেষ হয়েছে আর সেখানেই মন্দির। কাঠ ও টিনের চাল, পাথরের দেওয়াল এবং উঁচু মেঝে। চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা। মাঝখানে সুদৃশ্য গর্ভ-মন্দির।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বারান্দায়। কয়েকজন সাধু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ও বসে রয়েছেন। বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। এরা বুদ্ধিমান তাই আগে-ভাগে এসে দেবালয়ে ঠাঁই পেতেছেন। পথের পাশের খোলা জায়গার শীতের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন কিন্তু লোকসান হয় নি তেমন। কারণ এখানেও প্রচুর ভক্ত আসছেন এবং তাঁরা অকৃপণ হাতে সাধু-মহাত্মাদের প্রণামী দিচ্ছেন।

গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়াই। ছোট কিন্তু ছিমছাম মন্দির। ভেতরে কষ্টিপাথরের বেদির ওপরে শ্বেতপাথরের লিঙ্গমূর্তি। ওপরে ঘণ্টা ও একটি তামার কলসী ঝুলছে। ফোটা-ফোটা জল পড়ছে শিবের মাথায়।

লিঙ্গমূর্তির পেছনে শ্বেতপাথরের হর-পার্বতী মূর্তি আর একখানি রাধাকৃষ্ণের ছবি। ভক্তরা ভেতরে ঢুকে শিবপূজা করছেন। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হর-পার্বতী ও রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করি। বলি—আমাদের দুর্গমযাত্রাকে সুগম ও আনন্দময় করে তোলো।

ফিরে আসি পথে। আবার এগিয়ে চলি। কয়েক পা এগিয়েই বাঁদিকে আরেকটি রাস্তা লিডারের দিকে চলে গিয়েছে। মূল-পথ সামনে প্রসারিত। এই পথে গতকাল আমরা জম্মু তাওয়াই থেকে পহেলগাঁও এসেছি। বাঁদিকের পথটি লিডারের পুল পেরিয়ে চলে গিয়েছে চন্দনবাড়ি—যে পথে আগামীকাল শুরু হবে আমাদের পদযাত্রা।

আর তাই দুটি পথের সঙ্গমে টিনের ওপরে আঁকা রয়েছে প্রকাণ্ড একখানি মানচিত্র—পথ নির্দেশিকা। মানচিত্রে পহেলগাঁও থেকে অমরনাথের যাত্রাপথ দেখানো হয়েছে। কিছু মূল্যবান খবর রয়েছে।

ভাগনে মানচিত্রের ফটো নিচ্ছে। এই অবসরে মানচিত্র থেকে খবরগুলো টুকে নেওয়া যাক—

'Pahalgam 7500′

10 Miles Chandanwari 9000′

One Shelter Shed, One Rest House, Two Labour Sheds.

2 Miles Pissu Top 11,200′

Three Shelter Sheds.

3 Miles Zagipal 11,500′

Three Shelter Sheds.

3 „ Sheshnag 12,200′

Two Rest Houses, Two Labour Sheds.

3 „ Mahagunas 14,500′

Four Shelter Sheds.

1 Mile Pushpathri 12,500′

Two Shelter Sheds.

4 Miles Panchtarani 11,500′

Five Shelter Sheds, Two Rest Houses.

2 „ Santsigh Pari 13,500′

2 „ Holy Cave.'

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে সরকারদা বলতে থাকেন, "প্রথমদিন আমরা পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি যাবো অর্থাৎ ১০ মাইল হাঁটব, দ্বিতীয়দিনে যাবো শেষনাগ, সেদিন ৮ মাইল হাঁটতে হবে। তৃতীয়দিন…"

"তৃতীয়দিনেও ৮ মাইল হাঁটব। মহাগুণাস 'পাস' পেরিয়ে পঞ্চতরণী। আর চতুর্থদিন পৌঁছব অমরনাথ—পঞ্চতরণী থেকে ৪ মাইল।" ভাগনে যোগ করে।

অশোক বলে, "তাহলে পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ গুহা ৩০ মাইল, যাবার সময় আমরা চতুর্থদিনে পৌঁছব সেখানে। ফেরার সময় ?"

আমি বলি, "চতুর্থদিনেই আমরা নেমে আসব শেষনাগ, পঞ্চমদিনে ফিরে আসব পহেলগাঁও।"

"তার মানে চতুর্থদিন ১৬ মাইল ও পঞ্চমদিন ১৮ মাইল হাঁটতে হবে" অসীম যোগ করে।

আমি মাথা নাড়ি।

মামা বলে, "এবার চলো ফেরা যাক। স্নান-খাওয়ার পরে আবার বাজারে আসতে হবে, কেনাকাটা রয়েছে।"

ঠিকই বলেছে মামা। অতএব ফিরে চলি। যেপথে এসেছি, সেই পথেই হোটেলে ফিরছি। সাধু আর ভক্ত, মন্দির আর দোকান দেখতে দেখতে পথ চলেছি। সংখ্যাহীন যাত্রীর প্রবাহে মিশে গিয়েছি আমি। আমি যে আজ অমরতীর্থ-অমরনাথ যাত্রার অংশ ছাড়া আর কিছু নয়।

যাত্রার কথা ভাবতে ভাবতেই চলেছি। সেই একই পথ। সেই অনাদি অতীত থেকে এই বর্তমান পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ভক্তের পদরেণু রঞ্জিত পহেলগাঁয়ের পথ। তাঁরা সবাই একদিন আমার মতো এইপথে পদচারণা করেছেন। আগামী যুগেও সংখ্যাতীত সন্ন্যাসী ও ভক্তের পদসঞ্চারে প্রতিবছর পুলকিত হবে এই পথ।

পুরাকালের কথা নয়, সেকালের কথাও থাক, একালের কথাই ভাবা যাক। এই পথে পদচারণা করেছেন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা, অভেদানন্দ ও প্রবোধদা (সান্যাল), সেজকা (উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) ও দেবপ্রসাদ (দাশগুপ্ত)। বিবেকানন্দ সেবারে পহেলগাঁও পৌঁচেছিলেন ২৯শে জুলাই (১৮৯৮), অভেদানন্দ ৩রা অগাস্ট (১৯২২), প্রবোধদা ২১শে অগাস্ট (১৯৫৩), আর আমি এসেছি ১৭ই অগাস্ট (১৯৭৭)। স্বামীজী এসেছিলেন আমার প্রায় আশি বছর আগে, অভেদানন্দ পঞ্চান্ন এবং প্রবোধদা চব্বিশ বছর আগে। এই সুদীর্ঘ সময়ে যেমন অমরনাথ যাত্রাপথের উন্নতি হয়েছে, তেমনি যাত্রার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। আর সেই সঙ্গে উন্নত হয়েছে পহেলগাঁও।

পহেলগাঁয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, 'উপরে একটি সাহেবি ধরনেব বড় দোকান, পোস্ট অফিস, বাজার এবং ডাকবাংলো আছে। বৎসরে ৮ মাস এই সহরটি খোলা থাকে। বাকি ৪ মাস বরফ পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। তখন এইস্থানে কেহ থাকিতে পারে না।'

বলা বাহুল্য অভেদানন্দের এ বর্ণনার সঙ্গে আজকের পহেলগাঁয়ের তেমন মিল নেই। বিগত পঞ্চান্ন বছরে পহেলগাঁয়ে শত শত দোকান ও বড় বড় হোটেল নির্মিত হয়েছে। ববফ এখনও পড়ে কিন্তু সারাবছর পর্যটক আসেন এখানে এবং সারাবছর দোকান-পাট ও হোটেল খোলা থাকে।

প্রবোধদা তাঁর 'দেবতাত্মা হিমালয়'-এর প্রথমখণ্ডে পহেলগাঁও প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমরা আছি লিডার উপত্যকার মধ্যকেন্দ্রে। স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে গিরিনদীরা, এই পহেলগাঁওতে তাদের প্রথম অবতরণ, এখান থেকে তারা চললো সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায়।..."

'পহেলগাঁও দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে। এক নদীপথের পাশে চলে গেছে শেষনাগের চড়াই, অন্য নদীপথ সঙ্গে গেছে লিডারবৎ ও কোলাহাই হিমবাহের দিকে।'

সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু এই শহর। অবস্থান ৩৪°২´ অক্ষরেখা ও ৭৫°২৩´ দ্রাঘিমায়। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত গেজেটীয়ারে পহেলগাঁয়ের অবস্থান

সম্পর্কে বলা হয়েছে—'A considerable village most romantically situated at the north end of the Lidar valley, between the junction of the streams which flow through the two defiles at the head of the valley 'Above the Village is an orchard, the usual camping ground....

'The path leading to the cave of Amarnath and the Shisha Nag lies up the defile to the east keeping to the right bank. Preslang, between 4 and 5 miles up, is the last village met with'.

"কোথায় গিয়েছিলেন ?"

ভাবনা থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি তুলতুল। তার সঙ্গে মিস্টার ও মিসেস ভট্টাচার্য, অজিত ও বৌমা এবং ডাক্তার।

"বাবা অমরনাথজীর ছড়ি দর্শন করে এলাম।" ব্রহ্মচারী তুলতুলের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

"কোথায় ?" এবারে বৌমা জিজ্ঞেস করে।

বাসুদেব বলে, "ঐ তো, সামান্য দূর। এই রাস্তার ওপরেই বাঁদিকে।"

"অনেক সাধু-মহাত্মা এসেছেন। মন্দির ও গুরুদ্বার রয়েছে।" ব্রহ্মচারী যোগ করে।

"কিন্তু আমরা যে কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছি ?" তুলতুল জানায়।

"তাতে কি হচ্ছে ?" অশোক বলে, "এখন সোজা চলে যাও ওখানে। ফেরার পথে কেনা-কাটা সেরে হোটেলে ফিরবে।"

শুধু তুলতুল নয়, অশোকের প্রস্তাব ওদের সকলেরই পছন্দ হয়। ওরা এগিয়ে যায়, আমরা ফিরে চলি হোটেলে।

চলতে চলতে হঠাৎ ভাগনে আমাকে বলে, "ঘোষদা, আপনি তো অভেদানন্দজীর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' পড়েছেন ?"

আমি মাথা নাড়ি।

"দশনামী আখড়ার সাধু ছড়িযাত্রার যে বর্ণনা দিলেন, তার সঙ্গে কিন্তু মোটামুটি মিলে গেল।"

"তাহলে তো গত পঞ্চাশ বছর ধরে যাত্রার নিয়ম-কানুন একই রয়ে গিয়েছে ?" ভাগনের কথা শুনে অসীম প্রশ্ন করে।

আমি উত্তর দিই, "হ্যাঁ, মোটামুটি একই নিয়ম টিকে আছে।"

"কি নিয়ম ঘোষদা ?" মামা জিজ্ঞেস করে। মামা-ভাগনে দুজনেই আমাকে 'দাদা' বলে ডাকছে।

একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, "অভেদানন্দজী অমরনাথ যাত্রা সম্পর্কে লিখেছেন—'সকল যাত্রীকেই একসঙ্গে চলিতে হয়। 'ছড়ি'র আগে কেহ যাইতে পারে না।...'ছড়ি' সকলের পূর্বে রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় যাত্রা করে, তাহার পিছনে পিছনে যাত্রীরা যখন ইচ্ছা যাইতে থাকে। একটি আশাসোঁটা ও অস্ত্রশস্ত্রসহ একদল সাধু পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যান, ইহাদিগকেই 'ছড়ি' বলে। পূর্বে যে সকল সাধু এই তীর্থে বাস করিতেন, তাঁহারাই পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যাইতেন, সেই কারণে এই তীর্থের এই প্রকার রীতি হইয়াছে'।"

"আচ্ছা, বিশ্বকোষের বর্ণনা তো আরও পুরনো ?" আমি থামতেই ভাগনে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" ব্রহ্মচারী উত্তর দেয়। বলে, "নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষের প্রথম-ভাগেই অমরনাথের কথা আছে। বইখানি প্রকাশিত হয়েছে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ একানব্বুই বছর আগে।"

"সে বইতে কি বলা হয়েছে অমরনাথ যাত্রা সম্পর্কে ?" বাসুদেব প্রশ্ন করে।

অতএব শুরু করতে হয়, "বিশ্বকোষে বলা হয়েছে—'অমরনাথ কাশ্মীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থবিশেষ। এখানে মহাদেবের যে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ আছে তাহার নাম অমরনাথ বা অমরেশ্বর।...এখানকার পর্বতমালা বারমাস তুষারে আবৃত। পথ দুর্গম; প্রাণিশূন্য, তৃণশূন্য; আবার সহস্র শুভ্র প্রস্তরখণ্ড ও হিমশিলা পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। হাঁটিবার সময় যাত্রীরা একটু উচ্চস্বরে কথা কহিলে কিংবা জোরে পায়ের শব্দ করিলে তাহার প্রতিঘাতে সেই সকল শিলা খসিয়া আসিয়া মাথার উপরে পড়ে। এদিকে আবার ভাদ্রমাস, রাত্রিদিন বৃষ্টি হইতে থাকে, কখন কখন বরফও পড়ে। এত বিঘ্ন বিপত্তি, তবু এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিবৎসর প্রায় দুই হাজার যাত্রী অমরনাথে গিয়া থাকেন'।.."

"দু-হাজার !" সবিস্ময়ে ভাগনে বলে ওঠে, "তার ছত্রিশ বছর পরে যে অভেদানন্দ লিখেছেন মাত্র পাঁচ শ' যাত্রী যাত্রায় গিয়েছিলেন।"

"কোন কারণে সেবারে হয়তো যাত্রী কম হয়েছিল।" আমি বলি।

ভাগনে আর কোন প্রশ্ন করে না।

আমি আবার শুরু করি, "বিশ্বকোষে আরও বলা হয়েছে—'পথ এত দুর্গম বলিয়া কাশ্মীরের মহারাজ যাত্রীদের বিশেষ সহায়তা করেন। এই মহাতীর্থ দর্শন করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের অতি দূরতর স্থান হইতে যাত্রী আসে। তাহার মধ্যে ধনী দরিদ্র, যোগী সন্ন্যাসী, সকল সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। দরিদ্র লোককে মহারাজ নিজে পাথেয় দিয়া থাকেন।

'পূর্ণিমার চৌদ্দ-পনর দিন পূর্বে শ্রীনগরের নিকট রামবাগে রাজ-ঝাণ্ডী উড়াইয়া দেওয়া হয়। এই পতাকা দেখিয়া যাত্রীরা ক্রমশঃ একত্রিত হইতে থাকে। তাহার পর পূর্ণিমার আটদিন থাকিতে সকলে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। অনন্তনাগে রাজ-ছটী পৌছিলে যাত্রীরা আর কেহ কোথায় থাকে না, সকলে আসিয়া একত্র মিলিত হয়। এখান হইতে অমরনাথ ২৮ ক্রোশ দূর; পাঁচ আড্ডা হইয়া তাহার পর তীর্থস্থানে পৌছিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না; যাত্রীরা অনন্তনাগ হইতে দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া লইয়া যায়।

"রাজপতাকা আগে আগে, পশ্চাতে যাত্রিগণ - প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে থাকে। অমরনাথে যাত্রা করিয়া পথের মধ্যে সকলে একুশটি তীর্থস্থানে স্নান করে। যাত্রীরা প্রথমে বিতস্তা নদী পার হইয়া কশ্যপমুনির শ্রীর্ধ বা শ্রীস্নানে গিয়া পৌছে। এখানে কোন দেবমূর্তি নাই। কথিত আছে, এখানে কেহ স্নান করিলে শৌর্য ও শ্রীসম্পন্ন হন'।"

ফিরে এলাম হোটেলে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। কিন্তু তিনতলায় যেতে পারি না। দোতলাতেই থমকে দাঁড়াতে হয়।

বারান্দায় ভীষণ চিৎকার ও চেঁচামেচি চলেছে। নারী-পুরুষের মিলিত কোলাহল—কলহ। হাতাহাতি হয়ে গিয়েছে কিনা বলতে পারছি না। তবে এখনও উভয়পক্ষে যে পরিমাণ গালা-গালি ও হাত-পা নাড়া চলেছে, তাতে যেকোন মুহূর্তে ঘুষোঘুষি শুরু হয়ে যেতে পারে।

শুরু হতে পারছে না। কারণ মিসেস মণ্ডল, ফকিরবাবু এবং হোটেল ম্যানেজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাঝেমাঝেই একে-ওকে ধরে ফেলছেন। উভয়-পক্ষকে শান্ত করবার জন্ত তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কি করবেন? কলহরত যুবক-যুবতীরা যে সকলেই তাঁদের প্যাসেঞ্জার।

এ ধরণের গোলমালের মধ্যে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তবু কাছে

না এসে পারি না। এরা যে সবাই আমার সহযাত্রী। আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে দুর-দুর্গম গুহাতীর্থের পথে যাত্রা করবে। আশ্চর্য! অমর-তীর্থ দর্শনের জন্ম কলকাতা থেকে পহেলগাঁও এসে এরা মারামারি করছে!

হোটেলের কর্মচারীরাই বা কি ভাবছে? আর তাই বোধহয় ম্যানেজার একতলার কাউণ্টার ছেড়ে এই দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছেন। ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে একযোগে মারামারি থামাবার চেষ্টা করছেন। কারণ তিনিও বাঙালী।

কিন্তু কলহের কারণ কী? একদলে দেখতে পাচ্ছি সেই তিনজোড়া বাঙালী সাহেব-মেম, আরেকদলে দুটি যুবক। এরা তো রেলে কাছাকছি 'বার্থ'-এ ছিল। কাল জম্মু থেকে একই 'বাসে' এসেছে। হোটেলেও পাশাপাশি ঘরে বাস করছে। তাহলে কি যুবক দুটি মেমসাহেবদের কিছু বলেছে? কিংবা কোন নারী-ঘটিত ব্যাপার?

মিসেস মণ্ডল আমাকে একপাশে ডেকে এনে কানে কানে বলেন, "না না, সে-সব কিছু নয়। ঐ সোফাদুটোয় বসে ওঁরা গল্প করছিলেন। কথায়-কথায় ঝগড়া, তা থেকেই মারামারি।"

"ইস্যুটা কি?" অসীম জিজ্ঞেস করে।

মিসেস মণ্ডল মৃদু হাসেন। বলেন, "অভিনব।"

"কি? ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান?"

"না।"

"কংগ্রেস—সি. পি (এম)?"

"না।" মিসেস মণ্ডল আবার একটু হাসেন। বলেন, "সাউথ-ক্যালকাটা বনাম নর্থ-ক্যালকাটা।"

সত্যই অভিনব, রীতিমত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কলহ। তাও আবার দুর্গম তীর্থ-পরিক্রমার প্রাক্কালে!

যাক্ গে, যার যেমন অভিরুচি। এর মধ্যে নাক গলানো নিরর্থক। তাছাড়া স্নান-খাওয়া করা দরকার। খিদে পেয়ে গিয়েছে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠতে থাকি।

এড়িয়ে যেতে চাইছি, কিন্তু মনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাই না—অপরাধী মন। একটা তীব্র অপরাধ বোধ আমার মনকে বার বার আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইছে।

আমি বাঙালী। ভারতের সবচেয়ে বৈচিত্র্যপ্রিয় মানুষ আমরা।

পর্বতারোহণ থেকে তীর্থ-দর্শন পর্যন্ত আমরা সর্বত্র সংখ্যায় ভারী। অমরনাথ যাত্রার জন্যও যাঁরা আজ এখানে এসেছেন তাঁদেরও অধিকাংশ বাঙালী।

কিন্তু এর পরেও কি সংখ্যাধিক্যের উদাহরণ পেশ করে আমার গর্ববোধ করার কিছু আছে? আগামীকাল সকালে আমরা যাত্রা করব গুহাতীর্থ অমরনাথের পথে। আচার্য শঙ্কর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত যুগাবতারগণ যেপথের ধূলি গায়ে মেখেছেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সবচেয়ে সুন্দর জনপদে এসেও আমরা কত সামান্য কারণে কি রকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছি? হিমালয়ের এমন শান্ত-সমাহিত স্বর্গীয় রূপ আমাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন করতে পারল না! তাহলে আমরা কেন চলেছি সেই অমরতীর্থে—স্বামীজী যেখানে ইচ্ছামৃত্যু লাভ করেছিলেন?

॥ পাঁচ ॥

খেয়ে নিয়ে একটু গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। বিশ্রামের এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আগামীকাল এসময় আমরা নিশ্চয়ই চড়াই ভাঙছি।

কিন্তু 'আরাম হারাম হ্যায়' কথাটা কি মিথ্যে হতে পারে? কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে।

কে আবার এল জ্বালাতন করতে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজা খুলতে হয়। কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্‌-এর অনুপম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"কি ব্যাপার?"

"আপনাকে একবার নিচে যেতে হবে।"

এই রে, সেরেছে! নিশ্চয়ই সেই ঝগড়ার জের এখনও মেটে নি। হয়তো বা 'সাউথ-ক্যালকাটা' দল আমাকে সাক্ষী মেনে থাকবে। খুবই স্বাভাবিক, আমি চব্বিশ-পরগণার মানুষ হলেও দক্ষিণ-কলকাতার প্রতিবেশী তো বটেই।

তবু অনুপমকে প্রশ্ন করি, "কেন বলুন তো?"

"মিস ভট্টাচার্যের মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মিস ভট্টাচার্য আপনাকে একবার ডাকছেন।"

"মিস ভট্টাচার্য?" আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

"আজ্ঞে মিস তুলতুল ভট্টাচার্য।"

"সেকি মোটামাসি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!" অসীম বিছানায় উঠে বসে। অসীম তুলতুলের মাকে মোটামাসি বলে ডাকছে। এবং সদাহাস্যময়ী মাসি সে ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

অশোক বলে, "এই তো কিছুক্ষণ আগে তাঁকে বাজারে যেতে দেখলাম।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাজার থেকে ফেরার পথেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।" অনুপম জানায়।

ব্রহ্মচারী, অশোক ও অসীমকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসি নিচে। ওদের ঘরের সামনে বেশ ভিড়। আমাদের দেখতে পেয়ে তুলতুল হাত নেড়ে ভেতরে ডাকে। সে মায়ের শিয়রে বসে আছে।

আমরা ভেতরে আসি। মিসেস ভট্টাচার্যের জ্ঞান ফিরে এসেছে, তবে এখনও

ব্রেই দুর্বল। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। আমাদের সহযাত্রী প্রবীণ ডাক্তার ক. সি. ভট্টাচার্য পরীক্ষা করছেন তাঁকে।

ডাক্তার ও রোগী দুজনেই ভট্টাচার্য। অসিত ও তুলতুলের বাবা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

পরীক্ষার পরে ডাক্তার ভট্টাচার্য বেরিয়ে এলেন বাইরে। অসিতের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রেসক্রিপশান লিখলেন। তারপরে সেখানি মিঃ ভট্টাচার্যের হাতে দিয়ে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। Journey এবং Ir-regularity-র জন্য Indigestion হয়েছে। Abdominal discomfort-এর জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এই ওষুধগুলো এনে খাইয়ে দিন। পেটটা একটু হালকা হয়ে গেলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

"কাল যাত্রায় যেতে পারবেন কি ?" তুলতুল জিজ্ঞেস করে ডাক্তারবাবুকে। সে কখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে খেয়াল করি নি।

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বলেন, "মা না যেতে পারলে কি আর করবে ? বাবা তাকে নিয়ে এখানে থাকবেন। তুমি আমাদের সঙ্গে যাত্রায় যাবে। মা ও বাবার নামে বাবা অমরনাথের পুজো দেবে। মেয়ের পুণ্যে মায়ের পুণ্য হবে।"

"তা হয় না জেঠু !" তুলতুল ডাক্তার ভট্টাচার্যকে বলে, "মা-বাবা না গেলে আমিও অমরনাথ যাবো না।"

"আপনার মেয়ে তো দেখছি ভারী লক্ষ্মী ভটচার্জিসাহেব!" ডাক্তার ভট্টাচার্য তুলতুলের বাবাকে বলেন। তারপরে তুলতুলের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, "না মা, মা-কে নিয়েই তুমি কাল যাত্রায় যেতে পারবে। ওষুধগুলো এনে খাইয়ে দাও, মা আজ রাতেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

বাবার হাত থেকে প্রেসক্রিপশানখানি হাতে নিয়ে তুলতুল বলে, "টাকা দাও, ওষুধ নিয়ে আসছি।"

"তুমি যাবে কেন ?" পাশের থেকে অশোক বলে ওঠে।

"তাতে কি হয়েছে ?" তুলতুল অশোকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

"না না।" অশোক প্রতিবাদ করে, "আমরা এতগুলো লোক থাকতে, তুমি যাবে মাসিমার জন্য ওষুধ আনতে!" সে তুলতুলের হাত থেকে প্রেসক্রিপশানখানি নিয়ে নেয়। তারপরে অজিতকে বলে, "চলুন, মাসিমার ওষুধটা নিয়ে আসি।"

"চলুন।" অজিত অশোকের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে।

মিঃ ভট্টাচার্য বলে ওঠেন, "টাকা নিয়ে যান।" তিনি পকেটে হাত দেন।

অশোক থামে না। একখানি হাত উঁচু করে চলতে চলতে বলে ওঠে,

"আমার সঙ্গে টাকা আছে।"

ওরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।

মিঃ ভট্টাচার্য ঘরে গিয়ে মিসেসের পাশে বসেন।

তুলতুল অসিতকে জিজ্ঞেস করে, "ডাক্তার জেঠু যা বললেন, তা কি ঠিক? না আপনারা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন?"

অসিত বোধহয় বুঝতে পারে না তার কথা। সে তাকিয়ে থাকে তুলতুলের মুখের দিকে!

তুলতুল বুঝতে পারে ব্যাপারটা। বলে, "মা কাল সকালের আগে সুস্থ হয়ে উঠবে তো? আমরা কি কাল যাত্রায় যেতে পারব?"

"নিশ্চয়ই!" অসিতের স্বরে ডাক্তারের আত্মপ্রত্যয়। সে যোগ করে, "মাসিমার তেমন কিছুই হয় নি।"

তুলতুল আশ্বস্ত হয়। সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠে, "আমি তাহলে গোছগাছ করে নিই?

অসিত আবার বলে, "নিশ্চয়ই।" তারপরেই তার মনে পড়ে কথাটা। ডাক্তার পরামর্শ দেয়, "কিন্তু মাসিমাকে 'ডিস্টার্ব' কোরো না। ওঁর আজ রাতটা ভাল করে ঘুমানো দরকার, ঘুমের ওষুধ দেয়া হচ্ছে।"

অশোক ও অজিত ফিরে আসে। অসিত ওষুধগুলো তুলতুলকে বুঝিয়ে দেয়। আমরা উঠে আসি ওপরে। মামারাও আমাদের ঘরে, সরকারদার সঙ্গে গল্প করছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই ওরা কথা থামায়। ভাগনে জিজ্ঞেস করে, "তুলতুলের মা কেমন আছেন?"

সব বলি ওদের।

একটু বাদে চা আসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মামা বলে, "ঘোষদা, এবারে চলো বেরিয়ে পড়া যাক। কেনা-কাটা বাকি রয়েছে।"

"হ্যাঁ।" ভাগনে যোগ করে, "তাছাড়া লিডারের তীরে গিয়ে একটু বসতে হবে।"

"কিনবে না ভাড়া করবে?" সরকারদা জিজ্ঞেস করেন, "এখানে নাকি জুতো জামা লাঠি থেকে শুরু করে কম্বল বাসনপত্র ও তাঁবু—সবই ভাড়া পাওয়া যায়।"

আবার বেরিয়ে পড়েছি পথে। সেই এক পথ দিয়ে একই দিকে হেঁটে চলেছি। পহেলগাঁয়ে মূল-পথ একটি,-সব পথ গিয়ে সেই পথে মিশেছে। সেই পথের পাশেই বাজার পোস্ট-অফিস থানা ও বড় বড় হোটেল, এক কথায় পহেলগাঁও সদর।

বাজারের দিকেই চলেছি। কেনাকাটাও রয়েছে। তবু এখন আমরা বাজারে থামব না। বাজার ছাড়িয়ে, ময়দান পেরিয়ে লিডারের তীরে গিয়ে বসব।

পহেলগাঁও লিডার উপত্যকার মধ্যমণি। এ উপত্যকাকে বলা হয় কাশ্মীর উপত্যকার একটি প্রিয়তম পার্শ্ব-উপত্যকা—'a favourite side-valley.'

এই উপত্যকার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও হিমালয় বিশারদ স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড তাঁর 'Kashmir' বইতে বলেছেন—'It is not of such wild rocky grandeur as the Sind valley, but has milder beauties of its own, charming woodland walks, and in summer a wealth of roses pink & white, jasmine, forget-me-nots, a handsome spiraea, strawberry, honeysuckle etc. By the side of the road runs the cool, foaming Lidar stream, and everywhere are villages hidden amongst masses of chenar, walnut and mulberry....'

স্যার ফ্রান্সিস প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে পহেলগাঁও এসেছিলেন। বলা বাহুল্য তখন পহেলগাঁও কয়েকখানি মাত্র বাড়ি-ঘর নিয়ে একটি গণ্ডগ্রাম। হোটেল ছিল না বললেই চলে। অথচ তখনও গ্রীষ্মকালে ঘোড়ায় চড়ে কিংবা হেঁটে প্রায় প্রতিদিন পর্যটকরা এখানে আসতেন। তাঁরা তাঁবু ফেলে লিডারের তীরে রাত্রিবাস করতেন আর সারাদিন পহেলগাঁয়ের পথে পথে পদচারণা করতেন।

সে আমলে য়ুরোপীয় পর্যটকদের কাছে কাশ্মীরের প্রিয়তম স্থান ছিল গুলমার্গ। কিন্তু স্যার ফ্রান্সিস সেকালের পহেলগাঁও সম্পর্কে লিখেছেন—'I fancy life here is dull compared with life at Gulmarg, but for those who wish to vegetate and lead an absolutely quiet existence Pahlgam is admirably suited.···The camping-ground is in a wood of blue pines, and the fresh, clear, pine-scented air is refreshing after the stuffy main valley in midsummer.'

স্যার ফ্রান্সিসের মন্তব্য যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ আমরা পাই মাত্র বছর তিরিশ পরে (১৯৩৩) প্রকাশিত 'New Guide to Kashmir' নামে একখানি বইতে। লেখক শ্রী আর. সি. অরোরা এই বইতে পহেলগাঁও প্রসঙ্গে লিখেছেন—'Its climate is invigorating and in the opinion of many, it is considered to be the best in the whole of Kashmir.'

বলা বাহুল্য এ মতটি ভারতীয় পর্যটকদের। আর তার কারণ পহেলগাঁয়ে গুলমার্গের চেয়ে শীত অনেক কম। ভারতীয় পর্যটকদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ১৯৩৩ সালের আগেই এখানে বেশ কিছু বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ও হোটেল গড়ে উঠেছিল।

১৯৪৫ সালে রাজসরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'Handbook of Jammu & Kashmir State' বইতে পহেলগাঁও সম্পর্কে বলা হয়েছে—'in the heart of the finest side-valley of Kashmir, the Lidar valley.... It attracts an increasing number of visitors every summer.'

তখন এখানে ডাক ও তারঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা ও তহশিল অফিস সবই হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ স্যার ফ্রান্সিসের আগমনের বছর চল্লিশের মধ্যেই গণ্ডগ্রাম পহেলগাঁও একটি জনপ্রিয় জনপদে পরিণত হয়েছিল। এবং আজ পহেলগাঁও নিঃসন্দেহে কাশ্মীরে পর্যটকদের প্রিয়তম স্থান।

কিন্তু কেবল অবস্থান কিংবা জলবায়ুর জন্যই পহেলগাঁয়ের জনপ্রিয়তা নয়। এর অন্যতম কারণ পহেলগাঁও তিনটি বৈচিত্র্যময় যাত্রাপথের সঙ্গম। এখান থেকে যাওয়া যায় কোলাহাই, বাইসুর‍্যান-ট্যানান এবং অমরনাথ।

অমরনাথের কথা এখন থাক। লিডারের প্রধান উৎস কোলাহাই হিমবাহের কথা আগেই বলেছি। কাজেই বাইসুর‍্যান ও ট্যানানের কথা ভাবা যাক। গুলমার্গের মতো পাইনবনে বেষ্টিত চমৎকার একটি মালভূমি বাইসুর‍্যান। পহেলগাঁও থেকে মাত্র ৩ মাইল। ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। সকালে আমার কয়েকজন সহযাত্রী ঘুরে এসেছেন।

বাইসুর‍্যান থেকে আরও ৩ মাইল এগিয়ে ট্যানান। আগের মাইলের মতো সহজ রাস্তা নয়, সংকীর্ণ এবং খাড়া চড়াই পথ। পথ-প্রদর্শক ছাড়া যাওয়া ঠিক নয়, অচেনা যাত্রীর পথ ভুল হবার সম্ভাবনা। ট্যানানের কাছে দুটি অনিন্দ্যসুন্দর হ্রদ রয়েছে। আর সেখান থেকে কোলাহাই হিমবাহের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

ভাবনা থামাতে হল। আমরা আবার মূলপথে এসেছি। পথ তো নয়, যেন মেলা বসেছে। যাত্রীরা সমানে কেনাকাটা করছেন। আমিও এই সংখ্যাতীত তীর্থযাত্রীদের একজন। আমাকেও কেনাকাটা করতে হবে। কিন্তু এখন আমরা লিডারের তীরে চলেছি। ফেরার পথে বাজার করব। অতএব ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলি।

পহেলগাঁয়ের প্রাণ-প্রবাহ লিডার। লিডার উপত্যকা শুরু হয়েছে জেলাসদর

অনন্তনাগ বা ইসলামাবাদ থেকে। এটি কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত। পহেলগাঁও উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। এখান থেকে অনন্তনাগ ২২ মাইলের মতো।

লিডারের দুটি ধারার সঙ্গমে অবস্থিত পহেলগাঁও, ধারা দুটি এসেছে কোলাহাই ও শেষনাগ থেকে। অনেকে প্রথমটিকে লিডার ও দ্বিতীয়টিকে শেষনাগ নদী বলেন। আমরা অবশ্য দুটিকেই লিডার তথা নীলগঙ্গা বলব। কারণ দুয়ের মিলিতধারার নামও লিডার।

পহেলগাঁও থেকে লিডার উপত্যকা তির্যকভাবে দুদিকে প্রসারিত—লিডার-ওয়াট এবং অমরনাথের দিকে। অনন্তনাগের কাছে লিডার প্রায় ৩।৪ মাইল প্রশস্ত। এখানে কম, ওপরে আরও কম—শেষদিকে মাত্র কয়েকশ' ফুট চওড়া।

উপত্যকার দু-পাশেই পাহাড়ের প্রাচীর। নিচের দিকে ক্ষেত-খামার, এখানে পাহাড়ের গায়ে ঘাস এবং ঘনবন, শেষদিকে শুধু পাথর আর বরফ। চাষাবাদ ভালই হয় এ উপত্যকায় কিন্তু ক্ষেতের সীমা পহেলগাঁয়ের ওপরে আর বড়জোর মাইল তিনেক। প্রখ্যাত পর্যটক ও সমীক্ষক Jacquement নাকি এ উপত্যকায় খনিজ-তামা পেয়েছিলেন।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি নীলগঙ্গার বেলাভূমিতে। মোটামুটি সমতল। শুধু এখানে-ওখানে দু-একখানি কবে বড় বড় পাথর রয়েছে পড়ে। তারই কয়েকখানির ওপরে বসে পড়ি আমরা। বসে বসে লিডারকে দেখি। টলটলে নীলাভ জল। ধাপে ধাপে নেমে আসছে, নাচতে নাচতে নামছে। নদীগর্ভের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে মাঝে মাঝে ফেনাব কুণ্ডলী সৃষ্টি করছে—যেন মুক্তো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই নদীর কথা মনে রেখেই বোধহয় বিবেকানন্দ একদিন লিখেছিলেন, 'The river is pure that flows, the monk is pure that goes.'…চরৈবেতি…

নীলগঙ্গা এখানে খুবই খরস্রোতা, দুবার বেগে বয়ে চলেছে। জলও বেশ ঠাণ্ডা। অথচ তারই মাঝে স্নান করছেন কয়েকজন যাত্রী। কি করবেন? সবাই তো আর আমাদের মতো হোটেলে ঘর নিতে পারেন নি। অধিকাংশ যাত্রী রয়েছেন তাঁবুতে। তাঁদের কাছে জল বলতে এই লিডার।

"ঘোষদা, একটু লিডারের কথা বলুন না!"

ভাগনের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। আমি লিডারের দিক থেকে ভাগনের দিকে মুখ ফেরাই।

ভাগনে আবার বলে, "একটু লিডারের কথা বলুন-না ঘোষদা!"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সুতরাং শুরু করি, "উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দুটি পাহাড়ী নদী এসে এই ৩৪° অক্ষরেখা ও ৭৫°২২′ দ্রাঘিমায় অবস্থিত পহেলগাঁয়ের পাদদেশে মিলিত হয়েছে। পাহাড়ী নদী দুটির উৎস কোলাহাই হিমবাহ এবং শেষনাগ। কিন্তু পহেলগাঁওকেই লিডারের প্রকৃত জন্মস্থান বলা উচিত, যেমন গঙ্গার জন্মস্থান দেবপ্রয়াগ।"

"আচ্ছা ঘোষদা, আমি অনেক পাহাড়ী নদী দেখেছি। কিন্তু এই লিডারের জলকে যেন একটু বেশি সাদা মনে হচ্ছে!" মামা মুখ খোলে এবারে।

উত্তর দিই, "তুমি ঠিকই বলেছো মামা! আর এর কারণ কি জানো?"

"কী?"

পাশের পাহাড়ের বরফগলা জলে সৃষ্ট হচ্ছে শেষনাগ। সেখান থেকে সৃষ্ট লিডার চন্দনবাড়ি হয়ে এখানে এসেছে। অনেকে বলেন, শেষনাগের অনতিদূরে জামৃতিনাগ নামে একটি হ্রদ রয়েছে। সেই হ্রদ থেকেও একটি ধারা এসে শেষনাগে পড়েছে। সেই ধারাটি এই বিচিত্র সাদা রংটি বহন করে লিডারের জলকে এমন সাদা করে দেয়।"

"শেষনাগের তীরে তো আমাদের তাঁবু পড়বে।" অশোক বলে, "তাহলে সেই সাদা ধারাটিকে দেখা যাবে।"

"দেখা যাবে কিন্তু বোঝা যাবে না, কারণ আমরা থাকব অনেক উঁচুতে।" অসীম অশোককে বুঝিয়ে দেয়।

বাসুদেব বলে, "আপনি লিডারের কথা বলুন ঘোষদা!"

আবার শুরু করি, "পহেলগাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তে এসে দুটি ধারা মিলিত হয়েছে। খরস্রোতা নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর পরেও বহুদূর পর্যন্ত নদীগর্ভ এমনি বড় বড় পাথরে বোঝাই, সুতরাং নদী নাব্য নয়।"

"কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, তাঁরা নৌকোয় করে শ্রীনগরে ফিরে গিয়েছিলেন?" ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করে।

"স্বামীজী সম্ভবতঃ অনন্তনাগ থেকে নৌকোয় উঠেছিলেন।" আমি উত্তর দিই। বলতে থাকি, "খরস্রোতা লিডার অনন্তনাগের উত্তরে পৌঁছে পূর্ণ করেছে তার পথ-পরিক্রমা, মিলিত হয়েছে ঝিলমের সঙ্গে। নীলগঙ্গা নীলকণ্ঠের পাদোদক পৌঁছে দিয়েছে ঝিলমের স্রোতে—মর্ত্যলোক স্বর্গবারি ক সিঞ্চিত হয়েছে।"

গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। ওপারের পাহাড়ে সন্ধ্যার যবনিকা এসেছে নেমে। এখুনি এপারেও নেমে আসবে আঁধার। তারপরে আকাশে চাঁদ উঠবে। নীলগঙ্গা রূপান্তরিত হবে রূপোলীধারায় আর পহেলগাঁওকে মনে হবে স্বপ্নের জগৎ।

মনে পড়েছে ভগিনী নিবেদিতার লেখা পঙক্তি কয়টি। স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথ দর্শন করে পরদিন এমনি সময়ে তাঁরা পহেলগাঁও ফিরে এসেছিলেন। হয়তো এমনি কোন জায়গায় বসে তাঁরা দীর্ঘ ও দুর্গম পদযাত্রার ক্লান্তি দূর করছিলেন আর—

'...We sat on, with the great moon overhead, and the towering snows, and rushing river, and the mountain-pines And the Swami talked of Siva, and the Cave and the great verge of vision'

বাজার সেরে ফিরে এলাম হোটেলে। গেটের মুখেই দেখা হল গোপালের সঙ্গে। সে বোধহয় কারও প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাকে একটু গম্ভীর মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি? সদাহাস্যময় গোপাল এমন গম্ভীর কেন?

আমরা কাছে আসতেই গোপাল বলে, "শঙ্কুদা, ন'দা আপনাকে একবার ডাকছেন।"

ন'দা মানে ফকিরবাবু। আমি গোপালের দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "ন'দা নিচে তাঁর ঘরেই রয়েছেন।"

হাতের জিনিসগুলো ব্রহ্মচারীকে দিয়ে বলি, "তোমরা ঘরে যাও, আমি ফকিরবাবুর সঙ্গে দেখা করে ওপরে আসছি।"

ওরা ওপরে চলে যায়। আমি ফকিরবাবুর ঘরের দিকে এগোতে থাকি। গোপাল আমার সঙ্গী হয়।

কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল। আমি ঘরে ঢুকতেই তাঁরা কেন যেন হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। সবাই বারবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। ব্যাপার কি?

"বসুন।" মিসেস মণ্ডল আমাকে বলেন।

সামনের একখানি খালি চেয়ারে বসে পড়ি তাড়াতাড়ি। কিন্তু কেউ আর কোন কথা বলছেন না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

"আপনি ডেকেছেন আমাকে?" আমি নিজেই নীরবতার অবসান করতে চাই। ফকিরবাবুর দিকে তাকাই।

তিনি মাথা নাড়েন। কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না। শুধু মিসেস মণ্ডলের দিকে একবার তাকান।

মিসেস ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "আপনার একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

"টেলিগ্রাম!" চমকে উঠি। "কোথায়?" আমি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করি।

"এই যে।" ফকিরবাবু কথা বলেন এতক্ষণে। তিনি পকেট থেকে বের করে টেলিগ্রামটা আমার হাতে দেন।

খামটা ছেঁড়া। ফকিরবাবুই ছিঁড়েছেন বোধহয়। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা বের করি। লেখা রয়েছে—'Goutam unimproved (.) Developing epileptic symptoms (.) Your presence is not esential but preferable—Dasarathi'

এ তো টেলিগ্রাম নয়, এ যে শক্তিশেল। সবার নিষেধ উপেক্ষা করে আমি ওকে শয্যাশায়ী রেখেই রওনা হয়ে এসেছি। ভেবেছি ওর আকস্মিক অসুখ আমার প্রতি অমরনাথজীর পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এ কি খবর পাঠালো দাশরথি? বাড়ির লোক টেলিগ্রাম করলে, তবু ভাবা যেতো ভয় পেয়ে করেছে। কিন্তু বন্ধু দাশরথি সরকার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পর্বতারোহী। সে লিখেছে—'Developing epileptic symptoms.' অর্থাৎ গৌতমের মৃগীরোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে আর তাই আমার উপস্থিতি 'essential' না হলেও 'preferable.'

বাবা অমরনাথ! আমাকে তুমি আবার এ কি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে? বাষট্টি সালে সাতদিন পহেলগাঁয়ে কাটিয়েও তোমাকে দর্শন করতে পারি নি। দু-মাস আগে বিভাস দাসের পর্যটন সংস্থা 'ইনট্যুর'-এর সঙ্গে আসতে পারি নি। এবারেও কি তোমার ইচ্ছে, আমি পহেলগাঁও থেকে ফিরে যাই?

না না, এ তোমার পরীক্ষা। আমার আগ্রহ, আমার আন্তরিকতা যাচাই করছ তুমি। একমাত্র বংশধরকে অসুস্থ রেখে ঘর ছাড়া হয়তো উচিত নয়। কিন্তু ঠাকুর, আমি তো প্রমোদ-ভ্রমণে আসি নি, আমি যে তোমার যাত্রায় এসেছি। তোমাকে দেখব বলে তাকে ফেলে এসেছি। তোমার ভরসাতেই তাকে অসুস্থ রেখে চলে এসেছি। তুমি যে সর্বনিয়ন্তা, তুমি তো তাকে অনায়াসে ভাল করে তুলতে পারো।

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পরীক্ষা করছ ঠাকুর! ভেবেছ আমি মায়াবদ্ধ জীব, একমাত্র বংশধরের মায়ায় প্রাণের ঠাকুরকে ফেলে পালিয়ে যাবো!

তা হবে না ঠাকুর! এবারে আর তোমার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হব না। আমি তোমার কাছেই যাবো।

হে দেবাদিদেব অমরনাথ! তুমি তো শুধু রুদ্রনাথ নও—তুমি শিব, তুমি শঙ্কর, তুমি মৃত্যুঞ্জয়। তুমি শুধু সংহারক নও, তুমি রক্ষক। তুমি শুভ এবং মঙ্গল। তুমি পরম করুণাময়।

তাই তোমার ভরসাতেই আমি ঘর ছেড়েছি, তোমার ভরসাতেই আমি আগামীকাল যাত্রায় যাবো। তবে যাবার আগে আমার গৌতমের ভাল-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমার ওপরেই ন্যস্ত করলাম। তুমি তাকে দেখো আমি তোমার কাছে আসছি।

টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। এতক্ষণ ওঁরাও সবাই চুপ করেছিলেন। এবারে ফকিরবাবু কথা বলেন, "কি করবেন?"

"কি আর করব?" উত্তর দিই, "আমরা কিই বা করতে পারি? যাঁর ইচ্ছেতে গৌতমের অসুখ হয়েছে, তাঁর ইচ্ছেতেই আমি যাত্রায় এসেছি। সুতরাং তাঁর ওপরেই নির্ভর করতে হবে।"

"আপনি তাহলে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে!" ওঁরা সবিস্ময়ে বলে ওঠেন।

"নিশ্চয়ই। কারণ যাঁর যাত্রায় যাচ্ছি, তিনিই আমার গৌতমকে ভালো করে তুলবেন।"

॥ ছয় ॥

সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম মনে পড়ল—সেই শুভদিন সমাগত। বহু-বছরের প্রতীক্ষার অবসান হবে আজ। আজ আমি সত্যই যাত্রা করছি অমরতীর্থ অমরনাথের পথে।

চা খেয়েই যাত্রার আয়োজনে লেগে যাই। সহযাত্রীরা খুশি হয়ে ওঠে। এতক্ষণে যেন ওরা আমার যাত্রা করা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। ওরা বোধহয় ভেবেছিল শেষপর্যন্ত আমি না-ও যেতে পারি।

অপ্রয়োজনীয় মালপত্র আলাদা করে দিতে হল। এগুলো এখানেই থাকবে। প্রয়োজনীয় মালপত্র যাবে ঘোড়ার পিঠে। আমার মালপত্র কম। সেটুকু হ্যাভারস্যাকে ভরে নিয়েছি। বিছানাটা শুধু ফকিরবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার বিছানা বলতে অবশ্য এয়ার-ম্যাট্রেস এবং স্লীপিং ব্যাগ।

একটু বাদে ফকিরবাবু ডেকে পাঠালেন আমাকে। নিচে এসে দেখি হোটেলের পেছনে 'লন্'-এ পর্বতপ্রমাণ মালপত্রের মাঝে বসে রয়েছেন ভদ্রলোক। পাশে সারি সারি ঘোড়া। ঘোড়াওয়ালারা মালপত্র ওজন করে ঘোড়ার পিঠে চাপাচ্ছে আর ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল সেগুলো খাতায় লিখে রাখছেন। ওজন অনুযায়ী যাত্রীদের ভাড়া দিতে হবে যে।

ফকিরবাবু আমাকে বললেন, "আপনার মালের ভাড়া লাগবে না।"

"কেন বলুন তো?"

মিসেস মণ্ডল উত্তর দেন, "আমাদের নিয়ম হল, যাঁর মালের ওজন সবচেয়ে কম হবে, তাঁর কাছ থেকে আমরা ভাড়া নিই না। এবারে আপনি সেই 'প্রাইজ'টা পেলেন।"

"এবারে কেন", হাসতে হাসতে ফকিরবাবু বললেন, "এই রকম বিছানা আনলে আপনি প্রতিবার প্রাইজ পাবেন।"

সহাস্যে বলি, "এ কৃতিত্ব আমার নয়, যাঁরা এয়ার-ম্যাট্রেস ও স্লীপিং-ব্যাগ আবিষ্কার করেছেন, এ কৃতিত্ব তাঁদের।"

"শঙ্কুদা!"

তাকিয়ে দেখি কখন তুলতুল এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সে একেবারে

তৈরি হয়ে এসেছে। তার পরনে প্যান্ট ও স্পোর্টস সার্ট, পায়ে হান্টার শু, চোখে গো গো গগল্‌স, মাথায় টুপি, কাঁধে ওয়াটার বট্‌ল, এক হাতে ফুল-হাতার সোয়েটার ও রেন্‌কোট, আরেক হাতে লাঠি। লাঠির বদলে আইস একস ও একটা রুকস্যাক হলেই পুরো মাউন্টেনীয়ার।

আমার কাছে এগিয়ে আসে সে। বলে, "আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি শঙ্কুদা, গৌতম একেবারে ভালো হয়ে গিয়েছে।"

কথাটা ভালো লাগে আমার। মাত্র ক'দিনের পরিচয়। সম্পর্ক বলতে সহযাত্রী। তবু আমার ভাবনায় আকুল হয়ে স্বপ্ন দেখেছে সে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারার আগেই তুলতুল আবার বলে, "সত্যি বলছি শঙ্কুদা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, সে নিজে টেলিগ্রাম করে তার ভালো হয়ে যাবার খবর দিয়েছে আপনাকে।"

"ব্যস্", মিসেস মণ্ডল বলে ওঠেন, "তুলতুল ব্রাহ্মণকন্যা, ওর স্বপ্ন মানে ব্রহ্মস্বপ্ন, মিথ্যে হবার নয়।"

"আমার স্বপ্ন কিন্তু সত্যই দারুণ ঠিক হয়, মাকে জিজ্ঞেস করবেন।" বেচারী তুলতুল নিজের হয়ে ওকালতী করে।

তাই তাড়াতাড়ি বলি, "বাবা অমরনাথের কৃপায় আর তোমাদের শুভেচ্ছায় সে এতদিনে ভালো হয়ে উঠেছে, এই ভরসাতেই তো আমি তোমাদের সঙ্গী হচ্ছি তুলতুল! কিন্তু তার কথা থাক, তোমার মা কেমন আছেন বলো?"

"ভালো।" সানন্দে বলে ওঠে সে। "মা একেবারে ভালো হয়ে উঠেছে। তার ডাণ্ডি এসে গেছে। একটু বাদেই রওনা হচ্ছে।"

"মা রওনা হয়ে যাবার পরে তুমি গৌরীকে নিয়ে গেটের সামনে থেকো, আমি ওদের সবাইকে নিয়ে সেখানে আসছি।"

তুলতুল মাথা নাড়ে। আমি আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি।

ঘরে ফিরে আসতেই ওরা ঘিরে ধরে আমাকে। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অশোক প্রশ্ন করে, "কি খবর?"

খবর! আমি বুঝতে পারি না প্রশ্নটা।

"ফকিরবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন!" ব্রহ্মচারী বলে।

"আবার কোন টেলিগ্রাম এলো নাকি?" অসীম যোগ করে।

এবারে ওদের উৎকণ্ঠার কারণ বুঝতে পারি। এরা আমার আত্মীয় নয়, শুধুই সহযাত্রী। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আজ এরা আমার সবচেয়ে আপনজন। আমরা যে একই দুর্গমতীর্থ পথের পথিক, আনন্দ ও বেদনার সমান

অংশীদার। তাই আমার গৌতমের জন্য ওদের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই।

আমি ওদের উৎকণ্ঠা দূর করি। ফকিরবাবুর ডেকে পাঠাবার কারণ বলি। তুলতুলের স্বপ্ন দেখার কথাটাও বলি হাসতে হাসতে। সব শুনে ওরা কিন্তু গম্ভীর হয়ে যায়। তুলতুলের মতই মামা আমাকে আশ্বাস দেয়, "আমারও মন বলছে বাবা অমরনাথের কৃপায় গৌতম এতদিনে ভালো হয়ে উঠেছে।"

সে বিশ্বাস আমারও আছে। কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আলোচনা আর নয়। দুর্গম না হলেও, দীর্ঘপথ। ১০ মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দিতে হবে আজ। পদযাত্রার প্রথম দিন। এখুনি ব্রেক-ফাস্ট সেরে রওনা হওয়া দরকাব।

হ্যাভারস্যাক কাঁধে নিয়ে নেমে আসি নিচে। গেটের সামনে এসে দাঁড়াই। সহযাত্রীরা অনেকেই এসে গিয়েছেন। কারও ঘোড়া এসে গেছে, কেউ বা ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের মধ্যে কেবল বাসুদেব ঘোড়া নিয়েছে।

আমরা সাতজন ছাড়া আর ঘোড়া নেয় নি অসিত ও পবিতোষবাবু। তুলতুল ও গৌরী ঘোড়ায় চড়বে না কিন্তু তাবা ঘোড়া নিয়েছে। গৌরীর ঘোড়া আসে নি। ঘোড়ায় না চড়লেও ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ঘোড়াওয়ালাকে বলে দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে।

অতএব আমাদেরও প্রতীক্ষা করতে হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীদের দেখি। তাঁরা অশ্বারোহী হবার অপেক্ষায় রয়েছেন। বলা বাহুল্য নির্ভয়ে নয়। একে আমার অধিকাংশ সহযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তার ওপরে তাঁরা জীবনে কখনও ঘোড়ায় চড়েন নি। সুতরাং শোচনীয় পরিস্থিতি। সত্যি উপভোগ করবার মতো।

নীরব দর্শক হবার ছেলে অসীম নয়। জনৈকা প্রবীণা বৃদ্ধা নাইলন শাড়ী পরেন বলে অসীম কয়েকদিন ধবেই তাঁকে 'নাইলন-মাসি' বলে ডাকছে আব ভদ্রমহিলাও সে-ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই অসীম বলে ওঠে, "সে কি! আজও আপনি নাইলন শাড়ী পরে নিয়েছেন?"

"তাহলে কি পরব?" মাসি সহাস্যে প্রশ্ন করে।

অসীম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "কেন তুলতুল যেমন প্যাণ্ট্-সার্ট পরেছে, নিদেন-পক্ষে গৌরীদির মতো শালওয়ার-কামিজ।"

"কি যে বলো তুমি?" মাসি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করেন।

অসীম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "ঠিক আছে, ঐ শাড়ীতেই চলবে। তবে এই সুযোগে ঘোড়ায় চড়াটা ভালো করে প্র্যাক্‌টিস করে নিন। তাহলে আর কলকাতায় ফিরে ট্রাম-বাসের ঝামেলা সইতে হবে না।"

"মানে ?" মাসি বুঝতে পারেন না।

ওর বক্তব্য আমরাও অনুমান করতে পারছি না।

অসীম উত্তর দেয়, "কলকাতায় ফিরে একটা ঘোড়া কিনে নেবেন, তাতে চড়েই টালা-টালিগঞ্জ করতে পারবেন।"

আমরা হো হো হেসে উঠি। মাসিমাও বাদ যান না।

হাসি থামলে অসীম আবার বলে, "তুলতুল আর গৌরীদি কি বোকামীটাই করলে।"

"কেন ?" ওরা দুজনেই প্রশ্ন করে।

"ভাড়া দিয়েও ঘোড়ায় চড়লে না।"

"তাতে বোকামী কেন হল ?" তুলতুল জিজ্ঞেস করে।

অসীম জবাব দেয়, "কলকাতায় ফিরে গিয়ে নাইলন-মাসির মতো তোমাদের আর ঘোড়া কেনা হল না।"

আবার সমবেত হাস্যরোল।

ফকিরবাবু আগেই বলে দিয়েছেন—পথে যে যেমন পারবেন, পথ চলবেন কিন্তু সকালে সবাই একসঙ্গে যাত্রা করবেন।

সহযাত্রীরা সবাই তৈরি হয়ে আসেন নি এখনও। আমরা তাই হোটেলের সামনে রয়েছি দাঁড়িয়ে। আমরা যাত্রী, যাত্রাকাল সমাগত। আমরা শুভযাত্রার প্রতীক্ষায় রয়েছি।

আমি আজ সত্যই যাত্রা করছি অমরতীর্থ অমরনাথের পথে। আমার বহু বছরের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। বহু বাধা ও বিপত্তি উপেক্ষা করে আমি আজ এই যাত্রাপথের দ্বারে এসে দাঁড়াতে পেরেছি।

জানি না আমার যাত্রা সফল হবে কিনা ? জানি না আমি অমরতীর্থে পৌঁছব কিনা ? জানি না আমি সেই স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গকে দর্শন করতে পারব কিনা ?

আমি গুহাতীর্থের যাত্রী, হিমালয় পথের পথিক। যাত্রার সাফল্য আমার হাতে নয়, সে দায়িত্ব তীর্থদেবতার। যিনি আমাকে ডেকে এনেছেন, তিনিই আমায় পৌঁছে দেবেন সেই অমরতীর্থে। আমি পথিক, আমি শুধু পথ চলব।

সুতরাং সাফল্যের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি যাত্রার কথা, কিছুক্ষণ বাদে আমি যে যাত্রার সামিল হব, যুগাতীত কাল ধরে কত অসংখ্য যাত্রী সেই যাত্রায় যোগদানের জন্য প্রতিবছর আমারই মতো এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে—এই পহেলগাঁয়ের পথে। আমারই মতো তাঁরা যাত্রা করেছেন অমরতীর্থে। অনেকে

পৌঁছতে পারেন নি। কেউ ফিরে এসেছেন, কেউবা ফিরতে পারেন নি—বাবা অমরনাথের পদতলে রয়ে গিয়েছেন চিরকালের মতো।

তাঁদের সবার কথা জানা নেই আমার। আমি শুধু শুনেছি যুগের পর যুগ ধরে তাঁরা এসেছেন, তাঁরা আসছেন, তাঁরা আসবেন। এসেছেন মহাতপা মহামুনি ভৃগু, এসেছেন প্রজাপালক শ্রীরামচন্দ্র, এসেছেন যুগাবতার শঙ্করাচার্য। এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। এসেছেন বাংলাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক প্রবোধকুমার সান্যাল।

বিবেকানন্দ অমরনাথ দর্শন করেছেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, অভেদানন্দ ১৯২২ ও প্রবোধদা ১৯৫৩ সালে। স্বামীজী এসেছেন ৭৯ বছর আগে। অভেদানন্দ ৫৫ বছর ও প্রবোধদা ২৪ বছর আগে। আর আজ এই ১৯৭৭ সালের ১৯শে অগাস্ট আমি পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ যাত্রা করছি।

আমার কথা পরে হবে, আগে তাঁদের কথা ভেবে নিই। পহেলগাঁও থেকে স্বামীজীর যাত্রা প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'Notes of Some Wanderings with Swami Vivekananda' বইতে বলেছেন—'৩০শে জুলাই। প্রাতে ছয়টার সময় আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া যাত্রা করিলাম। কখন্ ছাউনীটী উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা যখন খুব প্রত্যুষে জলযোগ করি তখনই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। কল্য যে স্থানে সহস্র লোক এবং তাঁহাদের পটনিবাস বিদ্যমান ছিল, সেখানে গতপ্রাণ অগ্নিসমূহের ভস্মরাশি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।' নিবেদিতার নিজের ভাষায়—'The ashes of dead fires were all that marked the place where yesterday had been a thousand people and their canvas homes'

স্বামী অভেদানন্দ পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করেন ৪ঠা অগাস্ট, ১৯২২। তিনি যাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে এই অঞ্চলের পার্বত্য পথগুলি অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য "ধর্মার্থ বিভাগ" ঢোল পিটাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন—"রাস্তা পিচ্ছিল, চড়াই সাবধানে অতিক্রম করিবে, উৎরাইতে কেহ ঘোড়ার পিঠে থাকিবে না। বৃহৎ বোঝা ও তাঁবুর লম্বা খোঁটা কেহ ঘোড়ার পিঠে চাপাইবে না।" যাত্রীরা ঠিক মতো আদেশ পালন করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য পথের মোড়ে মোড়ে তাঁহারা পাহারারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।'

প্রবোধদা পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করেছিলেন ১৯৫৩ সালের ২১শে অগাস্ট।

প্রবোধদা লিখেছেন—'এযাত্রায় সকলের আগে গেছে প্রথম অমরনাথের পূজারির দল, তারা প্রথম অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হেঁটে। তাঁদের সঙ্গে আছে শ্রীঅমরনাথের আসাসোঁটা আর রাজছত্র, আছে পূজার উপকরণাদি, আছে শঙ্খ-ঘণ্টা। এরা প্রতি বছরই সকল যাত্রীর আগে গিয়ে গুহায় পৌঁছায়।...

'শান্ত পাহাড়ী ঘোড়া অনেকটা তাঁর নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তরপথে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাঁকে দেখতে পাচ্ছি সুদীর্ঘ পথে শ্রেণীবদ্ধ ঘোড়ার ক্যারাভান। পহলগাঁও ছাড়ালেই লিডার নদীর নড়বড়ে সাঁকো পাওয়া যায়, তারপরেই সরকারি টোল আপিস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়।'...

॥ সাত ॥

"বাবা অমরনাথজীকী ?"

"জয় ।"

শুরু হল যাত্রা — পরমপ্রার্থিত পদ যাত্রা। 'নিউ পাইনভিউ' হোটেলের গেট পেরিয়ে আমরা নেমে আসি পথে।

সেই পথ। পরিচিত পহেলগাঁয়ের পরিচিত পথ। গতকাল বারবার যেপথে পদচারণা করেছি, সেই পথ দিয়েই চললাম এগিয়ে। আমরা দশজন পদাতিক রয়েছি সবার শেষে। অশ্বারোহীরা টগ্‌বগ্‌ করে আগে আগে চলেছে। পথটা প্রায় মিছিলে পরিণত। যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষ আর মানুষ, ঘোড়া আর ঘোড়া।

আমরা পদাতিক হলেও আমাদের সঙ্গে দুটি ঘোড়া রয়েছে। ভাগ্যবান ঘোড়া। গৌরী ও তুলতুল তাদের পিঠে ওঠে নি। তারা হেলে-দুলে আগে আগে চলেছে।

রমণীয় পহেলগাঁও। অনন্তনাগ জেলার একটি তহশিল। সাতটি তহশিল আছে এই জেলায়। অমরনাথ পহেলগাঁও তহশিলের অন্তর্ভূত। এই তহশিলের আয়তন ১২১·৮ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা মাত্র ৪০,৬[illegible] জন।

কিন্তু তহশিলের কথা থাক, পহেলগাঁও শহরের কথাই ভাবা যাক। পহেলগাঁও শহরের আয়তন ২০·৭ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ২০৭২ হেক্টর। ছোট ও বড় মিলিয়ে মোট ৩৪০খানি বাড়ি আছে এই শহরে। স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র ২৩৩৫ জন। তাঁদের মধ্যে ১০৩৮ জন মহিলা এবং ১২৯৭ জন পুরুষ। এঁরা ৩৯০টি পরিবারে বিভক্ত। শহরে মাত্র ২২১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা লিখতে ও পড়তে পারেন।

রমণীয় পহেলগাঁও। এবারে মাত্র একটি দিন কাটিয়েছি তার বুকে। এরই মধ্যে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। বিদায় বেলায় মনটা তাই ভারী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমরা তো আবার ফিরে আসব তার কাছে। তবু মন মানে না। বিরহ মানেই বিষাদ।

তাহলেও মনকে বিষাদমুক্ত করতে হবে। বিষাদগ্রস্ত মন নিয়ে পাহাড়ী পথ পাড়ি দেওয়া যায় না। তাই পথের পাশে দোকান-পাটের দিকে তাকাই। অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে চাই।

বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। পেরিয়ে এলাম ময়দান। পৌছলাম লিডারের তীরে। লিডারের তীরে তীরে পথ চলে পায়ে পায়ে পৌছতে হবে অমরতীর্থ-অমরনাথে।

অনেকে অবশ্য নদীর এ অংশটাকে শেষনাগ নদী বলেন। তাঁদের মতে কোলাহাই থেকে সৃষ্ট ধারাটি শুধু লিডার। এটি তার উপনদী। আমি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার কাছে এটিও লিডার বা নীলগঙ্গা। নীলগঙ্গার বাম তীর দিয়ে সারি বেঁধে পথ চলেছি। আমরা এখন অমরতীর্থের পথ চলেছি।

সবার আগে মামা ও ভাগনে। তাদের পেছনে সরকারদা ও পরিতোষবাবু। তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গিয়েছেন। পরিতোষবাবুদের পেছনে ব্রহ্মচারী ও অশোক। তাদের পরে তুলতুল ও গৌরী। সবার শেষে আমি এবং অসীম। লাঠি হাতে অক্লেশে এগিয়ে চলেছি।

সামনে ও পেছনে যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু সারি সারি যাত্রী—অশ্বারোহী অথবা পদাতিক। অশ্বারোহীর সংখ্যাই বেশি। বিগত বিশ বছরে হিমালয়ের বিভিন্ন দুর্গম তীর্থপথ পরিক্রমা করেছি। কিন্তু কোথাও এত অশ্বারোহী দেখি নি। অথচ পাহাড়ী পথে ঘোড়ায় চড়া যেমন কষ্টকর তেমনি বিপজ্জনক। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাবার ভয়। আর তার ফলে চারিদিকে নজর দেবার অবকাশ থাকে না। দেবতাত্মা হিমালয়ের অপরূপ রূপ অদেখা থেকে যায়।

হঠাৎ ভাগনে পথ চলা থামায়। পিছন ফিরে হাসতে হাসতে বলে, "তুলতুল ও গৌরীদির ঘোড়াওয়ালারা কিছুতেই বুঝতে পারছে না, ঘোড়া ভাড়া নিয়েও কেন মেমসাবরা হেঁটে যাচ্ছেন। এমন কাণ্ড তারা আর কখনও দেখে নি।"

"কাল সকালেই বুঝতে পারবে।" অসীম মন্তব্য করে।

"মানে ?" তুলতুল বলে ওঠে।

"কাল সকালে উঠে যখন দেখবে পা ব্যথা হয়েছে, তখন সুড়সুড় করে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসবে।"

"আমাদের সম্পর্কে এত poor idea আপনার ?" গৌরী জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু অসীম উত্তর দেবার আগেই তুলতুল গম্ভীর স্বরে তাকে বলে, "আপনি আজ কোন প্রতিবাদ করবেন না গৌরীদি, আমরা কাল সকলেই অসীমদাকে

একথার জবাব দেব।" সে গট মট করে এগিয়ে চলে।

বেশিদূর এগোতে পারে না। প্রকৃতি যে পথের পাশে রূপের পসরা গিয়ে বসে রয়েছে। সেই রূপসুধা পান না করে কার সাধ্য তাড়াতাড়ি পথ চলে।

শহর ছাড়িয়ে এসেছি। পথটা একটু উঁচুতে উঠে আবার নেমে এলো নিচে। সেখানেই রামজীর মন্দির।

মন্দির দর্শন করে সোজা উত্তরে এগিয়ে চললাম। আমাদের বাঁ দিকে নদী, ডাইনে বন-জঙ্গল। বনের মাঝে মাঝে বাড়ি-ঘর। পথের পাশে ছোট উঠান কিংবা শাক-সব্‌জির বাগান। তারপরে কাঠ ও টিনের ঘর—ছবির মতো সুন্দর। আমাদের কথাবার্তা ও পায়ের শব্দে সাড়া পেয়ে জীর্ণ পোষাকপরা কিন্তু ফুলের মতো সুন্দর কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটে আসে বাইরে। হাত বাড়িয়ে করুণ স্বরে বলতে থাকে—বাবুজি, শেঠজি, সাহাব···।

দু-চারটি করে পয়সা দিই, দু-একটি করে লজেন্স দিই। ওরা খুশি হয়ে সেলাম করে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আসাম থেকে গুজরাত, যেখানেই গিয়েছি এই অভুক্ত ছেলে-মেয়ের দল এসে এমনি আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। দু-চারটি পয়সা দিতেই তারা এমনি খুশি হয়ে নমস্কার করেছে। এদের কাছে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান শব্দগুলো অর্থহীন। এরা শাসকদের দল বদলের সংবাদ রাখে না। হয়তো বা স্বাধীন ও পরাধীনের পার্থক্যও বোঝে না।

পথটি বাঁয়ে বাঁক নিল। আমরা উৎরাই পথ বেয়ে নেমে এলাম লিডারের বেলাভূমিতে। কাঠের প্রশস্ত পুল পেরিয়ে নদীর অপর তীরে এলাম। এখন নীলগঙ্গা আমাদের ডাইনে। আমরা চড়াই ভেঙে ওপরে উঠছি।

একটু বাদেই চড়াই শেষ হল। প্রায় সমতল একটি সংকীর্ণ অধিত্যকা। তারই ওপর দিয়ে পথ প্রসারিত। ওপারে নদীর গায়ে খাড়া পাহাড়। এপারে পাহাড় অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে।

এখানে কয়েকখানি কাঠ পাথর ও টিনের ঘর রয়েছে। তার একখানিতে চুঙ্গি অফিস। ঘোড়া ও ডাণ্ডিওয়ালাদের পরচা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সুতরাং অশ্বারোহীদের নামতে হয়েছে মাটিতে। ঘোড়ার সঙ্গে তাঁরাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন পথের পাশে। আমাদের ঘোড়া দুটি লাইনে দাঁড়ায়। আমরা শালবল্লীর গেট পেরিয়ে এপারে আসি।

বাকি ঘরগুলো সবই দোকান। দরজি মুদি ও মনোহারী দোকান। চাল-ডাল আটা, তেল নুন বিড়ি দেশলাই থেকে কাপড় পর্যন্ত সবই পাওয়া যাচ্ছে।

গুটিদুয়েক চায়ের দোকানও আছে।

আমরা কিন্তু বসলাম না, সোজা পথ ধরে উত্তর-পুবে এগিয়ে চললাম।

কয়েকপা এগিয়েই ছোট কাঠের পুল। বাঁ পাশের পাহাড় থেকে একটি ঝরণা এসে নীলগঙ্গায় পড়েছে। তারই ওপরে পুল।

পুল পেরিয়েই পথের ধারে একখানি সাইনবোর্ড—

'Holy Cave 29 miles

Chandanwari 9 „

"তার মানে আমরা এক মাইল এলাম।" তুলতুল বলে।

"হ্যা।" অসীম যোগ করে, "আরও উনত্রিশ মাইল হাঁটতে হবে।"

"হাঁটব।" তুলতুল বেপরোয়া কণ্ঠে বলে। আর তারপরেই বোধহয় তার মনে পড়ে কথাটা। সে বলে ওঠে, "আপনার ভুল হল অসীমদা!"

"কি রকম?"

"উনত্রিশ মাইল যেতে আর তিরিশ মাইল ফিরতে, তার মানে আরও উনষাট মাইল হাঁটতে হবে। হাঁটব।"

পরাজিত অসীম চুপ করে থাকে।

"আজকালকার মেয়ে অসীমদা, কথায় পেরে উঠবেন না।"

"তোমার ছাত্রীরাও বোধহয় তোমাকে এমনি কথায় হারিয়ে দেয়?"

"হামেশা।"

ব্রহ্মচারীর স্বীকারোক্তি শুনে সবাই হেসে উঠি।

পথ বেশ প্রশস্ত। এখন চন্দনবাড়ি পর্যন্ত জীপ ও ট্রাক চলাচল করছে। পথটি পাকা হয় নি বলে বাস চলছে না। দু-এক বছর বাদে তীর্থযাত্রীদের আর এ পথটুকু হাঁটতে হবে না। চন্দনবাড়ি থেকেই তাঁদের পদযাত্রা শুরু হবে। অর্থাৎ যাতায়াতে বিশ মাইল পথ কমে যাবে। এখনও অবশ্য অনেকে বিশেষ ব্যবস্থা করে মালের ট্রাক কিংবা সরকারী জীপে চড়ে চন্দনবাড়ি চলে যান।

আগে হাঁটা পথে পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ির দূরত্ব ছিল আট মাইল। আর্থার নেভে নামে জনৈক ডাক্তার এই শতাব্দীর প্রথম দশকে মেডিক্যাল মিশন নিয়ে কাশ্মীরে এসেছিলেন। তিনি কিন্তু লিখেছেন পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি নয় মাইল।

ডাঃ নেভে ডাক্তারী করতে এসে কাশ্মীর হিমালয়ে প্রচুর পদপরিক্রমা করেছেন এবং পর্যটক ও পর্বতারোহীদের জন্য একখানি চমৎকার 'গাইড বুক' সম্পাদনা করেছেন। বইখানির নাম 'The Tourist Guide to Kashmir,

Ladakh, Skardo & C.' সেই বইতে তিনি এই পথ ও চন্দনবাড়ির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'The pilgrim route goes up the east branch ···The scenery gets even wilder. At one place there is a fine cascade.···The road is rough, but practicable for laden ponies. The encampment is on a broad, grassy meadow surrounded by fine trees and overhung by huge crags'

সেকালে দূরত্ব যা-ই হয়ে থাক্, একালে পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি দশ মাইল। অর্থাৎ মোটরপথ হয়ে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে কিন্তু যাত্রীরা এখনও হাঁটা থেকে রেহাই পান নি।

তবে তাতে তাঁদের তেমন ক্ষতি হয় নি। কারণ এমন সুন্দর পথে পদচারণা পথিকের পরম সৌভাগ্য। বাঁয়ে গাছে ছাওয়া সবুজ পাহাড়, ডাইনে সোনালী মকাই আর লাল রামদানার ক্ষেত। তারপরে নীলধারার মতো আঁকাবাঁকা নীলগঙ্গা। সুনীল ফেনিল উচ্ছ্বসিতা লিডার। নাচতে নাচতে নিচে চলেছে। তার কলগানে চারিদিক মুখর করে রেখেছে।

বাঁদিকের পাহাড় আস্তে আস্তে পথ থেকে ওপরে উঠে গিয়েছে। তার বুক জুড়ে বনের বিস্তার—পাইনের সারি। পাইনগাছের গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে নানা জাতের ফার্ন আর পথের পাশে ফুটে আছে অসংখ্য রঙীন বনফুল—"প্রাইমুলা", "ক্রেন্‌স বিল্", "জেনশিয়ান" প্রভৃতি জানা-অজানা ফুল।

মাঝে মাঝে গুর্জরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এবং শিশু সবাই আছে ওদের দলে। গরু ঘোড়া ও ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে ওরা। কোথায় কে জানে? হয়তো নিজেরাও জানে না। ওরা যে যাযাবর। সব সময় ভাবে—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

আর তারই ফলে আমরা হারিয়ে যাওয়া অমরনাথকে আবার খুঁজে পেয়েছি। এদেরই মতো একজন যাযাবর গুর্জর ছিলেন আক্রামবাট মল্লিক। পহেলগাঁও তহশিলের বটকোট গাঁয়ের মানুষ তিনি। ভেড়া চড়াতে গিয়েছিলেন ঐ অঞ্চলে। একদিন একটা ভেড়া গেল হারিয়ে। ভেড়া খুঁজতে খুঁজতে আক্রামবাট গিয়ে উপস্থিত হলেন গুহাতীর্থে।

মেষপালক তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেষটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই আমার, শুধু জানি তিনি হারিয়ে যাওয়া অমরতীর্থকে খুঁজে পেয়েছিলেন, দর্শন করেছিলেন স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ।

স্বামীজীও মোটামুটিভাবে এই কাহিনী সমর্থন করেছেন। এই সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—'he who (Vivekanandada) suggested that the first discovery of the place had been by a party of shepherds, who had wandered far in search of their flocks one summer day, and had entered the cave to find themselves, before the unmeeting ice, in the presence of Lord Himself.'

আক্রামবাট মল্লিক সম্ভবতঃ সেই মেষপালকদের নেতা ছিলেন। আর তাই তাঁর বংশধরগণ আজও ভক্তবৃন্দের অর্ঘ্যের অংশ পেয়ে যাচ্ছেন। পুণ্যার্থীরা অমরনাথের উদ্দেশে যে অর্থ বস্ত্র এবং ফল-মূল ও মিষ্টি নিবেদন করেন, তা তিনভাগ করা হয়। একভাগ পান ছড়ির মহান্ত মহারাজ, একভাগ মার্তণ্ডের পাণ্ডা অর্থাৎ অমরনাথের পূজারীরা, আরেক ভাগ আক্রামবাটের বংশধরগণ। মুসলমান হয়েও তাঁরা পুরুষানুক্রমে হিন্দু পুণ্যার্থীদের অর্ঘ্য পেয়ে যাচ্ছেন। আর তাই মল্লিকরা পহেলগাঁয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবার।

আক্রামবাট কবে গুহাতীর্থ আবিষ্কার করেছেন, তার তারিখ জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি সেটি নিতান্তই একালের কথা। কারণ আধুনিক যুগেই আমরা অমরনাথকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অমরনাথ সুপ্রাচীন তীর্থ। সেকালে সবাই জানতেন এই গুহাতীর্থের কথা। যাত্রারও প্রচলন ছিল। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ কাশ্মীর ও হিমাচলের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী। কাশ্মীররাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে মহাকবি কল্হন এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসকে শ্লোকবদ্ধ করেন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন কবি জোনরাজ। তাঁর শিষ্য কবি শ্রীবর রচনা করেন পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। তার মানে রাজতরঙ্গিনী দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের কাব্য-ইতিহাস।

রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় প্রায় তিনহাজার বছর আগে রামদেব নামে কাশ্মীরে এক রাজা ছিলেন। তিনি শুকদেব নামে এক লম্পট রাজপুরুষকে গুহাতীর্থ অমরনাথে বন্দী করে রেখেছিলেন। তারপরে তাকে নীলগঙ্গায় ফেলে দিয়ে মেরে ফেলা হয়।

রাজতরঙ্গিনীর আরেক জায়গায় বলা হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪ থেকে ১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজা সৈদিমতি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। তিনি অমরনাথের যাত্রায়

অংশ নিয়ে তুষারালজ দর্শন করেছিলেন।

এ তো গেল প্রাচীনযুগের কথা, এবারে মধ্যযুগের কথা ভাবা যাক। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন। তাঁর সভাসদ ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত আবুল ফজল (খ্রীঃ ১৫৫১-১৬০২) 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে অমরনাথের তুষারলিঙ্গ ও যাত্রা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তার মানে সপ্তদশ কি অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে আমরা অমরতীর্থকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। অষ্টাদশ কি উনবিংশ শতাব্দীতে আক্রামবাট আবার গুহাতীর্থকে খুঁজে পেয়েছেন। এবং তার অনতিকাল পরেই (১৮১৯ খ্রীঃ) পণ্ডিত হরদাস টিকু এই যাত্রাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

কিন্তু গুহাতীর্থের কথা এখন আর নয়। তীর্থ কিংবা তীর্থদেবতার কথা না ভেবে তীর্থপথকে দেখা যাক। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দের পদরেণুরঞ্জিত পথে পদচারণা করছি আমি। আমি ধন্য, ধন্য আমার জীবন।

বাঁদিকের পাহাড় সরে গিয়েছে খানিকটা। ঘাসে ছাওয়া বনময় সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে মকাই ক্ষেত। ডানদিকে অনেকটা নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে নীলগঙ্গা। সব সময় দেখা যাচ্ছে না, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু নিজেকে গোপন করতে পারছে না। কারণ তার কলগান কানে আসছে অবিরত।

আরেকটি গ্রামে আসা গেল। ছোট গ্রাম—পথের ধারে দুটি দোকান ও গুটিকয়েক বাড়ি। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে তেমনি পথের ধারে দাঁড়িয়ে পয়সা চাইছে, তেমনি দু-চারটি করে পয়সা দিতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে।

সবাই বলেন—কাশ্মীর বড়লোকদের জায়গা। কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা কাশ্মীরে এসে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে যান। তার ওপরে ভারত সরকার বহু বছর ধরে কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত উদারহস্তে সাহায্য করে চলেছেন। অথচ দরিদ্র কাশ্মীরীদের অবস্থা একই রয়ে গেল। আশি বছর আগে স্বামীজী যখন এই পথ দিয়ে অমরনাথ গিয়েছেন, তখন তাঁর কাছে ছেলে-মেয়েরা যেমন পয়সা চেয়েছে, আজ আমার কাছেও তেমনি চাইছে। 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

চিন্তায় ছেদ পড়ে। গৌরীর ঘোড়াওয়ালা জানায়—এটি এপথের শেষ গ্রাম।

"তার মানে আমরা পহেলগাঁও থেকে তিনমাইল এসেছি?"

সে মাথা নাড়ে।

গৌরী বলে, "আরও সাত মাইল হাটতে হবে আজ?"

হ্যাঁ। অসিত উত্তর দেয়।

ঠিক কথা ডাক্তার অসিতও হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে সে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। তার মানে আমরা এখন এগারোজন।

"পথ কিন্তু মোটেই খারাপ নয়।" তুলতুল মন্তব্য করে।

খুশি হই। হিমালয়ের দুর্গমপথে এই তার প্রথম পদপরিক্রমা। সুতরাং তার মন্তব্য মূল্যবান।

"খারাপ তো দূরের কথা, বেশ সহজ এবং নিরাপদ পথ।" গৌরী যোগ করে।

"কাল টের পাবেন কেমন পথ—পিস্থু চড়াই পেরোতে হবে।" অসীম যথারীতি ওদের ভয় দেখায়। বলে, "আজ তো মোটরপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন।"

কথাটা গৌরীকে বললেও অসীমের আসল লক্ষ্য তুলতুল। কিন্তু সে কিছুই বলে না। সে সামনের দিকে তাকিয়ে পথ চলেছে। কি যেন দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

হঠাৎ তুলতুল ডাক্তারকে বলে, "বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে দেখুন তো অসিতদা! সামনে কে হেঁটে হেঁটে চলেছে। অনেকটা আমার বাবার মতো মনে হচ্ছে।"

কিন্তু তিনি হেঁটে যাবেন কেন? মিঃ ভট্টাচার্য তো ঘোড়া নিয়েছেন! না, না, তুলতুলের অনুমান সত্য নয়।

অসিত অন্যকথা বলে। চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে সেটি তুলতুলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "আমার তো মনে হচ্ছে মেসোমশাই, তুমি একবার দেখো তো!"

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়েই তুলতুল চেঁচিয়ে ওঠে, "হ্যাঁ, আমার বাবা। কিন্তু বাবার ঘোড়া কোথায় গেল?"

সত্যই ব্যাপারটা বিস্ময়কর।

তুলতুলের ঘোড়াওয়ালাকে বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা। তারপরে বলি, "তুমি ঘোড়ায় চড়ে তাড়াতাড়ি ঐ সাহেবের কাছে চলে যাও, তাঁকে একটু থামতে বলো। আমরা আসছি।"

সে জোর কদমে এগিয়ে যায়, আমরাও জোরে জোরে পা চালাই।

কয়েক মিনিট বাদেই আমরা মিঃ ভট্টাচার্যের কাছে পৌঁছই। তিনিও খুশি হলেন আমাদের পেয়ে। তারপরে জানালেন, "আমার ঘোড়াওয়ালা নাকি কাল সন্ধ্যার সময় পহেলগাঁও পৌঁচেছে, তখন অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর 'ট্যাক্স'

টোকেন' করাতে পারে নি। আজ তো অফিস খোলার আগেই রওনা হতে হয়েছে। তাই চুঙ্গি অফিসের একটু আগে আমাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আপনি আস্তে আস্তে হাঁটুন, আমি ঘোড়া নিয়ে সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে আপনার কাছে আসছি।"

"কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ আগের কথা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মিঃ ভট্টাচার্য মাথা নাড়েন।

"তার মানে তুমি তো প্রায় আড়াই মাইল পথ হেঁটেছো?" মেয়ের স্বরে অভিযোগ।

বাবা অপরাধীর স্বরে বলে, "কিন্তু আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

"না, না, তোমার পায়ে ব্যথা। তুমি আমার ঘোড়ায় উঠে বসো।" একবার থামে তুলতুল। তারপরে ঘোড়াওয়ালাকে বলে, "এই সাব্‌কো ঠিক্‌সে লে যাও।"

বাবা মেয়ের কথা অমান্য করতে পারেন না। তিনি ঘোড়ায় উঠতে যান আর ঠিক তখুনি তুলতুলের ঘোড়াওয়ালা বলে ওঠে, "সাব্‌, আপকা ঘোড়া আগিয়া।"

"কিধর?" আমরা সমস্বরে বলে উঠি।

ঘোড়াওয়ালা ইসারা করে। তাকিয়ে দেখি সত্যি সামনের পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে একটা ঘোড়াকে নামিয়ে আনছে একজন লোক।

তুলতুল আবার দূরবীন চোখে দেয়। বলে, "হ্যাঁ, বাবা! তোমার ঘোড়াওয়ালাই আসছে।"

অতএব আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি ঘোড়াওয়ালার কথা। ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য লোকটাকে না জানি কত মাইল চড়াই-উৎরাই করতে হল?

কিন্তু এছাড়া সে কিই বা করতে পারে। একে তো ওদের আয়ের তুলনায় ট্যাক্স বেশি। তার ওপরে আগে ট্যাক্স টোকেন না করাবার জন্য নিশ্চয়ই অনেক খেসারত দিতে হত। অপরাধ বন্ধ করবার জন্য যে আইন, সেই আইন অনেক সময় অপরাধ বাড়িয়ে তোলে।

মনে পড়ছে প্রবোধদার মন্তব্য। তিনি লিখেছেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়।'

প্রবোধদা অমরনাথ এসেছিলেন ১৯৫৩ সালে, তার মানে চব্বিশ বছর আগে।

তারপরে নীলগঙ্গা দিয়ে বহুজল বয়ে গিয়েছে। কিন্তু দরিদ্র ঘোড়াওয়ালাদের ওপরে জুলুম কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। অথচ ইতিমধ্যে আমরা নাকি অনেকখানি গরীবী হটিয়ে সমাজতন্ত্রের খুবই কাছাকাছি এসে গিয়েছি!

ঘোড়া দেখেই খোঁড়া হলেন মিঃ ভট্টাচার্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন। একবার পেছন ফিরে হাত নাড়লেন। বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে। তারপরেই টগ্‌বগ্‌ করে এগিয়ে চললেন জোর কদমে।

আমরাও শুরু করি পথ চলা। মেয়ের দুশ্চিন্তার অবসান হয়। সে চলার বেগ দেয় বাড়িয়ে।

তুলতুল নয়, আমি ভেবে চলি তার বাবার ঘোড়াওয়ালার কথা। কর ফাঁকি দেবার জন্য লোকটি কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। অথচ সে ঠগ নয়। এরা দরিদ্র ও অশিক্ষিত কিন্তু অসৎ নয়। অসৎ হতে পারলে এরা আর দরিদ্র থাকত না। তবু আজ তাকে অসৎ হতে হয়েছে।

সরকারকে কর দেওয়া দেশবাসীর কর্তব্য। আবার দেশের মানুষের অন্ন-সংস্থান করাও সরকারের কর্তব্য। দুর্ভাগ্যের কথা সরকার সে কর্তব্য পালন না করেও কর আদায় করে চলেছেন। এবং করের বোঝা চাপাবার সময় দেশের মানুষের ক্ষমতা বিচার করছেন না। ফলে কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। সৎ মানুষ অসৎ হয়ে পড়ছে।

এই ঘোড়াওয়ালাদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। চাষ ও ফসলকাটার সময় দিনমজুরী ও বাকি সময় মাল পরিবহনের কাজ করে এরা সংসার প্রতিপালন করে। পহেলগাঁয়ে ঘোড়াওয়ালাদের মরশুম সাত মাস। কিন্তু সে কেবল কাছাকাছি গাঁয়ের ঘোড়াওয়ালাদের জন্য। দূর গাঁয়ের ঘোড়াওয়ালারা কেবল অমরনাথ যাত্রার সময় পহেলগাঁয়ে আসে। যাত্রার সময় তারা বড়জোর বার তিনেক যাত্রী বহন করতে পারে। এই বাড়তি রোজগারটুকু তাদের সংবৎসরের শ্রেষ্ঠ সম্বল। মহাজনের দেনা মেটাবার একমাত্র উপায়। দুঃখের কথা কর্তৃপক্ষ সেই রোজগারে অন্যায়ভাবে ভাগ বসান। সাধ্যের অতিরিক্ত কর আদায় করেন। ফলে সুযোগ পেলেই তারা কর ফাঁকি দিতে চায়।

"ওটা কি শঙ্কুদা!"

তুলতুলের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। ঝরণার ধারে ছোট ঘরটি দেখিয়ে সে প্রশ্নটা করেছে।

করতেই পারে। সে যে হিমালয়ে দুর্গমপথে প্রথম পদচারণা করছে।

"পানি-চাক্কি।" আমার আগেই উত্তর দেয় ভাগনে। বলে, "ঝরণার

স্রোতের সাহায্যে পাথরের যাঁতা ঘুরিয়ে গম ও রামদানা প্রভৃতি পিষে আটা তৈরি করা হয়।"

"আমি একটু দেখব।" তুলতুল আবদার করে।

"বেশ তো যাও না, দেখে এসো।" আমি বলি।

অশোক ও অসিত তুলতুলকে নিয়ে যায় ছোট ঘরটিতে। ব্রহ্মচারীও সঙ্গী হয় ওদের।

একটু বাদে ওরা ফিরে আসে। আমরা আবার পথচলা শুরু করি।

"দেখুন দেখুন কি সুন্দর, অনেকটা ধরালীতে ভাগীরথীর বেলাভূমির মতো, তাই না শঙ্কুদা?" গৌরী প্রশ্ন করে আমাকে। সে ইসারায় নীলগঙ্গার সাদা বেলাভূমি দেখায়।

পথের পাশে ঝোপঝাড়ে বোঝাই গভীর খাদ। খাদের শেষে, অনেকটা নিচে নীলগঙ্গা। সাদা পাথর ও বালির নদীখাতের ওপর দিকে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে একটি নীলধারা। সত্যি সুন্দর। আমরাও দেখি, দু-চোখ ভরে দেখি।

কিছুক্ষণ আগে একটু গরম লাগছিল। কিন্তু এখন ছায়াশীতল পথ, বেশ জোরে বাতাস বইছে। পথ চলতে ভাল লাগছে।

বিচিত্র প্রকৃতি। একটু বাদেই বন শেষ হয়ে গেল। একেবারে ন্যাড়া একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ চলেছি। কিন্তু গরম লাগছে না, কারণ ইতিমধ্যে একখানি কালো মেঘ এসে আকাশ ঢেকে ফেলেছে। রোদ মিলিয়ে গিয়েছে? বৃষ্টি নামবে নাকি?

ভাবতে ভাবতেই শুরু হল বর্ষণ। হিমালয়ের বৃষ্টি এমনি হঠাৎ এসে পড়ে। রেন-কোট গায়ে দিয়ে নিই। এখানে কোন গাছপালা নেই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

বেশ খানিকটা হেঁটে আসার পরে কয়েকটি পাইন গাছের দেখা পেলাম। তাদের তলায় দাঁড়ানো গেল। জল পড়ছে, মাথা বাঁচছে না, তবু দাঁড়িয়ে থাকি।

"এ ভদ্রমহিলা তো আমাদের সঙ্গে এসেছেন।"

তুলতুলের কথা শুনে পথের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, এক বৃদ্ধা বিধবা অতি কষ্টে এগিয়ে আসছেন। ইস্, বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চুপ্‌সে গিয়েছেন। সারা গায়ে কাদায় লেপালেপি। বোধহয় বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়েছেন।

গৌরী সমর্থন করে তুলতুলকে। বলে, "হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গেই এসেছেন। কিন্তু উনি ঘোড়া নেন নি কেন? ওঁর অবস্থা তো খারাপ নয়!"

ভদ্রমহিলা লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে তাঁর। হবেই তো, একে বৃষ্টি তার ওপরে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। সামনে আসতেই তাঁকে কাছে ডাকি। তিনি গাছতলায় এসে মাটিতে বসে পড়েন। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন।

আমার হ্যাভারস্যাক থেকে গামছা বের করে দিই। বলি, "গা মুছে ফেলুন।"

মামা বলে, "আমার ব্যাগে একখানি গরম চাদর আছে। দেব নাকি ঘোষদা?"

"চাদরটা ভিজে যাবে, তবু দাও।"

মামার হাত থেকে চাদরখানি নিয়ে গৌরী বলে, "শঙ্কুদা, আপনারা একটু বাঁকের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ান, আমরা ওঁর জামা-কাপড় পালটে দিই।"

গৌরী তার ঘোড়াওয়ালার কাছ থেকে থলিটা চেয়ে নেয়। আমরা কয়েক পা এগিয়ে বাঁকের এপাশে একটা গাছের তলায় দাঁড়াই।

তুলতুল ডাক দেয়। ফিরে আসি আগের জায়গায়। শুকনো শাড়ী ও চাদরের কৃপায় ভদ্রমহিলার কাঁপুনি কমেছে। বৃষ্টিও কমে আসছে। একটু বাদে রওনা হওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। এবারে জিজ্ঞেস করি, "আপনার সঙ্গীরা কোথায়?"

"সবাই ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনি ঘোড়া নেন নি কেন?" পরিতোষবাবু প্রশ্ন করেন।

"ভেবেছিলাম হেঁটে গিয়ে বাবাকে দর্শন করব।" একবার থামেন তিনি। তারপরে ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "এখন বুঝতে পারছি পারব না।"

"তাহলে এক কাজ করুন।" তুলতুল বলে, "আমাদের সঙ্গে দুটো ঘোড়া রয়েছে, আপনি তার একটায় চড়ে চন্দনবাড়ি চলে যান।"

"না, মা!" ভদ্রমহিলা প্রায় কেঁদে ফেলেন। করুণ কণ্ঠে বলেন, "আজ প্রথম দিনের যাত্রাটা অন্তত আমাকে পায়ে হেঁটে শেষ করতে দাও। আর তো বেশি দূর নেই?"

"এখনও মাইল দুয়েক।" আমি তাঁকে মনে করে দিই।

"তা হোক গে," তিনি বলেন, "তোমাদের ঘোড়াওয়ালা আমার ভিজে জামা-কাপড়গুলো নিয়ে যাক্। বৃষ্টি কমে গিয়েছে, তোমরাও রওনা হও, আমি আস্তে আস্তে ঠিক পৌঁছে যাবো।"

"কাজটা আপনি যত সহজ ভাবছেন, অত সহজ নয় মা! দু-মাইল পথ জলে কাদায় দুর্গম হয়ে উঠেছে। আপনি একা হেঁটে যেতে পারবেন না।" পরিতোষবাবু কিঞ্চিৎ কর্কশ স্বরে বললেন কথাগুলো।

দু-হাত জোড় করেন ভদ্রমহিলা। সবিনয়ে বলেন, "তাহলে তোমরা একজন একটু আমার সঙ্গে থাকো, একটা দিন অন্তত আমি পায়ে হেঁটে যাই। কাল থেকে ঘোড়া নেবো, তোমরা দেখে নিও।"

অগত্যা সঙ্গীদের বলি, "বৃষ্টি থেমে গেছে, বেলা তিনটে বাজে। তোমরা এগিয়ে যাও, সাবধানে যেও। আমি ওনাকে নিয়ে আস্তে আস্তে আসছি।"

॥ আট ॥

মেঘলা আকাশ তাই আলো কম। নইলে সন্ধ্যের অনেক আগেই আমরা পৌঁছে গিয়েছি চন্দনবাড়ি বা চন্দনওয়াড়ী। আবার অনেকে বলেন ট্যানিন (Tanin) অথবা চান্দওয়াস (Chandawas)। আমরা চন্দনবাড়ি বলেই ডাকব একে। কারণ যে যে-নামেই ডাকুন, এটি তার সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম।

ছোট কিন্তু পরম রমণীয় উপত্যকা এই চন্দনবাড়ি। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ের প্রাচীর। একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লিডার। তার তীরে সারি সারি তাঁবু পড়েছে যাত্রীদের।

পথের বাঁদিকের পাহাড় থেকে একটি পাহাড়ী নদী নেমে এসেছে সমতলে, মিলিত হয়েছে নীলগঙ্গার সঙ্গে। নদীটির নাম শুনেছি জলজপট (JOLJPAT)। তার ওপরে একটি পুল। এই পুলটি প্রকৃতপক্ষে চন্দনবাড়ির প্রবেশ তোরণ। আমরাও পুল পেরিয়ে চন্দনবাড়ির রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হয়েছি।

পুল পেরিয়েই পথের বাঁদিকে বিশ্রাম-ভবন এ একাধিক সরকারী অফিস। একটু এগিয়ে ডানদিকে দোকানপাট, যাত্রীনিবাস ও মালবাহকদের বাসগৃহ।

যাত্রীর তুলনায় আশ্রয় খুবই কম। তাই কণ্ট্রাকটার সর্দারজীরা লিডারের তীরভূমিকে একটি তাঁবু নগরীতে রূপান্তরিত করেছেন। কয়েক বছর আগেও সবাইকে পহেলগাঁও থেকে ভাড়া করা তাঁবু বয়ে নিয়ে আসতে হত। এখনও অনেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু না আনলেও তেমন ক্ষতি নেই। কারণ সর্দারজীরা যাত্রার অনেক আগের থেকেই চন্দনবাড়ি, শেষনাগ ও পঞ্চতরণীতে স্থায়ী তাঁবু ফেলে রাখেন। ভাড়ার বিনিময়ে সেখানে আশ্রয় পাওয়া যায়। এমন কি বিছানাসহ খাটিয়া পেতেও অসুবিধে নেই কোন। ৯০০০ ফুট উঁচু স্যাঁতস্যাঁতে উপত্যকায় ভূমিশয্যা কোনমতেই সুখকর নয়!

পথের বৃষ্টি পথেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তারই মধ্যে পথ হয়ে উঠেছে অতিশয় দুর্গম। গৌরীর শাড়ী পরে ভদ্রমহিলার কাঁপুনি কিছু কমে গিয়েছিল। তাহলেও তিনি খুবই আস্তে আস্তে পথ চলেছেন। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে তার চেয়ে জোরে চলা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। ফলে আমি সকলের শেষে এখানে এসেছি।

তাহলেও সন্ধ্যের অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছি চন্দনবাড়ি। ভদ্র-মহিলাকে তাঁর তাঁবুতে দিয়ে নিজের তাঁবুতে এসে দেখি খেয়ে-দেয়ে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছে ওরা। আমাকে দেখতে পেয়েই আড্ডা থামিয়ে সোচ্চার স্বরে স্বাগত জানালো। অজিত ছুটে গিয়ে খাবার নিয়ে এলো।

খাবার পরে পথে বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা চন্দনবাড়ি দেখতে বেরিয়েছি। কাল সকালে সময় পাওয়া যাবে না। ৩৪°৫´ অক্ষরেখা ও ৭৫°২৭´ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই ত্রিভুজাকৃতি রমণীয় উপত্যকা। নীলগঙ্গা বিধৌত বনময় পাহাড়ে ঘেরা তৃণময় উপত্যকা। এখানে-ওখানে প্রচুর বনফুলের সমারোহ। স্বর্গে যাবার ছাড়পত্র পাবো কিনা জানা নেই আমার। কিন্তু প্রতিবার হিমালয়ে এসে নন্দনকাননের সৌন্দর্য দর্শন করে যাই। প্রথমদিন পদযাত্রার পরেই বেশ বুঝতে পারছি দেবতাত্মা হিমালয়ের কৃপায় এবারেও আমি সে সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হব না।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ইদানিং কালে বিশেষ করে ১৯৬২ সালের পর থেকে রাস্তাঘাট তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সভ্যতা হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে অনুপ্রবেশ করছে। যেখানে আমরা ধরাসুতে বাসপথের প্রান্তসীমা দেখেছি, সেখানে প্রায় দশবছর আগে গঙ্গোত্রীতে বাস চলে গিয়েছে। অথচ আজও চন্দনবাড়িতে বাস এলো না, এমনকি রাস্তা তৈরি হয়ে যাবার পরেও না।

বাস না গেলেও জনপদ গড়ে ওঠে, নাগরিক সভ্যতা এগিয়ে যায়। এখানে জল আছে, কাঠ আছে, অথচ জনবসতি নেই। ব্যাপারটা বিস্ময়কর!

যাক্‌গে সেকথা, তার চেয়ে চন্দনবাড়িকেই দেখা যাক। এখান থেকে অমরনাথ যাবার দুটি পথ। একটি শেষনাগ ও পঞ্চতরণী হয়ে, যেপথে এখন সবাই যান, যে পথে আমরা যাবো। আরেকটি পথ আস্তান (Astan) মার্গ ও কাল-হ্রদ (Lake of Dleath) হয়ে, যে পথে স্বামীজী ফিরে এসেছিলেন। আগে সকলে এই পথে ফিরে আসতেন, কারণ পথটি দুর্গম এবং বিপজ্জনক হলেও দর্শনের পরের দিনই পহেলগাঁও ফিরে আসা যেতো। তখনকার দিনে শেষনাগ হয়ে তিনদিনের কমে ফেরা যেতো না। কিন্তু এখন শেষনাগের পথ ভাল হয়ে গিয়েছে। এ পথেই দ্বিতীয় দিনে পহেলগাঁও ফেরা যায়। সুতরাং কেউ আর বড় একটা ওপথে ফেরেন না। সাধারণ যাত্রীদের যেতে দেওয়াও হয় না।

আজ ১৯শে অগাস্ট ১৯৭৭, আর স্বামীজী এখানে এসেছিলেন ৩০শে জুলাই, ১৮৯৮। প্রায় আশি বছর আগে। অথচ কি আশ্চর্য সেদিনও নাকি আজকের

মতই বৃষ্টি হয়েছিল এখানে। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—'সমস্ত বৈকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে,…তুই পশলা বৃষ্টির অবকাশটীতে আমি গাছপালা সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলাম এবং সাত আট রকমের Myesotis দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে তুইটী আমার নিকট নূতন। তৎপরে আমি আমার ফার্ গাছটীর ছায়ায় ফিরিয়া আসিলাম, উহা হইতে তখনও বারিকণা টপ টপ করিয়া পড়িতেছে।'

অভেদানন্দজী চন্দনবাড়িতে বরফ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন ৪ঠা অগাস্ট (১৯২২)। কি জানি, পনেরোদিন আগে এলে আমরাও হয়তো এখানে বরফ দেখতে পেতাম। অবশ্য উচ্চহিমালয়ে যেমন তুষারপাতের কোন সময়-অসময় নেই, তেমনি বরফের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থার ওপরে, যেটি বছর বছর পরিবর্তনশীল।

যাকৃগে, সেকথা ভাবছিলাম। অভেদানন্দ পঞ্চান্ন বছর আগে চন্দনবাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা মোটামুটিভাবে আজও মিলে যাচ্ছে। যেমন, 'যে স্থানটিতে যাত্রীদের তাঁবু পড়িয়াছে তাহা একটি বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এই স্থানের চারিদিকেই পাহাড় এবং আখরোট, ভূর্জপত্র প্রভৃতির জঙ্গল। নিকটেই একটি পার্বত্য নদী পাথরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।' তবে তখন সরকারী তত্ত্বাবধায়ক তাঁদের বলেছিলেন, 'রাত্রে এই স্থানে বন্যজন্তুর ভয় আছে।' সেটি আর নেই এখন।

প্রবোধদা এসেছিলেন অভেদানন্দের একত্রিশ বছর বাদে। তিনিও কিন্তু বলেছেন, 'চন্দনবাড়ী অধিত্যকা হোলো একটুখানি অবকাশ মাত্র। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ মাঝখানে এইটুকু ফাঁক। সামনে কয়েকখানি লাল রংয়ের করোগেটের চালা, লোহার ফ্রেমে আঁটা। বছরে তু-একটি দিন এসে গরীব তীর্থযাত্রীরা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি বাঁচিয়ে এখানে আশ্রয় পায়, তারপর সমস্ত বছর শূন্য চালা হা হা করে। অত্যধিক তুষারপাতের সময় পাহাড়ী ভালুকরা এখানে এসে জায়গা নেয়, কিংবা উপত্যকার অন্যান্য জন্তু।'

সেদিন সন্ধ্যের পরে আকাশ ছিল মেঘমুক্ত, তাই দ্বাদশীর চাঁদ উঠেছিল আকাশে। চাঁদের আলোয় চন্দনবাড়িকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। প্রবোধদার প্রচণ্ড শীত লাগছিল। তবু প্রকৃতিপ্রেমিক পর্যটক প্রকৃতির রমণীয় রূপ দেখার জন্য সারারাত তাঁবুর পর্দা খুলে রেখেছিলেন।

কথায় কথায় কথাটা বলি সহযাত্রীদের। মামা মন্তব্য করে, "সৌন্দর্য মাথায় থাক্ ঘোষদা, আমরা পর্দা খুলে শুতে পারব না।"

কাজটা সত্যি সহজ নয়। একে তো একদিনে দেড় হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছি, তার ওপরে বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং বেশ বাতাস বইছে। অথচ এ অবস্থায়ও প্রবোধদা তাঁবুর পর্দা ফেলতে পারেন নি। সত্যি সুন্দরের পূজারী তিনি। কি জানি, যাঁরা রূপ-সাগরে ডুব দিতে পেরেছেন, তাঁরা হয়তো এমনি করেই অরূপ-রতন পেয়ে থাকেন।

আমরা সুন্দরের পূজারী নই, রূপ-সাগরে ডুব দেওয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে, তবু এই বৃষ্টিভেজা চন্দনবাড়ির কর্দমাক্ত পথে পদচারণা করতে খারাপ লাগছে না আমাদের।

হিমালয়ে অন্যান্য তীর্থপথের মতো এপথের বিশেষ করে চন্দনবাড়ির তেমন উন্নতি হয় নি। একদিকে ভালই হয়েছে, আজও চন্দনবাড়িতে চাঁদের আলো দেখতে পাওয়া যাবে। তবু আজ চন্দনবাড়ি গমগম করছে। পথের পাশে বেশ কয়েকটি দোকান বসেছে। যাত্রার যাবতীয় জিনিসপত্র এবং খাবারের দোকান। 'বাঙালী-খানা'ও পাওয়া যাচ্ছে এবং সেকথাটি দোকানীদের মুখপাত্রগণ চিৎকার করে ক্রমাগত ঘোষণা করে চলেছে। ভারতের যেকোন তীর্থ কিংবা দর্শনীয় স্থানে বাঙালী যাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক। সুতরাং ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের বাঙালীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়।

ফিরে এলাম কলোনীতে—তাঁবুর কলোনী। দুপাশে সারিসারি তাঁবু, মাঝখানে মাটির পথ— বর্ষণসিক্ত, কোথাও কোথাও কর্দমাক্ত। আমরা পঞ্চান্নজন আজ ফকিরবাবুর সঙ্গে যাত্রায় এসেছি, কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্-এর জন বিশেক কর্মচারী এসেছেন আমাদের সঙ্গে। ষোলটি তাঁবু নিয়ে আমাদের উপনিবেশ। একেবারে শেষের তাঁবুটি হচ্ছে 'কিচেন টেন্ট্'। তার সামনেই একটি জলের কল। ঝরণা থেকে পাইপ দিয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে। কর্দমাক্ত পথ, শীতের জায়গা তার ওপরে বেশ বাতাস বইছে। অথচ বেশ কয়েকজন মহিলা সহযাত্রী জল ঘাটাঘাটি করছেন। অবাক হবার কিছু নেই। আমার অধিকাংশ সহযাত্রীর আদিনিবাস জলের দেশ পূর্ববঙ্গ। ঢেঁকি শুনেছি স্বর্গে নিয়েও ধান ভানে।

তাহলেও মাসিমা ও পিসিমাদের সাবধান করি। বলি, "শীতের জায়গা, বরফগলা জল, ঠাণ্ডা লেগে যাবে—মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

"অসুখ হয়ে পড়লে হয়তো আর অমরনাথ দর্শন হবে না।" অসীম যোগ করে।

আর যায় কোথায়? মাসিমারা ক্ষেপে যান। একজন জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে তোমার খুব মজা হয়, তাই না?"

অসীম অপ্রস্তুত। সে নীরব থাকে।

কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন এঁরা। আরেকজন রাশভারী প্রৌঢ়া কর্কশ স্বরে অসীমকে প্রশ্ন করে, "কথাডা কইতে তোমার লজ্জা লাগল না? এত কষ্ট কইরা যাত্রায় আইলাম আর তুমি কইতে আছো বাবারে দর্শন করতে পারমু না!"

কথাটা অসীম মোটেই সেভাবে বলে নি। সে তাঁদের ভালর জন্যই বলেছে। তাঁদের অমরনাথ যাত্রা বিফল করার কোন মতলব নেই তার।

তবু সে বৃদ্ধার কথার কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে নতমস্তকে এগিয়ে চলে। অনেক সময় জয়ের চেয়ে পরাজয় বেশি বরণীয় হয়ে পড়ে। অসীম বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা যে পর্যায়ে এসেছে, তাতে এখন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরাও নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করি।

তাঁবুর কলোনী ছাড়িয়ে নেমে চলি লিডারের দিকে। ঝোপঝাড়ে বোঝাই একফালি ভূখণ্ড। এখানে-ওখানে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। তারই ভেতর দিয়ে পথ চলে আমরা নীলগঙ্গার তীরে এলাম। এপারে প্রায় সমতল উপত্যকা আর ওপারে খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। যেপথ দিয়ে যুগাতীত কাল ধরে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এসেছেন—গিয়েছেন অমরনাথ। আমিও তাঁদের মতো ঐ পথ দিয়ে এখানে এসেছি আবার তাঁদের মতই ঐপথে ফিরে যাবো ঘরে।

না, ঘরের কথা এখন নয়। গৌতম অসুস্থ, তবু আমি ঘরের কথা ভাবব না। আমি যে পথিক, ঘরের সব দায়িত্ব অমরনাথজীর ওপর সঁপে দিয়ে আমি অমরতীর্থে চলেছি। পথই পথিকের পরম আশ্রয়, যাত্রাই যাত্রীর শ্রেষ্ঠ সাধনা।

অতএব ওপারের কথা নয়, এপারের ভাবনা ভাবা যাক্। পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে অবিরত বয়ে চলেছে ফেনিল নীলগঙ্গা। আমরা কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার নাচ দেখি, গান শুনি। তারপরে একসময় সারি বেঁধে বসে পড়ি নির্জন সৈকতে।

আর তখুনি দেখতে পাই ওকে—জনৈকা একাকিনী আমেরিকান যুবতী। একটা 'সস্প্যান' নিয়ে সে বসে আছে জলের ধারে। সস্প্যানটি জলে বসিয়ে তার ওপরে একখানি পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে।

"কি করছে মেয়েটি?" জিজ্ঞেস করেন সরকারদা।

"বোধহয় বাসন ধুচ্ছে।" অশোক উত্তর দেয়।

"না না, বাসন ধুলে সস্‌প্যানের ওপর পাথর চাপিয়েছে কেন?" ভাগনে পালটা প্রশ্ন করে।

ব্রহ্মচারী বলে, "তাছাড়া উনি তো বসে আছেন চুপচাপ।"

"বোধহয় জপ করছে।" সঙ্গে সঙ্গে অসীম আবিষ্কার করে।

আমরা সবাই হেসে উঠি। ব্রহ্মচারী গম্ভীর।

হাসি থামার আগেই অসীম উঠে দাঁড়ায়। ভাগনেকে বলে, "চলো, আলাপ করে আসি মেয়েটির সঙ্গে।"

"চলুন।" ভাগনে অসীমকে অনুসরণ করে।

ওরা চলে যায়, আমরা বসে থাকি। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। অসীম আমেরিকা ফেরৎ। মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে আমেরিকান মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার কায়দা-কানুন জানা আছে তার। আমরা চুপচাপ বসে দেখতে থাকি।

মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দুজনে। অসীম কি যেন বলছে মেয়েটিকে। ভাগনেও হাত নেড়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সস্‌প্যানটা। মেয়েটি মুচকি হাসছে, কথা বলছে। কিছুই শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে। যাবে কেমন করে? নীল-গঙ্গার বিরামহীন কলনাদে যে সবার সবকথা যাচ্ছে হারিয়ে।

মেয়েটি বোধহয় বসতে বলছে ওদের। ওরা দুজনে মেয়েটির দুপাশে বসে পড়ল।

"বেশ যাহোক, আমাদের না নিয়েই চলে এলেন।"

চমকে পেছনে তাকাই। তুলতুল, গৌরী ও বৌমা, মানে অজিতের স্ত্রী। খুঁজে খুঁজে চলে এসেছে এখানে। কথাটা জিজ্ঞেস করেছে তুলতুল। প্রাণ বাঁচাতে অজিত তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "না, মানে এখানে আসব বলে তো আসি নি…"

"এই এসে পড়েছো আর কি।" বৌমা অজিতের মুখের কথা কেড়ে নেয়।

অজিত শব্দহীন।

তুলতুল ও গৌরী মুচকি হাসছে।

সরকারদা বলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো।"

"বসব বলেই তো এলাম।" গৌরী বলে। ওরা তিনজনে বসে পড়ে।

বেচারী অজিত। সে এখনও উদাস নয়নে নীলগঙ্গার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বোধকরি অজিতের মান রাখতেই বাসুদেব বলে, "আমরা ইচ্ছে করেই আপনাদের নিয়ে আসি নি।"

"কারণ ?" বৌমা গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

"সন্ধ্যের সময় মেয়েদের আসতে নেই এখানে।"

"চন্দনবাড়ির বাঘ বুঝি জল খেতে এসে রুদ্রপ্রয়াগের সেই লেপার্ডটার মতো শুধু মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় ?" গৌরী বাসুদেবকে প্রশ্ন করে।

"না, মানে···" বাসুদেব বিচলিত।

তুলতুল যোগ করে, "তাছাড়া চন্দনবাড়ির বাঘ বুঝি মেমসাহেবদের গায়ে হাত দেয় না ?"

বাসুদেব নির্বাক। কি বলবে, সে বোধহয় বুঝতে পারছে না।

তবে তার কপাল ভাল। অসীমরা উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা এদিকে আসছে।

ওরা ফিরে আসে। অসীম বলে, "মেয়েটি রান্না করছে।"

"রান্না!" আমরা বিস্মিত। "এই তুষারশীতল জলে রান্না করছে কি ? রান্না তো হয় উষ্ণকুণ্ডে, মণিকরণ ও যমুনোত্রী প্রভৃতি তীর্থে।"

"গরম নয়, ঠাণ্ডা রান্না।" ভাগনে কথা বলে এবারে।

"কি রকম ?"

অসীম উত্তর দেয়, "মেয়েটি ঐ সস্‌প্যানে পুডিং তৈরি করে নিয়ে এসেছে। সস্‌প্যানটি হিমশীতল জলে রেখে দিয়েছে, যাতে তাড়াতাড়ি জমে যায়।"

"তার মানে উনি লিডারকে 'ফ্রিজ্' বানিয়েছেন ?" তুলতুল জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে তুমিও বানাতে পারো।" অসীম সহাস্যে বলে।

"কেমন করে ?" তুলতুল বুঝতে পারে না।

"কিছুক্ষণ এই জলে দাঁড়িয়ে থাকো, দেখবে তুমিও জমে গিয়েছো।"

আবার হাস্যরোল।

গোধূলি ঘনিয়ে আসছে। আঁধারের পরশ লেগেছে চন্দনবাড়ির মেঘমুক্ত নীল আকাশে যেখানে কিছুক্ষণ পরেই চাঁদের জয়যাত্রা হবে শুরু, সারারাত ধরে চাঁদের আলোয় হাসতে থাকবে নীলগঙ্গা।

গতকালও এমনি সময় আমরা পহেলগাঁয়ে নীলগঙ্গার বেলাভূমিতে বসেছিলাম, বসে বসে ভাবছিলাম আজকের কথা। আগামীকালও এসময় বসে থাকব নীলগঙ্গার উৎসে—শেষনাগে। আর পরশু ?

পরশু এসময় আমরা থাকব পঞ্চতরণীতে। তার পরদিন ?

তার পরদিনই পৌঁছব অমরতীর্থে, দর্শন করব পরমারাধ্য অমরনাথকে। তাঁর কাছে সবার সঙ্গে গৌতমের কুশল কামনা করব। শুরু হবে ফেরার পালা।

একই ভাবে এই নীলগঙ্গার পাশে পাশে পথ চলে ফিরে আসব এখানে, এখান থেকে পহেলগাঁও। পূর্ণ হবে অমরতীর্থ অমরনাথের পদপরিক্রমা।

কিন্তু তখনও অমৃতময়ী নীলগঙ্গা রইবে আমার সঙ্গে। পহেলগাঁয়ে সেদিন সন্ধ্যায় আমি আবার এমনি তার পাশে গিয়ে বসব। তাকে বলব—এবারের মতো তুমি বিদায় দাও আমাকে। আমি আবার আসব ফিরে, ফিরে আসব তোমার কাছে।

॥ নয় ॥

শেষরাতেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। শেষনাগ রওনা হবার আয়োজন। তাই হয়। হিমালয়ের পথে সকালে শুরু করতে হয় পদযাত্রা। উচ্চ-হিমালয়ে সাধারণতঃ দুপুরের পরেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়, ছুটে আসে মেঘ আর বাতাস, আরম্ভ হয় ঝড়-বৃষ্টি। গতকাল রওনা হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, বিকেলে বৃষ্টির কবলে পড়েছিলাম।

অতএব অন্ধকার থাকতেই আজ আমাদের শিবিরে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। কাজ তো কম নয়—প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন, জিনিসপত্র গোছানো, খাওয়া ও পোষাক পরা। এই শেষের কাজটা করতেই তো আধঘণ্টা লেগে যাবে। গেঞ্জি, ভেস্ট, সার্ট, দুটো সোয়েটার, মাফ্‌লার, বালাক্লাভা, ড্রয়ার, প্যাণ্ট্‌, দু-জোড়া মোজা ও হাণ্টার-শু। এখানে আধ-ঘণ্টায় হয়ে যাবে। ওপরে আরও বেশি লাগবে। কারণ শীত বাড়বে, অক্সিজেন কমবে—অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠব।

ব্রেক্‌-ফাস্ট করে বিদায় নিলাম সবার কাছ থেকে। ফকিরবাবু বলেন, "আপনারা এগোন, আমি ঘোড়ায় আসছি। পথে দেখা হবে।"

"আজ আমাদের প্ল্যান হল পথে অন্তত দশজন অশ্বারোহীকে পদাতিকে পরিণত করব।" গম্ভীর স্বরে তুলতুল বলে।

সবাই হেসে উঠি ওর কথা শুনে। হাসতে হাসতেই ফকিরবাবু বলেন, "দশজনের একজন তো পেয়ে গেলে ?"

"একজন নয়, দুজন।" মাঝখান থেকে মিসেস মণ্ডল বলে ওঠেন। তিনি তুলতুলকে বলেন, "আমিও তোমাদের পথে ধরে নেবো। তারপরে হেঁটে যাবো তোমাদের সঙ্গে। তার মানে তুমি দুজন পেয়ে গেলে।"

"না," তুলতুল জবাব দেয়। "আপনারা হেঁটে যাবেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু আপনারা এর আগে অনেকবার অমরনাথ গিয়েছেন। যাঁরা কোনদিন যান নি, এমন দশজন যাত্রীকে ঘোড়া থেকে নামাবো আজ।"

"বাবা অমরনাথ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" সহাস্যে মিসেস মণ্ডল হাত জোড় করেন।

আমরা ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি।

সহযাত্রীরা কেউ কেউ রওনা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই এখনও তৈরি হয়ে উঠতে পারেন নি। যাঁরা ঘোড়ায় যাবেন, তাঁদের এত সকালে রওনা হবার দরকারও নেই। এখনও যে আটটা বাজে নি, মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। আমরা পদাতিক বলেই বেরিয়ে পড়েছি পথে।

কাল বিকেলের সেই বৃদ্ধাকে আজ ঘোড়া ঠিক দিয়েছেন ফকিরবাবু। সবার মতো আমাদেরও ধারণা ছিল, পহেলগাঁও থেকে ঘোড়া না নিলে পথে আর ঘোড়া পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখানে দেখছি অনেক ঘোড়া রয়েছে, ভাড়াও কিছু কম। একজন দোকানী বলেছেন—শেষনাগে তো বটেই, প্রয়োজনে পঞ্চতরণীতেও ঘোড়া পাওয়া যাবে।

তাঁবুর উপনিবেশ পেরিয়ে এলাম। লিডারের তীরে তীরে চড়াই পথ। বনময় পথ। ওপারে লিডারের কোল ঘেষে খাড়া সবুজ পাহাড়, এপারে পাহাড়টি আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে পথে এসে মিশেছে। শান্ত-সুন্দর অপরূপ পথ। নদীর কলগান শুনতে শুনতে পাহাড়ের গা দিয়ে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী পায়ে-চলা পথের তুলনায় পথ বেশ চওড়া। অন্তত জনচারেক মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি পথ-চলার উপায় নেই। চলতে চাইলেই কানে আসছে 'হোঁশ'। অর্থাৎ পেছনে কোন-না-কোন অশ্বারোহী এসে গিয়েছেন। তাঁর ঘোড়াওয়ালা আমাকে সাবধান করছে, পথ ছেড়ে দিতে বলছে।

আমাদের সামনে ও পেছনে সারি সারি ঘোড়া, হেলে-দুলে পথ চলেছে। ঘোড়সওয়ারদের অবস্থা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। একে তো চড়াই পথ বলে সর্বদা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে, নইলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পেছনে গড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তারপরে আবার ঘোড়াগুলো কেবলই খাদের পাশ দিয়ে পথ চলতে চায়। নিচের দিকে তাকালেই যে মাথা ঘুরে যায়।

এঁরা কেউ অভিজ্ঞ অশ্বারোহী নন। অনেকেই জীবনে এই প্রথম ঘোড়ায় উঠেছেন। ফলে তাঁরা ভয়ে কাঠ হয়ে আছেন, ভরসা করে কোনদিকে তাকাতে পারছেন না চোখ মেলে। মনে ভয় থাকলে কি সুন্দরকে দেখতে পাওয়া যায়?

আমাদের কিন্তু এসব ঝামেলা নেই। চারিদিক দেখতে দেখতে পথ চলেছি। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে সবুজের সমারোহ—দেবদারু চীর শিশম রুদ্রাক্ষ ভূর্জ ও আখরোটের বন আর নিচে নীলগঙ্গা। সাদা শিলাভূমির ওপরে আঁকাবাঁকা নীলধারা—শ্বেতপাথরের বুকে রঙীন আলপনা।

এরই কোনখানে সেই রমণীয় তীর্থস্থানেশ্বর—যেখানে হরপার্বতী মধুযামিনী

যাপন করেছিলেন, পার্বতী তাঁর চুম্বনসিক্ত নীল-কাজল ধুয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমাদের অবসর যাপনের অবকাশ নেই। অতএব এগিয়ে চলি।

"আমরাও আপনাদের সঙ্গে হেঁটে যাবো।"

তাড়াতাড়ি পেছনে তাকাই। সহযাত্রী জ্যোতির্ময় লাহা। তার সঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জীর ছেলে এবং আরেকটি যুবক। তারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। সুপুরুষ যুবা জ্যোতির্ময়। লাগাম ঘোড়াওয়ালাদের হাতে দিয়ে এগিয়ে আসে আমাদের কাছে।

হিমালয়ের বহু জায়গায় সহিসরা নিজেদের 'ড্রাইভার' বলে পরিচয় দেয়। আর তাই বোধহয় ড্রাইভাররা নিজেদের 'পায়লট' বলতে শুরু করেছেন।

জ্যোতির্ময় আবার বলে, "আমরাও হেঁটে যাবো।"

"বেশ তো, চলো আমাদের সঙ্গে।" পাকা পর্বতারোহীর মতো সরকারদা বলেন।

জ্যোতির্ময় আরও লজ্জা পায়। তার বয়স তিনের ঘরে আর সরকারদার ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। সে সবিনয়ে স্বীকার করে, "আপনাকে আর তুলতুলকে দেখেই নেমে পড়লাম। আপনারা হেঁটে যাচ্ছেন, আর আমরা কিনা ঘোড়ায় উঠে বসেছি।"

"সরকারদার কথা বলুন, কিন্তু kindly example হিসেবে আমার নামটি put up করবেন না লাহাদা!" তুলতুল প্রতিবাদ করে, "যতই Scouting করে থাকুন, হিমালয়ের পথে আমার সঙ্গে হেঁটে পারতে হবে না।"

জ্যোতির্ময় এককালে খুবই 'স্কাউটিং' করেছে। তাছাড়া সে সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান যুবা। সুতরাং তুলতুলের কথা শুনে সে মৃদু হাসে। তারপরে কৃত্রিম বিনয়ের সঙ্গে বলে, "তা তো বটেই। দু-দিন ধরে তুমি শঙ্কুদার ট্রেনিঙয়ে রয়েছো, তুমি তো এখন একজন Full-fledged Lady-mountaineer, তোমার সঙ্গে আমি হেঁটে পারব কেমন করে। তবে একটা কথা ভুলে যেয়ো না, শঙ্কুদারও ভাল নাম জ্যোতির্ময়।"

সমবেত হাস্যরোল।

হাসি থামার পরেই দেখতে পাই ওঁকে। একজন প্রৌঢ় পথচারী। তাঁর একখানি পা নেই। পিঠে একটা পুটুলি নিয়ে ক্রাচ্-এ ভর দিয়ে একপায়ে পথ চলেছেন। আমাদের হাসি শুনে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

হাসি থামলেই একহাত কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলেন, "জয় বাবা অমরনাথ!"

"জয় অমরনাথ !" আমরা সাড়া দিই।

ভদ্রলোক আবার চলা শুরু করলেন। আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন।

আমরাও পথ-চলা আরম্ভ করি।

জ্যোতির্ময় বলে, "সত্যি আমরা কত অক্ষম! একখানি পা নিয়ে এই বয়সে ভদ্রলোক যাত্রায় চলেছেন, আর আমরা ঘোড়ায় চড়ে বসেছি ?"

কথাটা ঠিকই বলেছে জ্যোতির্ময়। এঁদের একাগ্রতা, এঁদের নিষ্ঠা, এঁদের ভক্তি সত্যই অতুলনীয়। কিন্তু এ উপলব্ধি কেবল হিমালয়ের পথেই সম্ভব। সমতলের কোন মন্দির মসজিদ কিংবা গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে কোন খঞ্জ ভক্তকে দেখলে এ উপলব্ধি হত না আমাদের।

সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম জ্যোতির্ময়কে। কিন্তু পারি না। তার আগেই তুলতুল বলে ওঠে, "দেখুন দেখুন, একজন অন্ধ আসছেন। উনি বোধহয় অমরনাথজীকে দর্শন করে এলেন।"

তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। হ্যাঁ, আমাদের অষ্টাদশী সহযাত্রী ঠিকই দেখেছে। জনৈক অন্ধ-বৃদ্ধ একজন বৃদ্ধার হাত ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসছেন।

আস্তে আস্তে সামনে এলেন তাঁরা। শ্রান্ত অন্ধ আমাদের উপস্থিতি টের পান। একখানি হাত উঁচু করে বলে ওঠেন, "জয় বাবা অমরনাথ !"

"জয় !" আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিই।

তারপরেই ভাবি—কার জয়ধ্বনি করলাম? ভগবানের না ভক্তের? যে ভক্ত দৃষ্টিহীন হয়েও দুর্গম পথ পেরিয়ে ভগবানের কাছে গিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ইষ্টদেবতার দর্শন পেয়েছেন। দিব্যচোখে দেখেছেন তাঁর মনের মানুষকে, প্রাণের ঠাকুরকে—পরমারাধ্যকে।

আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌচেছি। পথটা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিশেছে। তারপরে পাহাড়টার গা বেয়ে এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গিয়েছে। ওপরের পথটা অনেকটা ইংরেজী 'Z' অক্ষরের মতো। তাহলে এই কি সেই পিস্থর চড়াই ?

"জী।" গৌরীর ঘোড়াওয়ালা উত্তর দেয়।

আবার পথের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, পথটা চড়াই তো বটেই। কিন্তু চড়াইটাকে তেমন ভয়ঙ্কর কিংবা কষ্টকর মনে হচ্ছে না তো! হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেক তীর্থে এমন পথ আছে। জানকীবাঈ থেকে যমুনোত্রী, অথবা ধনছো থেকে মণিমহেশের পথ এর চেয়ে কম কষ্টকর কিংবা বিপজ্জনক নয়। বরং এ পথটি প্রশস্ততর।

" এখান থেকে দেখাচ্ছেও ভারী সুন্দর। পাহাড়ের গা দিয়ে পথটি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে। প্রতি ধাপে সারি সারি মানুষ। নানা রঙের পোষাক তাঁদের গায়ে। তাঁরা রঙে রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে সারা পথ। রূপের জোয়ার জেগেছে পথের প্রাণে। পথটি রূপান্তরিত হয়েছে একখানি রঙীন মালায়।

আর পাহাড়? সে তো ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি। ভক্তের মালা গলায় পড়ে ভগবান রয়েছেন দাঁড়িয়ে। আমাদেরও কাছে ডাকছেন।

অবশেষে আমরাও সেই মালার সঙ্গে মিশে যাই। বহুজনের কাছ থেকে বহুভাবে শোনা পিসুর চড়াই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে থাকি ওপরে। মনে পড়ছে স্বামীজীর অমরনাথ দর্শনের কাহিনী।

নিবেদিতা ও তাঁর সঙ্গীরা স্বামীজীর সঙ্গে এখানে পৌঁছবার ঠিক আগে খানিকটা তুষারাবৃত পথ পেয়েছিলেন। তার আগে নিবেদিতা আর কখনও তেমন কষ্টকর পথ অতিক্রম করেন নি। তাই স্বামীজী তাঁকে বলে বসলেন—তোমাকে খালি পায়ে এই পথটুকু পেরোতে হবে।

বলা বাহুল্য শিষ্যা গুরুর আদেশ পালন করেছিলেন।

কি কঠিন পরীক্ষা? কি বিস্ময়কর গুরুভক্তি।

নিবেদিতা পিসুর চড়াই সম্পর্কে লিখেছেন—'A tremendous climb of some thousands of fect…'

আমরা কিন্তু তার কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রায় অক্লেশে ওপরে উঠছি। অবশ্য আমাদের অদৃষ্ট ভাল। গতকাল বিকেলের পরে আর বৃষ্টি হয নি। বৃষ্টি হলে এমন অনায়াসে পথ-চলা হয়ে উঠত না।

কিন্তু আমাদের কথ থাক। অভেদানন্দজীর কথা ভাবা যাক্। তাঁকেও এ চড়াই পেরোতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'পিশু নামক একটি ১৫০০ ফিট উচ্চ পর্বত চড়াই কবিতে সকলকেই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। "পিশু" শব্দে একপ্রকার উকুন বুঝায়, তাহা হইতে, অথবা "পিসর" শব্দ হইতে এই পর্বতের এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। "পিসর" কাশ্মীরী শব্দ, ইহাব অর্থ পিচ্ছিল।…ঘোড়া বা ঝাম্পান চড়িয়া কেহ এই পর্বতে আরোহণ করিতে সক্ষম নহে, কারণ পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও ঊর্ধমুখী।…সকলকেই পদব্রজে যাইতে হইল।'

প্রবোধদাও পিসুর দুর্নাম করেছেন। কি করবেন, তখন যে পিসু সত্যই ভয়ঙ্কর ছিল। প্রবোধদা লিখেছেন, 'আমার জীবনে এমন সঙ্কটসঙ্কুল চড়াই খুব কমই অতিক্রম করেছি। পথ অতিশয় পিছল, দুঃসাধ্য ও দুরতিক্রম্য। অবকাশ

নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপত্র ফেলে দিচ্ছে ঘোড়ারা। মহিলারা পড়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে।'

আজ কিন্তু অশ্বারোহীরা প্রায় সকলেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। তবে তাঁরা অনেকেই ভয়ে চারিদিকে তাকাতে পারছেন না। দেখতে পাচ্ছেন না কিছুই।

আমরা দেখছি। পথের ধারে রঙীন বনফুলের মেলা। অজস্র ফুল ফুটে আছে পাহাড়ের গায়ে, খাদের ধারে আর পথের পাশে পাশে।

প্রবোধদাও ফুলের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নাকি পিস্থর কাছে পরাজিত হয়েছেন। প্রবোধদার ১৩/১৪ বছর আগে তার মানে ১৯৪০/৩৯ সালে শেখ মহম্মদ আবদুল্লা পণ্ডিতজী ও সীমান্ত গান্ধীকে শেষনাগের স্বর্গীয় সৌন্দর্য দর্শন করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পণ্ডিতজী পিস্থ পার হতে পারেন নি।

আগেই বলেছি, ইতিমধ্যে নীলগঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। দুর্গম চড়াই সুগম হয়েছে। পণ্ডিতজী পারেন নি কিন্তু আমরা আজ শেষনাগের স্বর্গীয় সৌন্দর্য দর্শন করতে পারব।

তুলতুল কিন্তু ভুলে যায় নি। তাই চলতে চলতে হঠাৎ বলে ওঠে, "গৌরীদি! টের পাচ্ছেন তো?"

"কি?" গৌরীর মনে নেই কথাটা। সে থমকে দাঁড়ায়।

তুলতুল মনে করিয়ে দেয়, "কেন কাল যে অসীমদা বললেন না, আমরা আজ টের পাবো কেমন পথ?"

কথাটা মনে পড়ে গৌরীর। কিন্তু সে কোন মন্তব্য করে না। মৃদু হেসে আবার পথ চলা শুরু করে।

এতক্ষণে কথা বলে অসীম, "এখনও তার সময় হয় নি, আরও কিছুক্ষণ বাদে টের পাবে। তাই বলছিলাম, ঘোড়াওয়ালাদের একটু সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বলো।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অসীমদা, ঘোড়ায় আমরা আর উঠছি নে। তার চেয়ে বরং একটা কাজ করা যাক।"

"কি?"

"আসুন 'ওয়াকিং রেস্' দেওয়া যাক।"

তুলতুলের প্রস্তাব শুনে সবাই হেসে উঠি।

হাসি থামলে আমি বলি, "তার আর দরকার নেই তুলতুল।"

"কেন?"

"এমনিতেই অসীম তোমার কাছে হেরে গিয়েছে। কারণ কি জানো?"

"কি?"

"তুমি যে একজন 'বর্ন মাউন্টেনীয়ার', এ কথাটি জানা ছিল না ওর।"

আবার হাস্যরোল।

হাসি থামলে তুলতুল বলে, "না, কষ্ট যে হচ্ছে না, তা বলছি না। তবে পিন্ন পার হতে যে কষ্টের কথা এতকাল শুনে এসেছি, তার তুলনায় এ কষ্ট কিছু নয়।"

"হ্যাঁ, তোমাদের কষ্ট লাঘবের জন্য কঠিন চড়াইকে যতটা সম্ভব সহজ করে তোলা হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা গতকাল বিকেলের পরে আর বৃষ্টি হয় নি।"

"হবে।" হঠাৎ অসীম বলে ওঠে।

"হবে না।" তুলতুল প্রতিবাদ করে। একটু থেমে আমাকে সাক্ষী মানে, "বলুন তো, বৃষ্টি হবে কিনা?"

আকাশের দিকে তাকাই। না, কোথাও বাদল-মেঘের চিহ্ন নেই। হিমালয়ের আকাশকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। যে-কোন মুহূর্তে জলভরা মেঘ ছুটে আসতে পারে। তবু তুলতুলকেই সমর্থন করতে হয়। অসীম যে ভয় দেখাচ্ছে ওকে। বলি, "বামুনের মেয়ের কথা কি মিথ্যে হতে পারে? বৃষ্টি হবে না।"

তুলতুল তালি বাজায়।

গম্ভীর স্বরে অসীম বলে, "ঘোষদা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, আমিও বামুনের ছেলে?"

সহাস্যে বলি, "না। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়েছে তুমি বামুনের বাবা, সুতরাং মেয়ের কথাই সত্য হবে।"

হাসি-ঠাট্টায় পথশ্রম আরও কমে যাচ্ছে। আমরা অক্লেশে চড়াই ভাঙছি —কুখ্যাত পিন্নর চড়াই। সেই সঙ্গে করুণাময়ী প্রকৃতির কাছে মনে মনে বার বার আবেদন রাখছি, তুমি অকরুণ হয়ো না। কারণ পথ যতই ভাল করা হয়ে থাক, জল পড়লেই দুর্গম হয়ে উঠবে। এ অঞ্চলের পাহাড়ে যে পাথরের চেয়ে মাটির ভাগ বেশি।

বলা বাহুল্য চলার বেগ ক্রমেই কমছে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। সবাই সমান হাঁটতেও পারছে না। চলা থামালেই চন্দনবাড়ির দিকে তাকাচ্ছি।

সেখানকার ঘন-সবুজ পাহাড়, ফিকে-সবুজ সমতল আর সাদা লিডারকে স্বপ্নের দেশ বলে মনে হচ্ছে এখান থেকে। তাহলেও দুঃখবোধ করছি না। আমরা যে স্বপ্নের দেশ থেকে স্বপ্নতর দেশে চলেছি।

'Believe or not, you are more than
2 miles above the N. S. L.'

সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়তেই উল্লসিত হয়ে উঠি। যথাসাধ্য জোরে জোরে পা ফেলে উঠে আসি ওপরে—চড়াই থেকে সমতলে, পাতাল থেকে স্বর্গে।

হাতের লাঠি আর পিঠের বোঝা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়ি মাটিতে। না, মাটি নয় গালিচা। মখমলের মতো নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রায় সমতল প্রান্তর। চড়াই পথটা এসে শেষ হল এখানে। আরও দুটি সাইনবোর্ড রয়েছে আমাদের সামনে। একটিতে লেখা—

'Pissu Top, Ht. 11,200 ft.'

১০,৫৬০ ফুটে ২ মাইল। অতএব আমরা সমুদ্র-সমতা থেকে দু-মাইলেরও বেশি ওপরে উঠে এসেছি, কলকাতা থেকেও তাই। ভাবলেও অবাক হতে হয়।

আরেকটি সাইনবোর্ডে এখান থেকে দূরত্ব লেখা রয়েছে—

'Srinagar	—	71	miles
Pahalgam	—	12	,,
Seshnag	—	6	,,
Holy Cave	—	18	,,

এখন বেলা দশটা। তার মানে চন্দনবাড়ি থেকে দু-ঘণ্টায় মাত্র দু-মাইল পথ এসেছে। আজ আরও ছ' মাইল হাঁটতে হবে। কিন্তু পথের যত উন্নতিই হয়ে থাক, গত দু-ঘণ্টায় আমরা পথের সবচেয়ে দুর্গম অংশটুকু পেরিয়ে এসেছি। দু-মাইলে দু-হাজার দু-শ' ফুট চড়াই ভেঙেছি। এবং শেষদিকে সবারই কিছু কষ্ট হয়েছে।

সব যাত্রীরাই তাই বসে পড়েন এখানে। তারপরে গরম চায়ের গ্লাশে ঠোঁট ঠেকিয়ে অসীমা প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্যসুধা পান করেন। আমরাও তাই করছি। এখানে তিনটি যাত্রীনিবাস আছে। আর আছে গুটিকয়েক চায়ের দোকান। তারই একটি থেকে মামা-ভাগনে চা নিয়ে এসেছে। চায়ের গ্লাশে ঠোঁট ঠেকিয়ে আমরাও চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখছি।

সবুজ সমতলপ্রায়-প্রান্তরটি সামনের দিকে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। তীর্থপথটি তারই বুকের ওপর পড়ে আছে। এই পথ ধরে সারা প্রান্তরটি পেরোতে হবে

আমাদের। তারপরে অর্থাৎ এক মাইল প্রায়-সমতল পথ চলতে পারব। এ উচ্চতায় এমন বড় একটা হয় না। পৌছব যোজিপাল। দূরত্ব এখান থেকে ৩ মাইল। উচ্চতা একই—১১,৫০০ ফুট।

কিন্তু পথের কথা পরে হবে, আগে প্রান্তরটিকে দেখে নিই। প্রান্তরটি দু-পাশের পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। ডানদিকের পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে চলেছে নীলগঙ্গা। তারই তীরে তীরে পথ। আমরা যে তারই উৎসে চলেছি।

দু-পাশের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়, হয়তো হাজারখানেক ফুট উঁচু হবে এখান থেকে। গাছপালাহীন ন্যাড়া পাহাড়। প্রান্তরেও কোন বড় গাছ দেখছি না। আমরা যে ইতিমধ্যে গাছের সীমারেখার ওপরে উঠে এসেছি।

বড়গাছ দেখতে পাচ্ছি নিচে—পিস্থুর পাশে পাশে। কিন্তু আমরা যে পিস্থু পেরিয়ে এসেছি। পিস্থু পড়ে রয়েছে পেছনে। আমরা পথিক—হিমালয়ের পথিক। পথিককে পেছনে তাকাতে নেই।

প্রান্তরে বড় গাছ নেই কিন্তু ছোট ফুল আছে, এখানে-ওখানে ফুটে আছে নানা রকমের ফুল। বিচিত্র তাদের গড়ন, বিস্ময়কর তাদের রং। তারা বাতাসে দুলছে। দু-চোখ ভরে দেখছি। এমন পুষ্পিত সবুজ ও সুদীর্ঘ সমতল হিমালয়ের অন্তরলোকে বড় বেশি একটা দেখা যায় না। আমরা দেখি, শুধু দেখি।

দেখার শেষ নেই, কিন্তু বিশ্রামের শেষ আছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে হল। যাঁরা ঘোড়া কিংবা ডাণ্ডিতে চলেছেন, তাঁরাও বিশ্রাম করেছেন এখানে। তুলতুলের মা-বাবা, ডাক্তারের মা ও পরিতোষবাবুর স্ত্রী অপেক্ষা করেছিলেন আমাদের জন্য। দেখা হয়েছে অজিতদের সঙ্গে, অপর্ণা ও বাসুদেবের সঙ্গে। দেখা হয়েছে ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে এবং আরও অনেক সহযাত্রীর সঙ্গে। তাঁরা সবাই রওনা হয়ে গিয়েছেন। এখনও ছ' মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দিতে হবে। যোজিপাল ছাড়িয়ে পৌছতে হবে পাতালগ্রাম। তারপরে ব্রজলকোট, জাজিপারাও এবং কুট্টিঘাটি পেরিয়ে শেষনাগ। বেলা সাড়ে দশটা বাজে। অতএব আর বিশ্রাম নয়।

আবার শুরু হল পথচলা। এবারে আর সারি বেঁধে সামনে-পেছনে চলার দরকার নেই। বেশ প্রশস্ত প্রায়-সমতল পথ। আমরা ছোট-ছোট দলে পাশাপাশি পথ চলেছি। প্রথম দলে মামা-ভাগনে পরিতোষবাবু ও জ্যোতির্ময়রা। শেষ দলে সরকারদা অসীম ও আমি। মাঝের দলে ব্রহ্মচারী অসিত অশোক গৌরী ও তুলতুল। ব্রহ্মচারী ও গৌরী কবিতা আবৃত্তি করছে আর অসিত ও অশোক তুলতুলের ইংরেজী গান শুনছে।

ব্রহ্মচারীও কিন্তু ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করছে—ঠিক কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজী অনুবাদ। তার স্বরচিত অনুবাদ।

এই অনুবাদের একটু ইতিহাস আছে। পি. এইচ ডি পাবার পরে ব্রহ্মচারী এখন ডি. লিট্‌য়ের জন্য গবেষণা করছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু 'নাদব্রহ্ম।' অর্থাৎ সে গানের চর্চা করছে। আর এদেশে গানের চর্চা করতে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত অপরিহার্য। সে বেশ-কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত ইংরেজীতে অনুবাদ করে ফেলেছে। এবং খাতাখানি নিয়ে এসেছে। জপের মালার সঙ্গে খাতাটি তার সব সময়ের সঙ্গী ঝোলাতেই রয়েছে। ব্রহ্মচারীর একান্ত ইচ্ছা তুষারলিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে সে স্বরচিত কয়েকটি অনুবাদ অমরনাথজীকে শুনিয়ে আসবে। কারণ অমরনাথজী সর্বজ্ঞ, তিনি ইংরেজী জানেন।

ব্রহ্মচারীর যুক্তি অকাট্য। অমরনাথজী ইংরেজদের দেবতা না হলেও তিনি নিশ্চয়ই ইংরেজী জানেন। কিন্তু তিনি তো বাংলাও জানেন। বাংলা জানা কোন দেবতার সামনে রবীন্দ্রনাথের মূল-গান না গেয়ে, সেই গানের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করার কি মানে থাকতে পারে, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি না।

আমি না পারলেও ব্রহ্মচারী ইংরেজীতেই অমরনাথজীর গুণগান করবে। আর গৌরীর কাছে সে বোধহয় এখন তারই 'রিহার্সেল' দিয়ে নিচ্ছে। ভালই করছে—গৌরী শুধু ভক্তিমতী নয়, সে এম. এ পাশ। তার পক্ষে ব্রহ্মচারীর বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

সোয়া এগারো হাজার ফুট উঁচুতে পদচারণা করছি। কিন্তু পায়ের নিচে নরম মাটি। শুধু এখানে নয়, এটি কাশ্মীর হিমালয়ের বৈশিষ্ট। কাশ্মীরে হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পাথর কম, মাটি বেশি। আর তাই কাশ্মীর এত সবুজ, এত সুন্দর।

শীতকালে এই সুবিশাল সবুজ প্রান্তর সাদা হয়ে যায়। পাশের পাহাড় থেকে তুষারপ্রবাহ নেমে আসে। তুষারপাতও হয় প্রচুর। তৃণাচ্ছাদিত অধিত্যকা তুষারাবৃত প্রান্তরে পরিণত হয়।

গ্রীষ্মকালে বরফ গলে। মাটি সজল হয়। মরে যাওয়া ঘাস ও ফুল আবার জন্ম নেয়। সাদা প্রান্তর পরিণত হয় সবুজ সমতলে। ফুল ফোটে। পুণ্যার্থীরা পাগল হয়। আমরাও তাই হয়েছি। ব্রহ্মচারীর ইংরেজী কবিতা আর তুলতুলের ইংরেজী গান সেই পাগলামীরই প্রকাশ। আমরা তেমন কথা বলছি না বটে কিন্তু কেবল দেখছি আর দেখছি, দেখছি সবুজ অধিত্যকা, আকাশের নীলিমা আর পাশের পাহাড়। বিচিত্রবর্ণের পাহাড়। কোনটি

কালো কোনটি ধূসর কোনটি বা লালচে। কোন কোন পাহাড়ের গা থেকে তুষারের শেষচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয় নি এখনও। এখানে-ওখানে তুষার লেগে রয়েছে। কালোর মাঝে আলো হয়ে আছে।

নীলগঙ্গার তীরে তীরে পথ। পথের প্রকৃতি পালটেছে কিন্তু নীলগঙ্গা অপরিবর্তিত। সে আগের মতই উচ্ছ্বসিতা প্রাণধারা। স্বর্গবারি বহন করে মর্ত্যে নিয়ে চলেছে।

আরেকটি প্রান্তরে পৌঁছে গিয়েছি। এ জায়গাটার নামই যোজিপাল বা ঘাগিপাল। এখানেও 'পিস্থ টপ্'-এর মতো তিনটি যাত্রীনিবাস রয়েছে। যাত্রী-নিবাস বলতে পাথর ও টিন দিয়ে তৈরি একখানি মাঝারী আকারের ঘর। আট-দশটি কম্বল পাশাপাশি পাতা যেতে পারে। একটি মাত্র দরজা, কাজেই ভেতরটা দিনেও অন্ধকার।

পিস্থ টপ্ কিংবা এখানে সাধারণতঃ যাত্রীরা রাত্রিবাস করেন না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে কেউ যদি বায়ুযান কিংবা চন্দনবাড়ি না পৌঁছতে পারেন, তখন তাঁরা যাতে বিপদে না পড়েন, তাই কর্তৃপক্ষ এই যাত্রীনিবাসগুলো নির্মাণ করেছেন। ভালই করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা যদি এগুলো একটু পরিষ্কার করিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে বড়ই ভাল হয়। কারণ আমি একাধিক যাত্রীনিবাসে উঁকি মেরে দেখেছি, যাত্রীদেব কৃপায় সেগুলো প্রায় ভাগাড়ে পরিণত।

আমরা চন্দনবাড়ি থেকে ৫ মাইল এসেছি। এখান থেকে একটি পায়ে-চলা পথ সোনাসর হ্রদের দিকে গিয়েছে। দূরত্ব এখান থেকে মাইল তিনেক। মাত্র আটশ' ফুট উঁচু একটি চড়াই পেরোলেই নাকি হ্রদটি দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সে অবকাশ নেই। অতএব এগিয়ে চলি।

এখন সোনাসর যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু বাবা অমরনাথ কৃপা করলে আগামী বছর যেতে পারব সেখানে। কলকাতার 'রক্স এ্যাণ্ড্ স্নোজ' ক্লাব আগামী বছর জুন মাসে ১৪,৫০৬ ফুট উঁচু সোনাসর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করবার জন্য এক পদযাত্রার আয়োজন করছেন। গিরিবর্ত্মটি হ্রদ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। শম্ভুনাথ দাস সেই দুর্গম পদযাত্রার নেতৃত্ব করবে। শম্ভু আমাকেও নেমন্তন্ন করে রেখেছে। এখন দেখা যাক, বাবা অমরনাথের কি ইচ্ছা?*

*গত ২২শে জুন (১৯৭৮) শম্ভু সোনাসর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছে। তার সঙ্গে ছিল বিভাস দাস, গৌর চন্দ্র ও শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়। তারা ওয়ার্ডওয়ান

কিন্তু সোনাসরের কথা এখন থাক। সে তো সামনের বছরের ব্যাপার। আগে এ বছরের কথা হোক। অমরনাথ দর্শন করে ফিরি। ঘরে ফিরে গৌতমকে ভাল দেখি। তারপরে আগামী বছরের কথা ভাবা যাবে। এখনও তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। চলার গতিবেগ বাড়ানো দরকার।

কিন্তু আমি তো একা নই। আমার সহযাত্রীরা যে কেউ কবি, কেউ গায়ক, কেউ উদাস। আবার কেউ-বা সাধুসঙ্গ করছে। তাহলেও তাদের তাড়াতাড়ি পা চালাতে বলি।

তারা আমার অনুরোধ রাখে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। কেবল গৌরীর খেয়াল নেই এদিকে। তার সময় কোথায়? সে যে সাধুসঙ্গ করছে।

তারাপীঠ নিবাসী জনৈক অশীতিপর সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সেই থেকে সে সাধুবাবার কথা শুনতে শুনতে বড্ড ধীরে ধীরে পথ চলেছে।

তবু আমি আবার গৌরীর কাছে আসি। বলি, "আরেকটু জোরে না হাঁটলে যে শেষনাগ পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, চলুন।" সে জোরে জোরে পা ফেলে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কয়েক মিনিট বাদে দেখি শুধু গৌরী নয়, সকলেই আবার ঢিমে তালে চলতে শুরু করেছে।

করবেই বা কি? প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই যে পথের প্রকৃতি তেমনি পাগল হবার মতো। একটু আগে আমরা নেমে এসেছি তৃণাচ্ছাদিত আরেকটি ছোট অধিত্যকায়। তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক অনিন্দ্যসুন্দর ঝরণা। ঝরণার তীরে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে জল দিয়েছি। তারপরে পেটভরা জল খেয়েছি। ভারী মিঠে জল।

চারিদিকে চকচকে রোদ। একটু গরম লাগছে। তাও ভাল। বৃষ্টি নামলে বিপদ।

তার চেয়েও বড় বিপদ সন্ধ্যে হলে। কিন্তু এরা যে কিছুতেই গতিবেগ বাড়াচ্ছে না! অগত্যা অসীমের শরণ নিই।

উপত্যকা ও মারগান গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে কাশ্মীর উপত্যকায় উপনীত হয়েছে। ১৯০২ সালে আর্থার নেভে প্রথম এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তাঁর পরে বোধকরি শম্ভুরাই সোনাসর পার হল। তারাই এ অঞ্চলে প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রী। ওরা পহেলগাঁও থেকে রওনা হয়ে দ্বিতীয়দিন সোনাসর হ্রদ (১২,২৪৫´) দর্শন ও তৃতীয়দিন গিরিবর্ত্মটি অতিক্রম করেছে।

সব শুনে কি যেন একটু ভাবে সে। তারপরে বলে, "ঠিক আছে আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, যা বলার আমিই বলছি। আপনি শুধু সায় দিয়ে যাবেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

হঠাৎ অসীম চেঁচিয়ে ওঠে, "ঘোষদা, দেখুন তো ওটা ঈশান কোণ নয়?"

আমি মাথা নাড়ি।

অসীম চিন্তার ভাণ করে একটু। সবাই তার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। সে আবার বলে, "তাহলে তো সর্বনাশ! ঈশান কোণে মেঘ, নিশ্চয়ই ঝড় উঠবে।"

"ঝড়?" সহযাত্রীরা প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। আর এ উচ্চতায় ঝড় মানেই Snow fall. অর্থাৎ Blizzard. তাই না ঘোষদা?"

আমি আবার মাথা নাড়ি।

"তাহলে তো আমাদের তাড়াতাড়ি হাঁটা উচিত?" সবার আগে গৌরী উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করে।

"নিশ্চয়।" সাধুবাবা উত্তর দেন, "ঝড় উঠলে ভারী বিপদ।"

"উঠবেই।" অসীম দৃঢ় কণ্ঠে রায় দেয়।

ব্যস, ব্রহ্মচারী আবৃত্তি বন্ধ করে, তুলতুল গান থামায়, ভাগনে ক্যামেরা কাঁধে নেয়। অশোকের গল্প শেষ হয়, সন্ন্যাসীর কথা ফুরোয়।

এবারে ওরা সত্যি সত্যি জোরে হাঁটতে শুরু করে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। মনে মনে অসীমকে ধন্যবাদ দিয়ে আমিও এগিয়ে চলি।

অসীম পাকা অভিনেতার মতো সবার আগে আগে যাচ্ছে। ভাবখানা যেন ঝড়ের ভয়ে পালিয়ে চলেছে।

॥ দশ ॥

'Seshnag is just ahed.'

সাইনবোর্ডটায় নজর পড়তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। তাহলে দিনের পদযাত্রার যতি আসন্ন। তাড়াতাড়ি পা চালাই।

বাঁক পেরিয়েই দেখতে পাই তাকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই, আনন্দে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ি। একি মাটির পৃথিবী, না স্বপ্নের স্বর্গ ?

পথটা একটু নিচে নেমে সামনে প্রসারিত। পথের গা ঘেঁষে বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, ডানদিকে নদী—জল অনেক নিচে। নদীর ওপারেও খাড়া উঁচু পাহাড়।

নদীটা প্রায় সোজা গিয়ে একটা হ্রদে পড়েছে। না, শুধু হ্রদ বললে অনেকখানি না-বলা রয়ে যাবে। নীলকান্ত মণির মতো উজ্জ্বল ঘননীল সরোবর থেকে নীলগঙ্গা বেরিয়ে এসেছে। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নদী নিজের পথ করে নিয়েছে। আর নদীপথের পাশ দিয়ে পাহাড় কেটে মানুষ অমরতীর্থের পথ তৈরি করেছে। সেই পথেই আমরা এগিয়ে চলেছি শেষনাগের দিকে—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে শেষনাগ দেখতে পারেন নি।

না, এগোতে পারছি না। কে যেন আমার পা দু'খানি মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি ঐ অপরূপ হ্রদের তীরে।

মনে পড়ছে মানস-সরোবরের কথা। জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ মানস দেখা হয় নি, হয়তো বা হবেও না কোনদিন। কিন্তু আজ এই শেষনাগের সামনে দাঁড়িয়ে আমি মানসের রূপ কল্পনা করতে পারছি।

একদিকে উঁচু উপত্যকা আর একদিকে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের ওপর দিকে পাথর আর বরফ, নিচের দিকে ঘাস ও ঝোপঝাড়। উপত্যকার দিকেও হ্রদের তীরে ঘাস ও ছোট ছোট গাছ। ফুলও রয়েছে। কিন্তু পাহাড় যেমন জল থেকে সোজা উঠে গেছে, উপত্যকা তেমন নয়। ওদিকটাতে জলের কাছে অনেকটা বেলাভূমি রয়েছে। সেখানে কিছু মানুষ দেখতে পাচ্ছি। খুবই ছোট ছোট দেখাচ্ছে। তাহলেও বুঝতে পারছি ওঁরা স্নান করছেন। এই হ্রদে স্নান করলে নাকি সর্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। বিশেষ করে জীবনে নাকি আর কখনও চর্মরোগ হয় না। আর হয় অক্ষয় পুণ্য। যাঁরা মাইলখানেক পথ ঘুরে প্রায়

শ'পাঁচেক ফুট উৎরাই ভেঙে ওখানে স্নান করতে নেমেছেন এবং হিমশীতল জলে স্নান করছেন, তাঁরা অধিকাংশই পুণ্যের প্রয়োজনে গিয়েছেন। পুণ্যলাভের জন্য আমরা যত চেষ্টা করে থাকি, পাপ না করার জন্য যদি তার এক দশমাংশ চেষ্টা করতে পারতাম, তাহলে মাটির পৃথিবী স্বর্গে রূপান্তরিত হয়ে যেতো। কিন্তু তা হবার নয়। আমরা পাপ করে তারপরে পুণ্যলাভের আশায় দেবতার চরণে এসে ঠাঁই নিতে চাই। জানি না ভগবান আমাদের আশ্রয় দেন কিনা?

দাঁড়িয়ে রয়েছি হ্রদের পশ্চিম তীরে। এখান থেকেই নীলগঙ্গা বেরিয়েছে। হ্রদের পুবদিকে দুটি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দূরে হিমবাহ দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে একটা নদী নেমে এসে হ্রদের বেলাভূমিতে আলপনা এঁকেছে। তারপরে জলে মিশেছে।

মহাগুণাস গিরিবর্ত্ম থেকে আসা আরেকটা ছোট নদী উত্তরের উপত্যকার ওপর দিয়ে এসে শেষনাগে পড়েছে। পুণ্যার্থীরা তারই তীর ধরে শেষনাগের তীরে পৌঁচেছেন। কিন্তু উপত্যকার কথা এখন নয়। আমরা তো ওখানেই চলেছি। এবারে এগনো যাক।

পথটি হ্রদের পশ্চিম দিক থেকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তরে প্রসারিত। আমরা সেই পথ বেয়ে ওপরে উঠছি। বেশিদূর উঠতে হল না। পথটা এবার নিম্নমুখী হয়ে উপত্যকায় মিশেছে।

নেমে আসি উপত্যকায়। প্রায় সমতল পথ দিয়ে এগিয়ে চলি পথের পাশে বাঁদিকে খানিকটা জায়গা লোহার পাইপ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সামনে সাইনবোর্ড 'PONY YARD' অর্থাৎ আস্তাবল। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তাঁরা ঘোড়ার জন্য আলাদা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এতটুকু জায়গাতে ক'টি ঘোড়া রাখা যাবে? যাত্রার সময় তো হাজার হাজার ঘোড়া আসে!

আস্তাবল ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। উপত্যকাটি বেশ বড়—চন্দনবাড়ির চেয়ে অনেক বড়। তবে খুবই রুক্ষ। ছোট-ছোট ফুল, ছোট-বড় ঘাস আর কাঁটাগাছ ছাড়া কিছু নেই। বড় গাছ থাকবে কেমন করে? এখানকার উচ্চতা সাড়ে বারো হাজার ফুট। কিন্তু কেবল উচ্চতার জন্যই বনের অভাব নয়। গোমুখীর উচ্চতা ১২,৭৭০ ফুট। গোমুখীর সন্নিহিত অঞ্চলে এবং আরও ওপরে রক্তবরণ হিমবাহে প্রচুর বড় বড় গাছ রয়েছে। এখানে বড় গাছ নেই কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে হিমবাহ অঞ্চল। শীতকালে এ উপত্যকার সবটাই বরফে ঢেকে যায়। তার ওপরে এখানে সর্বদা প্রবল বাতাস বয়। বায়ুর জন্যই এই

উপত্যকার নাম—বায়ুযান, কাশ্মীরীরা বলেন—ওয়াব্‌যান। উচ্চহিমালয়ে বাতাস মানেই শীতলতা—মৃত্যুর পদধ্বনি।

আস্তাবলের পরে পথের পাশে গোটাবিশেক তাঁবু। তারপরে পথটা আবার একটু ওপরে উঠে নেমে গিয়েছে মূল-উপত্যকায়। আমরা এগিয়ে চলি।

দেখা যাচ্ছে তাঁবুর নগরী। এখানে দুটি বিশ্রাম-ভবন ও দুটি মালবাহকদের ঘর রয়েছে। সেগুলিও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কিন্তু ঘর-বাড়ি নয়, তাঁবুগুলোই ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা তো তাঁবুতেই থাকব। ভাবতেও ভাল লাগছে।

এখন আবার কারা চন্দনবাড়ি রওনা হচ্ছেন? কয়েকজন অশ্বারোহী এদিকে আসছে, তার মানে চন্দনবাড়ি চলেছে। সন্ধ্যার আগে পিসু পার হতে পারবে কি? নইলে তো মুশকিলে পড়বে।

না, আমার দুশ্চিন্তা অমূলক। এরা ফিরে যাচ্ছে না। এরা আজই এসেছে—আমাদের সহযাত্রী সেই সাউথ ক্যালকাটার সাহেব-মেম। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ঘুরতে বেরিয়েছে। তার মানে এতটা পথ ঘোড়ায় চড়েও অশ্বারোহণের আশ মেটে নি। ঘোড়াগুলো যে ঘোড়া হলেও জীব এবং তাদেরও একটু বিশ্রামের দরকার, এ খবরটা বোধহয় জানা নেই ওদের।

আমাদের চিনতে পেরে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল ওরা। জনৈকা যুবতী তুলতুলকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের এত দেরি?"

গম্ভীর স্বরে তুলতুল জবাব দেয়, "আমার ঘোড়াটা যে আপনাদের ঘোড়ার মতো তেজী নয়। আর তাই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে হেঁটে আসতে হল।"

"হেঁটে এলে!"

"হ্যাঁ।"

"কোথা থেকে?"

"চন্দনবাড়ি।"

"হেঁটে পিসু পার হলে?"

"হ্যাঁ।"

বিস্মিতা যুবতীটি বোধকরি কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অতএব তার স্বামী তাকে সাহায্য করে, "এতে অবাক হবার কি আছে? পাহাড়ী পথে তো ঘোড়ায় চড়ার চেয়ে হাঁটা সহজ। নিজের ইচ্ছে মতো পথচলা যায়। পড়ে যাবার ভয় থাকে না।"

তুলতুল বোধহয় আর সহ্য করতে পারছে না। সে ওদের কাছ থেকে বিদায়

না নিয়েই এগিয়ে চলে। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

পৌঁছে গিয়েছি লোকালয়ে, কয়েকটি দোকান আর যাত্রীদের তাঁবু। পথের দু-পাশেই বসতি। আর তারই ঠিক সামনে সাইনবোর্ড—

'WAVJAN

Ht. 12,500 ft.'

শেষ হল আজকের পদযাত্রা বেলা দুটো বাজে। অর্থাৎ আট মাইল পথ আসতে প্রায় ছ' ঘণ্টা লেগেছে।

পথের ধারেই 'কিচেন টেণ্ট্'। সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ফকিরবাবু। বললেন, "তিন ও চার নম্বর তাঁবু আপনাদের, একেবারে শেষদিকে। তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম করুন, খাবার নিয়ে যাচ্ছে।"

পথের দু-পাশেই তাঁবু। বাঁদিকে প্রথম সারিতে কয়েকটি দোকান—চা ও খাবারের দোকান। ডানদিকে পথের ধারে দুটি পাথরের ঘর ও যাত্রীদের তাঁবু। এই স্থায়ী ঘরদুটি মালবাহকদের জন্য নির্দিষ্ট। ডানদিকে খানিকটা দূরে ফাঁকা মাঠের মাঝে বিশ্রাম-ভবন।

আমরা তাঁবুতে থাকব। অতএব বিশ্রাম-ভবনের কথা থাক। পথের ধারে 'কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্'-এর 'ব্যানার' লাগানো রয়েছে। সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দু-পাশে আমাদের তাঁবু। আর তারপরেই হ্রদ—শেষনাগ। এককথায় আমাদের তাবুর পেছনেই শেষনাগ। অপরূপ অবস্থান। স্থান নির্বাচনের জন্য ফকিরবাবুকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আমরা এখানে রাত্রিবাস করব—চাঁদনী রাত। চাঁদের আলোয় শেষনাগকে দেখব, ভোরের আলোয় শেষনাগকে দেখব, সকালের সোনালী রোদে শেষনাগকে দেখব। যখন ইচ্ছে, যতক্ষণ ইচ্ছে হিমালয়ের অন্তরলোকের এই স্বর্গীয় সরোবরকে দেখব।

আমরা দুটি রাত এই বায়ুযানে থাকব। হ্যাঁ, বায়ুযান। হ্রদের নাম শেষনাগ, উপত্যকার নাম বায়ুযান। অনেকে অবশ্য হ্রদের এই তীরভূমিকেও শেষনাগ বলে থাকেন।

যাক্‌গে যেকথা ভাবছিলাম। এই রমণীয় স্থানে আমরা দুটি রাত অতিবাহিত করব—আজ এবং পরশু। পরশু সকালে পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়ে অমরতীর্থে অমরনাথজীকে দর্শন করব। পঞ্চতরণীতে ফিরে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে সোজা চলে আসব এখানে।

বাসুদেব বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। বলে, "এই দুটো আমাদের তাঁবু। ভেতরে গিয়ে বসুন।"

বাসুদেব ঘোড়ায় এসেছে। অনেকক্ষণ আগে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সে বসে থাকে নি। তাঁবু ঠিক করে আমাদের মালপত্র আনিয়ে রেখেছে। হিমালয়ের দুর্গম পথে এটাই নিয়ম। সুতরাং আমরা তাকে ধন্যবাদ দিই না।

আর ধন্যবাদ দেবার সুযোগই বা কোথায়? আমাদের সাড়া পেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছেন তুলতুলের মা ও বাবা, মিস্টার ও মিসেস বোস, অজিত ও বৌমা, ডাক্তারের মা ও অর্পণা এবং আরও অনেকে। আমরা হেঁটে এসেছি। সুতরাং সবাই আমাদের, বিশেষ করে তুলতুল গৌরী মায়া ও সরকারদাকে অভিনন্দিত করছে। অভিনন্দিত করছে জ্যোতির্ময় ও অন্যান্য যাত্রীদের, যারা পথে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে আমাদের সঙ্গে হেঁটে এসেছে।

মিঃ চ্যাটার্জী নামে জনৈক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাঁর যুবক পুত্র, স্ত্রী ও জন পাঁচেক শালীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছেন। আগেই বলেছি তাঁর ছেলেটিও আজ আমাদের সঙ্গে হেঁটে এসেছে। এই ভদ্রলোকের পুরো নামটি আমরা কেউ জানি না কারণ তুলতুলের বাবা তাঁর নাম রেখেছেন শালীবাহন। সেই নামেই তিনি এখন সুপরিচিত।

শালীবাহন জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ছেলে কেমন হেঁটেছে?"

"ভালই।" উত্তর দিই।

উল্লসিত স্বরে শালীবাহন বললেন, "জানতাম ও ভাল হাঁটবে। কার ছেলে দেখতে হবে তো। আরে মশাই আমরা 'অরিজিন্যালি' গাঁয়ের ছেলে। এখন না হয় কলকাতায় গাড়ি ছাড়া একপা-ও চলি না, কিন্তু ছোটবেলায় গ্রামে থাকতে রোজ পাঁচ মাইল মাটির পথ ভেঙে স্কুলে যেতাম। কতক্ষণ সময় লাগত জানেন?"

"কতক্ষণ?"

"আধঘণ্টা।"

"আধঘণ্টায় পাঁচ মাইল!" আমরা বিস্মিত।

"হতে পারে না।" তুলতুলের বাবা সোজাসুজি মন্তব্য করেন।

শালীবাহন একটু বিচলিত হন। বলেন, "না, ঠিক আধঘণ্টা নয়, মানে মিনিট পয়তাল্লিশ লাগত আর কি?"

"দূরত্বটাও পাঁচ মাইল নয়, আরও কিছু কম ছিল।" মিঃ ভট্টাচার্য গম্ভীর স্বরে বলেন। আমরাও কষ্ট করে গম্ভীর থাকি।

কি যেন একটু ভাবেন শালীবাহন। তারপরে মিঃ ভট্টাচার্যকেই জিজ্ঞেস করেন, "আরেকটু কম হবে, তাই না?"

বলাবাহুল্য এই যাত্রাতে এসেই মিঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। তবু মিঃ ভট্টাচার্য বলেন, "কম বইকি, অনেক কম।"

"কত?"

"আপনার গ্রামের বাড়ি থেকে স্কুল আর কতদূর ছিল, বড়জোর মাইল দুয়েক।"

"দু মাইল? তা হবে।" একবার থামেন শালীবাহন। তারপরে বলেন, "কিন্তু ভেবে দেখুন, দু-মাইল হেঁটে আমরা প্রতিদিন স্কুল করেছি, আর এখনকার ছেলে-মেয়েরা একটা 'স্টপ্' হাঁটতে চায় না। কিন্তু আমার ছেলে আমার ছোটবেলার সেই গুণটা পেয়েছে। হাঁটতে খুব ভালোবাসে।"

"তা আর বলতে", মিঃ ভট্টাচার্য যোগ করেন, "নইলে কি আর সে এতটা পথ এভাবে হেঁটে আসতে পারত?"

আর হাসি চেপে রাখা সম্ভব নয়, তাই তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে পড়ি।

একটু বাদে কাল বিকেলের সেই বৃদ্ধা তাঁবুতে আসেন। মুগ্ধকণ্ঠে বলেন, "তোমরাই ধন্য বাবা! অমরনাথজী কৃপা করলেন তোমাদের। তোমরা পায়ে হেঁটে যেতে পারছ তাঁর কাছে। আমার দুর্ভাগ্য, আমি পারলাম না।"

তিনি আজ ঘোড়া নিয়েছেন। সুতরাং প্রতিবাদ করা নিরর্থক। তবু মৃদু হেসে বলি, "আপনার বয়সে ঘোড়ায় চড়েই বা ক'জন অমরনাথ যেতে পারেন?"

ভদ্রমহিলা মনে মনে নিশ্চয়ই খুশি হলেন আমার কথায়। কিন্তু মুখে বলেন, "এ আর একটা এমন কি বাবা! এতো ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়।"

আমাদের খবরাখবর নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। আমরা জুতো খুলে পদসেবায় লেগে যাই। হিমালয়ের পথে প্রত্যেক পদযাত্রী শ্রীচরণের সেবক।

একটু বাদে খাবার আসে। খেয়ে নিয়ে বিছানা খুলতে লেগে যাই। আলো থাকতে থাকতে গোছগাছ করে নেওয়া সুবিধে। মোমের আলোয় এসব কাজ করা খুবই কঠিন।

গতকাল চন্দনবাড়িতে ব্রহ্মচারী দরজার পাশের খাটিয়াটি নিয়েছিল। আজও তাই বাসুদেব তাকে সেই জায়গাটাই দিয়েছে। কিন্তু আজ জায়গাটা পছন্দ হয় না তার। বলে, "আমাকে একেবারে শেষ খাটিয়াটা দিন।"

"কেন?"

"আমি জপতপ করি। এখান থেকে সব এঁটোকাঁটা বার বার তাঁবুতে ঢোকে।"

"আসল কথাটা বলছ না কেন পণ্ডিত?" অসীম প্রশ্ন করে।

ব্রহ্মচারী বুঝতে পারে না তার কথা। বলে, "কি কথা দাদা?"

"তুমি শুনেছো বায়ুযানে খুব বায়ু। দরজার কাছে শুলে তোমার শীত বেশি লাগবে।"

"কি যে বলেন অসীমদা!" ব্রহ্মচারী মৃদু প্রতিবাদ করে, "শীতের ভয় আমি করি না। শুধু সদরে থাকা আমার পক্ষে অসুবিধে বলে, আমি ওখানটায় যেতে চাইছি।"

অসীম কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করে না। বলে, "ভয় নেই। রাতে তাঁবুর পর্দা ফেলে দেওয়া হবে।"

"তা হোক্ গে, আমি এখানে শোব না।" ব্রহ্মচারীর স্বরে বিরক্তি।

অসীম আর ঘাটায় না ওকে। আমি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে খাটিয়া বদল করি। সে খুশি হয়।

খাওয়া ও গোছগাছের পরে আমরা বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। শেষনাগের তীরে এসে দাঁড়াই। গোধূলি ঘনিয়ে আসছে তার বুকে। একটা রোমাঞ্চকর নীরবতা আর রহস্যময় সৌন্দর্য বিরাজ করছে সেখানে।

আর কিছুক্ষণ। তারপরেই আঁধারের যবনিকা তাকে ঢেকে দেবে। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য। অবশেষে চাঁদ উঠবে আকাশে। রহস্যময়ী শেষনাগ, মোহময়ী রূপ ধারণ করবে।

আবার নেমে আসি পথে। প্রত্যেক তাঁবুর সামনেই জটলা। কুশল বিনিময় করতে করতে এগিয়ে চলি বড়রাস্তার দিকে।

দেখা হয় ডাক্তারের সঙ্গে। বলি, "কি খবর তোমার? খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?"

"না হয়ে উপায় কি দাদা? দুজন বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

"কি হয়েছে?"

"কি আর হবে? High altitude sickness মাথার যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী। একজন বারদুয়েক বমি করেছেন।"

"এখুনি তাঁবুর বাইরে আসতে বলো। কানের টুপি আর হাতের দস্তানা খুলে কিছুক্ষণ লেকের ধারে গিয়ে বসতে ব'লো।"

"বলছি।" অসিত জবাব দেয়, "কিন্তু তাঁরা আসবেন কি?"

"না এলে aclimatized হবেন না। কষ্ট পাবেন।"

বড় রাস্তায় আসি। হাঁটতে থাকি সামনের দিকে। পথের দু-পাশে ফার্লংখানেক জায়গা জুড়ে তাঁবুর কলোনী—দোকান-পাট ও যাত্রীনিবাস।

একেবারে শেষদিকে একটা তাঁবুর সামনে বেশ ভিড়। আমাদের কয়েকজন সহযাত্রীও রয়েছেন। তাঁদেরই একজন বলেন, "সাহেব সাধু।"

লক্ষ্য করে দেখি তাঁবুর ভেতরে জনৈক শ্বেতাঙ্গ গেরুয়াধারী পদ্মাসন করে বসে আছেন। তাঁর গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসীর মালা। কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে কি যেন বলছেন।

কিন্তু সাধুর পাশে ঐ মেয়েটি কে? তার পরনে বিলিতি পোষাক অথচ গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। এই মেয়েটিকেই তো গতকাল এসময় চন্দনবাড়িতে নদীর ধারে পুডিং তৈরি করতে দেখেছি!

অসীমও সমর্থন করে আমার অনুমান। কিন্তু সে আজ আর কালকের মতো আলাপ জমায় না মেয়েটির সঙ্গে। বরং বলে, "বড্ড হাওয়া দিচ্ছে, শীত করছে। চলুন একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখুনি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে কি হবে? তাছাড়া আরেকবার গরম চা পেলে ভালই হয়।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে একটা দোকানে ঢুকি—তাঁবুর দোকান। সর্দারজীর হোটেল-কাম্-রেস্তোরাঁ।

একপাশে উনুনের ধারে চা তৈরির সাজ-সরঞ্জাম। সর্দারজী সেখানেই বসে আছেন। আরেকপাশে দুখানি খাটিয়া পাতা। একখানিতে দুজন শ্রান্ত যুবক ও একজন যুবতী বসে আছে। মেয়েটিকে দেখে ওদের বাঙালী বলেই মনে হচ্ছে।

আমরা খালি খাটিয়াখানিতে বসি। মামা সর্দারজীকে চা বানাতে বলে।

তাঁবু হলেও দোকানের সামনের দিকটা সম্পূর্ণ খোলা। প্রচুর হাওয়া আসছে ভেতরে—বায়ুযানের হিমেল-হাওয়া। তবু তেমন একটা শীত লাগছে না এখানে। লাগবে কেমন করে, এখানে যে উনুন জ্বলছে! উচ্চহিমালয়ে আগুনের আরেক নাম জীবন।

আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়, ওরা বাঙালী। যুবকদুটি বন্ধু। যুবতীটি ওদের একজনের স্ত্রী। ওরা হাওড়া থেকে এসেছে।

তিনজনেই ক্ষীণদেহী, তার মধ্যে যুবতীটি বেশি রোগা। জীবনে সে আর কখনও এমন পাহাড়ী পথ পাড়ি দেয় নি। বেচারী বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছে।

আসল কারণটা বুঝতে পারি একটু বাদে। ভাগনের প্রশ্নের উত্তরে একটি যুবক জানায়, "আমরা আজ শেষরাতে পহেলগাঁও থেকে রওনা হয়েছি।"

"পহেলগাঁও!" আমরা বিস্মিত।

"হ্যাঁ। চন্দনবাড়িতে লাঞ্চ করেছি। আমরা আজ একদিনে আঠারো মাইল হেঁটেছি।" সগর্বে উত্তর দেয় যুবকটি।

"তাহলে তো গা-হাত-পা ব্যথা হবেই।" সরকারদা মাথা নাড়েন।

"মাথা ধরা এবং বমিও তো হতে পারে।" পরিতোষবাবু যোগ করেন।

আমি ভাবি অন্য কথা। একে দুর্বল ও অনভিজ্ঞ, তার ওপরে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ। কষ্ট তো হবেই। কিন্তু কি দরকার ছিল এই অসাধ্য সাধন করার? জীবনে ক'টি দিন আমরা হিমালয়ের পথে পদচারণা করার সুযোগ পাবো? সেই সামান্য সময়টুকু যদি দুচোখ মেলে হিমালয়কে না দেখতে পারি, তাকে অনুভব না করতে পারি, উপভোগ না করতে পারি—তাহলে কেন হিমালয়ে আসা? পথচলার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য আমরা হিমালয়ে আসি নি, দেবতাত্মা-হিমালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যই হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করছি। যে-পথের ধূলিতে শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দের পদধূলি মিশে আছে, সেইপথে চোখবুজে ছুটোছুটি করে কেন অকারণে এমন কষ্ট পাওয়া?

মেয়েটির কষ্ট বুঝতে পারছি। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ। যে-মেয়ে কালে-ভদ্রে বাড়ির বাইরে বের হয়, সে একদিনে আঠারো মাইল পাহাড়ীপথ ভেঙেছে! পিসু চড়াই পেরিয়েছে।

মেয়েটির হয়তো কষ্ট কিছু বেশি। কিন্তু যুবক দুটিরও কষ্ট হচ্ছে। অসুস্থ এরা তিনজনেই। সর্দারজী তাঁবুর বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। রুটি ডাল ও সব্জির ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছেন। ওরা তারই প্রতীক্ষা করছে। খেয়ে নিয়েই তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়বে। এবং আমার বিশ্বাস আগামী কাল সারাদিন ওদের বিশ্রাম নিতে হবে এখানে।

তাহলেও সেকথা বলি না। অন্যকথা বলি। বলি সর্দারজীকে, "রান্না হয়ে যাবার পরে এদের এক সসপ্যান গরমজল করে দিতে পারবেন?"

"পারব বৈকি!" সর্দারজী উত্তর দেন, "কিন্তু কেন বলুন তো?"

"পা-গুলো কিছুক্ষণ গরমজলে ডুবিয়ে না রাখলে যে এদের চোখে ঘুম আসবে না রাতে আর কাল সকালেও উঠে বসতে পারবে না।"

সর্দারজী মানুষটি ভাল। ব্যবসায়ী হলেও সেবাপরায়ণ। মৃদু হেসে তিনি ওদের বলেন, "আপনারা খেয়ে নিয়ে তাঁবুতে চলে যাবেন। আমি একবালতি গরমজল ও দুটো 'একস্ট্রা' বালতি পাঠিয়ে দেবো।"

ওরা আমার মুখের দিকে তাকায়।

আমি বলি, "জলটা সমান করে তিন বালতিতে ভাগ করে নেবেন। তারপরে তিনজনেই নিজের বালতি মাটিতে রেখে পা ঝুলিয়ে খাটিয়ায় বসবেন। একটু-একটু করে সইয়ে-সইয়ে পা দুখানি পালা করে গরম জলে ডুবিয়ে রাখবেন কিছুক্ষণ ধরে। জল জুড়িয়ে গেলে পা মুছে মোজা পায়ে দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বেন। ঠিক কথা, একটা করে Novalgin কিংবা Analgin ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন।"

ওরা মাথা নাড়ে। তারপরে মেয়েটির স্বামী স্বীকার করে, "এতটা পথ একদিনে হেঁটে বোধহয় কোন লাভ হল না! মনে হচ্ছে কাল আর আমরা পথ চলতে পারব না। এখানেই থেকে যেতে হবে।"

এইবারে কথাটা বলি ওদের, "হিমালয়ের পথ আনন্দের পথ। অযথা তাড়াহুড়ো করে এই মায়াময় পথের মাধুর্য নষ্ট করে দেবেন না। এভাবে পথ চললে শুধুই শরীরটাকে কষ্ট দেবেন, সময় সাশ্রয় হবে না। দু-দিনের পথ একদিনে এসে একদিন শুয়ে থাকা আর দু-দিনের পথ দুদিনে আসা একই কথা। বরং তাতে পথ-চলার আনন্দ অনেক বেশি পাওয়া যায়।"

"আর আমরা এভাবে পথ চলব না।" মেয়েটি বলে। তার সঙ্গীরাও মাথা নাড়ে।

চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু বসে আছি চায়ের দোকানে। বসে বসে হাওড়ার যাত্রীদের সঙ্গে পথের গল্প করছি। সর্দারজী ও তাঁর সহকারী মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছেন আমাদের আলোচনায়। তাঁরা অবশ্য হাতে কাজ করে যাচ্ছেন। 'রোটি' বানাচ্ছেন। এর পরে 'দাল' ও সব্‌জি গরম করে নিলেই ওদের খেতে দিতে পারবেন।

হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থপথের মতো এপথেও আমিষ খাওয়া নিষেধ, সবাইকে নিরামিষ খেতে হয়। তবে পেঁয়াজ এবং মদে বোধহয় তেমন আপত্তি নেই। কারণ সহযাত্রীদের অনেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পহেলগাঁও থেকে। পেঁয়াজ বাংলার বাইরে সব্‌জি বলে স্বীকৃত আর মদ যে সুরলোকের সুরা। শুনেছি এখানেও নাকি কোন কোন দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করি সর্দারজীকে।

দিলখোলা সর্দারজী উত্তর দেন, "জরুরৎ হোগী তো দেখা যায়গী।"

সর্দারজী ও হাওড়ার যাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসি পথে। ইতিমধ্যে কখন যে নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে টের পাই নি। চাঁদের আলোয় বায়ুযান বিচিত্র বেশে সাজ সেরে নিয়েছে।

ঘননীল আলোময় আকাশ। সেখানে রূপোলী মেঘের আনাগোনা। তারা বলাকার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের বুকে। আর সেই আকাশটা নেমে এসে প্রায় পাহাড়ের মাথা ছুঁয়েছে।

কাছের সেই সুনীল আকাশ থেকে রূপোলী আলো অবিরত গলে গলে পড়ছে —বায়ুযানের পথে ও প্রান্তরে আর শেষনাগের জলে ও স্থলে।

প্রায় ছুটে চলি শেষনাগের দিকে। তাঁবুর কলোনী পেরিয়ে উঁচু পাড়ে এসে দাঁড়াই।

রূপকথার সুনীল সরোবর। স্থির ও অচঞ্চল একখানি সুবিরাট নীলকান্ত মণি। তার উজ্জ্বল বুকে আকাশ আর পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি শান্ত সুন্দর ও শাশ্বত শেষনাগের দিকে।

এতো মর্ত্য নয় স্বর্গ, সরোবর নয় স্বপ্ন স্বপ্নের স্বপ্ন। বিচিত্র প্রকৃতির এমন বর্ণাঢ্য বেশ বড় বেশি দেখি নি। আমি পুলকিত, আমি শব্দহীন, আমি দিশাহারা।

এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে! তুমি পরম করুণাময় আর আমি সৌভাগ্যবান। তোমার এই অপরূপ রূপ আমি প্রত্যক্ষ করতে পারলাম। হে রূপময়, হে বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের আধার, হে প্রাণপুরুষ—তোমাকে প্রণাম।

॥ এগারো ॥

সকালে ঘুম ভাঙে গানের সুরে—বাংলা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত।

"হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।"

পাশের তাঁবুতে প্রভাত-সঙ্গীতের আসর বসেছে। প্রথমে মামা গাইছে, তারপরে ভাগনে ও জ্যোতির্ময় ধুয়ো ধরছে। শুনতে কিন্তু মন্দ লাগছে না। মামা গেয়ে চলেছে—

"সদা মনে হয় 'কী করি' 'কী করি',
কখন আসিবে কালবিভাবরী—
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি! হরি!
হরি বিনে কেহ নাই হে॥"...

সহযাত্রীদের সবারই বোধকরি ঘুম ভেঙে গিয়েছে। মামার গলায় বেশ জোর আছে। ভালই হল। প্রভাতফেরীর কাজটা হয়ে গেল।

স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে উঠে বসি। এককাপ চা পেলে হত। কিন্তু বেড-টি আসতে দেরি আছে এখনও। সবে সাড়ে পাঁচটা, ছ'টার আগে বেড-টি দিয়ে উঠতে পারে না। কি করবে? একে শীত, তার ওপরে এতগুলো মানুষ।

অতএব উঠে দাঁড়াই। জামা-জুতো পরে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। না, রোদ ওঠে নি এখনো। ওঠার কথাও নয়। হিমালয়ের-সূর্য বড়ই আয়েশী, সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙে না তার।

রোদ আসে নি কিন্তু চারিদিক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মেঘমুক্ত আকাশ। ঝকঝকে সকাল। শেষনাগকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

ওপারে পাহাড়ের গায়ে কাল রাতে কিছু বরফ পড়েছে। অনেকখানি অংশ সাদা হয়ে গিয়েছে।

তাঁবুর পাশ দিয়ে উঠে আসি উঁচু জায়গাটায়—ঠিক আমাদের তাঁবুর পেছনে,

শেষনাগের পাড়ে। এখান থেকেই শেষনাগকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

কিন্তু ওখানে চাদর মুড়ি দিয়ে অমন করে বসে আছে কে? তাকিয়ে রয়েছে শেষনাগের দিকে?

আমাদের দলেরই কেউ হবে। এখানে এত সকালে বাইরের লোক কে আসবে?

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসি। মনে হচ্ছে মহিলা। এত ভোরে এই শীতের সকালে একাকিনী অমন উদাস দৃষ্টিতে কে তাকিয়ে আছে শেষনাগের দিকে?

সে বোধহয় আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে। আমার দিকে তাকিয়েছে। কে? চিনতে পারছি না। আমি এগিয়ে চলি।

সে হাসে।

কে? গৌরী নয়?

হ্যাঁ গৌরী।

গৌরী ডাক দেয়, "আসুন শঙ্কুদা! বসুন।"

আমি ওর পাশে বসি। তারপরে জিজ্ঞেস করি, "কতক্ষণ এখানে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলে, "তা আধঘণ্টা হয়েছে। ঘুম ভেঙে গেল, তাই চলে এলাম। ভারী ভাল লাগছে বসে থাকতে। শেষনাগ সত্যি সুন্দর।"

"আর ওপারের ঐ পাহাড়টা?"

গৌরী দু-হাত জোড় করে প্রণাম জানায়। তারপরে বিনম্র কণ্ঠে বলে, "উনি তো স্বয়ং মহাদেব। দেখছেন না তাঁর জটা থেকে গঙ্গা নেমে এসেছে শেষনাগে।"

ভাল করে তাকাই। কষ্ট কল্পনা। তাহলেও গৌরীর কথা ভাল লাগে আমার। ভক্ত তার নিজের মনের মুকুরে ভগবানকে দর্শন করেন। যাঁর চোখ আছে তিনি তাঁকে দেখতে পান, যাঁর কান আছে তিনি তাঁর কথা শুনতে পারেন।

তাই বোধহয় অভেদানন্দজীও ঐ পাহাড়টি সম্পর্কে বলেছেন, 'চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রিচূড়া হচ্ছে মহাদেবের মস্তক, আর ঐ তুষারনদী হচ্ছে তাঁর জটা।'

গৌরী এখনও অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছে শিখরগুলোর দিকে। খুবই স্বাভাবিক, হর-পার্বতীর দেশে এসেছে সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে শিব-দর্শন করছে।

কিন্তু ওর এমন আনমনা ভাব ভাল লাগে না আমার। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "এই জায়গাটার নাম কেন বায়ুযান হল জানো?"

"না তো।" গৌরী আমার দিকে তাকায়।

শুরু করি, "একদা এখানে বায়ুরূপী এক ভীষণ অত্যাচারী ভয়ঙ্কর দৈত্য বাস করত। তার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে স্বর্গের দেবতারা কৈলাসে বিশ্বনাথের কাছে গেলেন। বললেন—বায়ুদৈত্যের অত্যাচারে আমাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। হে মহেশ্বর! আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

মহাদেব মাথা নেড়ে বললেন—বায়ুদৈত্য আমার ভক্ত, সে আমার আশ্রিত। অতএব আমার পক্ষে তার কোন অমঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। তোমরা নারায়ণের কাছে যাও।

—কিন্তু আপনি বাধা দিলে তো বিষ্ণুর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়।

বাধ্য হয়ে মঙ্গলময় শিবকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল—ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য নারায়ণ যদি বায়ুদৈত্যকে বিনাশ করেন, আমি কোন বাধা দেব না।

আনন্দিত দেবগণ বিষ্ণুলোকে গিয়ে নারায়ণকে সব কথা জানালেন। তারা করজোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—আপনি আমাদের বায়ুদৈত্যের অত্যাচার থেকে মুক্ত করুন।

বিষ্ণু বললেন—তথাস্তু।

তারপরে ভগবান শেষনাগকে আদেশ দিলেন—যাও, মর্ত্যে গিয়ে বায়ুদৈত্যকে বিনাশ কোরো।

শেষনাগ তথা বাসুকি এলেন এখানে। তিনি এক নিঃশ্বাসে এখানকার সব বায়ু শুষে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বায়ুদৈত্যের প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হল। আর সেই থেকে এই রমণীয় উপত্যকার নূতন নাম হল বায়ুযান।"

"বায়ুদৈত্যের জায়গা বায়ুযান হলেও, শেষনাগ কিন্তু শেষনাগে নেই।"

নারীকণ্ঠে চমকে উঠি। পেছন ফিরে দেখি মিসেস মণ্ডল মুচকি হাসছেন।

সহাস্যে বলি, "লুকিয়ে গল্প শোনা ঠিক নয়।"

"ফাউ-তে পাপ নেই।" মিসেস জবাব দেন।

"ফাউ?"

"ফাউ বৈকি! বেড-টি-র সঙ্গে বেরিয়েছি সবার খোঁজ খবর করতে। শুনলাম আপনারা তাঁবুতে নেই। বুঝতে পারলাম এখানে এসেছেন। তাই চা-য়ের খবর দিতে এলাম। গল্পটা ফাউ জুটে গেল।"

"কিন্তু কেবল শুনলেই চলবে না, বলতেও হবে।" আমি বলি, "আপনি বহুবার এখানে এসেছেন।"

"তা এসেছি, কিন্তু আমি আবার কি গল্প বলব?" মিসেস মণ্ডল বিচলিতা।

"শেষনাগের গল্পই বলুন।"

"শেষনাগ সম্পর্কে বলার মতো একটা কথাই জানা আছে আমার, সেটি বলছি। কিন্তু এখানে নয়, বেড-টি দেওয়া হচ্ছে, কাজেই তাঁবুতে চলুন।"

"গল্প?" গৌরী জিজ্ঞেস করে।

মিসেস জবাব দেন, "আসুন, চলতে চলতে গল্প বলছি।"

আমরা মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করি। মিসেস বলতে থাকেন, "শেষনাগ বা সুবিশাল বাসুকি বোধহয় শেষনাগ হ্রদে নেই, কিন্তু রয়েছে তাঁর এক ক্ষুদ্রকায় স্বজাতি।"

"কি রকম?" চলতে চলতে গৌরী প্রশ্ন করে।

মিসেস উত্তর দেন, "আপনারা তো জানেন অমরকথা বলবার জন্য শিব পার্বতীকে যে নির্জন গিরিগুহায় নিয়ে গিয়েছিলেন সেই গুহাই অমরতীর্থ অমরনাথ।"

আমরা মাথা নাড়ি। মিসেস মণ্ডল বলতে থাকেন, "অমরকথার মাহাত্ম্য হল যে শুনবে সে-ই অমর হয়ে যাবে। শিব তাই চান নি যে পার্বতী ছাড়া আর কেউ সে কথা শোনে। কিন্তু তখনও তাঁর গলায় একটি সাপ ছিল। শিব সে সাপটিকে শেষনাগে রেখে অমরনাথে গিয়েছিলেন। বোধহয় তিনি চান নি, সাপটা অমরকাহিনী শুনে অমর হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সাপটা কিন্তু অমর হয়ে গেছে।"

আমরা মিসেসের মুখের দিকে তাকাই। তিনি বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন যাত্রার সময় অমরনাথজীর ছড়ি নিয়ে যাওয়া হয় নিচে, ঐ হ্রদের তীরে। ওখানে একখানি নির্দিষ্ট পাথরের ওপর ছড়ি রেখে পূজারী ও সাধুরা স্নান ও পূজা-পার্বণ করেন। তখন নাকি দুধের মতো সাদা একটা পঞ্চমুখী সাপ শেষনাগ থেকে উঠে আসে। আস্তে আস্তে সে ছড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। মহান্তজী তাকে খেতে দেন। খেয়ে নিয়ে সে আবার ফিরে যায় শেষনাগের জলে।"

"যাঁরা আপনাকে একথা বলেছেন, তাঁদের কেউ দেখেছেন এ ঘটনা?" আমি প্রশ্ন করি।

মিসেস মণ্ডল উত্তর দেন, "না। কারণ স্নান করাবার সময় ছড়ির সঙ্গে শুধু পূজারী এবং সাধুরাই নিচে যেতে পারেন। তবে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কারও কাছ থেকে হয়তো শুনে থাকবেন ওঁরা। কিন্তু গত দু-বছর থেকে নাকি সাপটি আর উঠে আসছে না।"

"হয়তো অমরনাথজী তাঁর সাপটিকে নিয়ে গিয়েছেন।" আমি বলি।

"আপনি কি কাহিনীটা বিশ্বাস করেন না শঙ্কুদা?" গৌরী প্রশ্ন করে।

"বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ বারো হাজার ফুট উঁচুতে এই তুষারগলা জলে কোন প্রাণীর বারো মাস বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে শীতের প্রায় সাত মাস যে জলাশয় বরফে ঢাকা থাকে।"

গৌরী কোন প্রতিবাদ করে না। সে নিজের তাঁবুতে চলে যায়। মিসেস মণ্ডল ও বিদায় নেন। আমি তাঁবুতে ঢুকি।

চা খেয়ে আবার ফিরে আসি শেষনাগের তীরে। আজ আর কতক্ষণই বা আছি তার কাছে। একটু বাদেই তো নিতে হবে বিদায়। সহযাত্রীরা তৈরি হচ্ছে। এই অবসরে আরও কিছুক্ষণ বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ অবদান শেষনাগ হ্রদকে দেখা যাক।

আমি দেখি আর ভাবি। কাশ্মীরী ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ জলাশয়, সরোবর। কিন্তু শুধু সরোবর বললে শেষনাগ সম্পর্কে অনেক কথাই না-বলা থেকে যায়।

মনে পড়ছে আর্থার নেভের কথা। তিনি লিখেছেন 'It is a large sheet of water, of an emerald green colour on bright days, and is covered till June with ice . curiously contored peaks rise to the south, and beyond them splendid Kohinoor mountain.'

মনে পড়ছে স্বামী অভেদানন্দের কথা। তিনি বলেছেন—'দুই পার্শ্বে চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা।...হ্রদটির দৃশ্য উপরের পথ হইতে এরূপ সুন্দর দেখায় যে, ইহাকে স্বর্গের অপ্সরাদের স্নানের স্থান বলিয়া ভ্রম হয়।...হ্রদের উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ।...এই হ্রদের দক্ষিণে কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গের পশ্চাতে বিখ্যাত কোহিনুর পর্বতটি সুন্দর দেখাইতেছে।'

শেষনাগের দিকে তাকিয়ে আজ আমার প্রবোধদার কথাও মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, 'শেষনাগ এলো। হঠাৎ যেন খুলে গেল দিগন্তের পূর্বদ্বার। পশুরাজ সিংহ যেন বসে আছে পূর্বদিগন্ত জুড়ে। সমগ্র দেহে ধবল তুষার শোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিস্তৃত, এত ব্যাপক তার পটভূমি যে সেই হ্রদের আয়তন ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল...'।

সেই পটভূমির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। আমি ভাগ্যবান। পণ্ডিত নেহেরু যেখানে আসতে পারেন নি, সেইখানে আমি এসেছি। আমি পুলকিত

বিস্মিত ও বিভ্রান্ত। আমি ভাষাহীন, আমি আত্মহারা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়াল নেই। হঠাৎ কানে আসে, "ঘোষদা, ব্রেক-ফাস্ট এসে গিয়েছে। খেতে চলুন।"

তাকিয়ে দেখি ভাগনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। একটু লজ্জা পাই। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। আবহাওয়া খুবই ভাল। মেঘমুক্ত নীলাকাশ। তবু হিমালয়ের খেয়ালী প্রকৃতিকে বিশ্বাস নেই। আজও ৮ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে, পেরুতে হবে ১৪,৫০০ ফুট উঁচু মহাগুণাস (মহাগুণেশ) গিরিবর্ত্ম। তার পরে পৌষপাখর কেলনাড় ও নাগ্‌গরথাঁ ছাড়িয়ে পঞ্চতরণী।

অতএব এবারে শেষনাগের কাছ থেকে নিতে হবে বিদায়। এ বিদায় চিরবিদায় নয়, আগামীকাল বিকেলে আবার আমি ফিবে আসব তার কাছে।

আবার দেখা হবে—এই আশাতেই বুক বেঁধে, শেষনাগ আমি এখন বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। আশীর্বাদ করো, আমরা যেন অমরনাথজীকে দর্শন করে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারি তোমার কাছে, নিরাপদে ফিরতে পারি ঘরে। আমার গৌতমকে যেন গিয়ে ভাল দেখতে পাই!

ভাগনের সঙ্গে নেমে চলি নিচে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগনে বলে, "চমৎকার আবহাওয়া। আমাদের ভাগ্য খুবই ভাল। আপনি ভাগ্যবান লেখক। আপনার আগে আর কোন বাংলা লেখক এখানে এত ভাল আবহাওয়া পান নি, অন্তত তাঁদের লেখা পড়ে তো তাই মনে হয়।"

একবার চুপ করে ভাগনে। কিন্তু আমাকে নীরব দেখে আবার বলতে থাকে, "আপনার পূর্ববর্তী লেখকরা প্রায় প্রত্যেকেই এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর ১৯২৮ সালের সেই দুর্ঘটনার কথা তো ভাবাই যায় না।"

সত্যই তাই। সেকথা ভাবলে আজও শিউরে উঠতে হয়। সেবারেও বহু যাত্রী যাত্রায় এসেছিলেন। আমাদের মতোই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন বায়ুযানের এই রমণীয় উপত্যকায়। কিন্তু তাঁদের অনেকেই শেষনাগের মায়া কাটাতে পারেন নি। অতর্কিতে প্রকাণ্ড একটা তুষারধ্বস নেমে এসেছিল তাঁদের ওপরে। ছ'শ' মানুষ বরফের তলায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পালাতে গিয়ে এবং ঠাণ্ডায় জমে মারা গিয়েছেন আরও কয়েক শ'।

সেদিনের সেই মৃত্যুপুরী আর আজকের এই শ্যামল সুন্দর রমণীয় উপত্যকা—একই জায়গা, ভাবা যায় না। ভাবার দরকারই বা কি? বায়ুযান যখন বরণ করেছে আমাদের, রমণীয় প্রকৃতি যখন অভিনন্দিত করেছে আমাদের, তখন

সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা কেন স্মরণ করব? বরং বলব, আমরা ভাগ্যবান। প্রকৃতি আমাদের করুণা করেছেন। ভাগ্যবান সেই শহীদরাও। তাঁরা দেবতাত্মা-হিমালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছেন। তাঁদের অমর আত্মার প্রতি প্রণাম জানাই।

ব্রেক-ফাস্ট সেরে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ফকিরবাবুর লোকজন ঘোড়াওয়ালাদের মালপত্র দিচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে।

তুলতুলের বাবার ঘোড়া ও মায়ের ডাণ্ডি এসে গিয়েছে। তাঁরা রওনা হলেন। রওনা হলেন আরও অনেকে। রওনা হয়ে গিয়েছেনও কেউ কেউ। তবে অশ্বারোহীদের কয়েকজন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। তাঁদের ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

গতকাল এখানে পৌঁছবার পরে যথারীতি ঘোড়াগুলোকে ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকটা ঘোড়াকে খুঁজে পাওয়া যায় নি এখনও। সবচেয়ে দুঃখের কথা দুটি ঘোড়া মারা গিয়েছে।

বায়ুযানের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে 'জহরীল' নামে এক প্রকার বিষাক্ত তৃণ জন্মায়। ঘাসের সঙ্গে মিশে থাকে জহরীল। প্রতিবছর যাত্রার সময় সেই ঘাস খেয়ে বহু ঘোড়া মারা যায়। এ ঘোড়াদুটিও বিষাক্ত ঘাস খেয়ে মারা গিয়েছে।

দরিদ্র হিমালয়বাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ঘোড়া। যাদের জমি নেই, তাদের রোজগারের একমাত্র হাতিয়ার ঘোড়া। ঘোড়া মারা যাওয়া মানে সর্বস্বান্ত হওয়া। মৃত ঘোড়ার মালিক তাই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা, তার চোখের জল আমার অশ্বারোহী সহযাত্রিণীদের মন ভেজাতে পারছে না। তাঁরা নিজেদের চিন্তায় আকুল। প্রকাশ্যেই বলছেন, 'মরার ঘোড়া আর মরার সময় পাইল না। আমরা এখন কেম্নে অমরনাথ যাই?'

ফকিরবাবু শান্ত মানুষ। রওনা হবার পরের থেকে তাঁকে কখনও রেগে যেতে দেখি নি। কিন্তু অশ্বারোহিণীদের স্বার্থপরতা তিনিও বরদাস্ত করতে পারলেন না। একটু কর্কশ কণ্ঠে ভদ্রমহিলাদের বললেন, "আপনারা তাঁবুতে গিয়ে বসুন। অন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"কখন আর দেবেন? এদিকে যে আমাগো দেরি হইয়া যাইতে আছে।"

"দেরি হলেও করার কিছু নেই। যখন ঘোড়া পাওয়া যাবে, তখন রওনা হবেন। এখন তাঁবুতে গিয়ে বসুন।"

এবারে বোধহয় ফকিরবাবুর কণ্ঠস্বরের ঝাঁজ ধরা পড়ে তাঁদের কানে। তাঁরা তাঁবুতে গিয়ে ঢোকেন।

একটু বাদে ফকিরবাবু আবার কথা বলেন। এখন তাঁর স্বরে সেই ঝাঁজ নেই। তিনি ঘোড়াওয়ালাকে দেখিয়ে শান্ত স্বরে সবাইকে বলেন, "এরা বড় গরীব। এমনিতেই উপোস করে। তার ওপরে দুটো ঘোড়াই মরে গিয়েছে। এর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। তবু আমি কিছু টাকা দিচ্ছি। আপনারাও যদি সাধ্যমত একে দু-চারটে করে টাকা সাহায্য করেন, তাহলে কিছু ক্ষতিপূরণ হয়।"

বলা বাহুল্য সহযাত্রীরা সবাই ফকিরবাবুর আবেদনে সাড়া দিলেন না। তবে যাঁরা দিলেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। আর তাতেই ঘোড়াওয়ালার কান্না থেমে গেল। সে বার বার হাতজোড় করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকল।

॥ বারো ॥

শুরু হল যাত্রা। আজ আমাদের পদযাত্রার তৃতীয়দিন।

বাজার ও তাঁবুর কলোনী ছাড়িয়ে সামান্য উৎরাই পথে আমরা চলেছি এগিয়ে। আমরা মানে কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর পদাতিক বাহিনী। আজ আরও দু'জন ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছেন। আর মায়া আমাদের সঙ্গে চলেছে। তার মানে এখন আমরা ষোলজন। তুলতুল অবশ্য বলছে আজও সে অন্তত দশজনকে ঘোড়া থেকে নামাবে।

পথের দু-পাশে সংকীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকার দু-পাশে পাহাড়ের প্রাচীর। বাঁ-পাশের পাহাড়টা আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছে। ডানদিকের পাহাড়টা মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—সেই ছোট নদীটার ওপারে। নদীটা এসেছে মহাগুণাস গিরিবর্ত্ম থেকে। গিয়ে পড়েছে শেষনাগে। এরই তীর দিয়ে পুণ্যার্থীরা শেষনাগের তীরে যান। আর এখন আমরা তার তীরপথ ধরে শেষনাগ থেকে মহাগুণাসে চলেছি।

বাঁদিকের পাহাড়টা একেবারে পথের পাশে এসে হাজির হয়েছে। তাই পথটা বাঁক নিয়েছে ডাইনে। একটা কাঠের সাঁকো পেরিয়ে নদীর অপর পারে এলাম। তারপরে আবার এগিয়ে চললাম সামনে।

বস্তুত পক্ষে বায়ুযান উপত্যকাটি শেষ হল এখানে। শুরু হল চড়াই। পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথ। বাঁয়ে নদী, ডাইনে পাহাড়। আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি! শুধু আমরা নয়, সবাই। পেছন ফিরে নিচের দিকে তাকাই—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। পদাতিক ও অশ্বারোহীদের আঁকাবাঁকা শোভাযাত্রা। তাঁবুর কলোনী পর্যন্ত প্রসারিত। তারপরে শেষনাগ।

না, শেষনাগকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তাকে অনুভব করা যাচ্ছে। শুধু আজ নয়, চিরদিন। আমরণ শেষনাগ আমার অনুভূতিতে দৃশ্যমান হয়ে রইবে।

পথের পাশে একটা সাইনবোর্ড—

'Holy Cave	11	Miles
Panchtarni	7	„
Pahalgam	19	„
Srinagar	78	„

তার মানে প্রায় এক মাইল হেঁটেছি। আরও সাত মাইল হাঁটতে হবে। আজ আমরা পঞ্চতরণী চলেছি। পঞ্চতরণী এপথের শেষ শিবির।

এখনও রোদের পরশ পাই নি। পাবো কেমন করে? সবে তো আটটা বাজে। তবে দূরে রোদ দেখা যাচ্ছে। উচ্চ-হিমালয়ে রোদের আরেক নাম জীবন। ওখানে জীবনের উষ্ণতা, এখানে মৃত্যুর শীতলতা। অতএব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

সেই খোঁড়া ভদ্রলোক পিঠে বোঝা নিয়ে ক্রাচ্-এ ভর করে এগিয়ে আসছেন। তিনি কাছে এলেন। আজও বলে উঠলেন—"জয় বাবা অমরনাথ!"

"জয়!" আমরাও জয়ধ্বনি করি।

তিনি একবার একটু থামেন। ক্রাচ্-এ ভর করে দাঁড়ান। একখানি হাত কপালে ঠেকিয়ে আমাদের নমস্কার করেন। তারপরে হাসিমুখে এগিয়ে চলেন সামনে। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়। গায়ের রংটি কালো হলেও ভদ্রলোক বেশ সুশ্রী। মুখে খোঁচা খোঁচা কাচাপাকা দাড়ি। তাতে তাঁর মুখখানি আরও সরল এবং নিষ্পাপ হয়ে উঠেছে।

তাঁর একখানি পা, আমাদের দুখানি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ক্রমেই আমাদের দূরত্ব বাড়ছে। তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, আমরা পেছিয়ে পড়ছি। কি করব? হিমালয়ের পথে পথিককে পরিচালনা করে যে মন, ওঁর সেই মন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি রোদে। প্রভাতী সূর্যের সোনালী পরশ ভারী মিঠে লাগছে। আমরা রোদে স্নান করতে করতে চলেছি এগিয়ে।

নদীটা তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ওপারে নদীর গা ঘেষে খাড়া পাহাড়। এপাশে পাহাড়টা একটু দূরে। নদী আর পাহাড়ের মাঝখানে পথ—অমরতীর্থের পথ। ওপারে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে তুষার প্রবাহ—হিমবাহ। কোথাও কোথাও গ্রাবরেখা। এপারের পাহাড়ে বরফ প্রায় নেই বললেই চলে, শুধুই পাথর আর মাটি। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে রঙীন ফুল। তারা বাতাসে দুলছে। ফুলের দোলা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি।

একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। বেশ কিছুক্ষণ একটানা চড়াই পেরোতে হচ্ছে। সকলেই শ্রান্ত। কিন্তু পথের পাশে প্রথম বসে পড়লেন সরকারদা। আমরাও অনুসরণ করি তাঁকে।

ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। হিমালয়ের হিমেল হাওয়া প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং সরকারদা কয়েক মিনিট বাদেই আবার উঠে দাঁড়ান। আমাদের

দিকে একবার তাকিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন। এবারেও আমরা অনুসরণ করি তাঁকে।

কেবল কঠিন নয়, পথ খানিকটা দুর্গমও বটে। পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে এখানে-ওখানে অবিরত জল পড়ছে। কোথাও কাদা, কোথাও পেছল। কখনও কয়েক পা নিচে নামছি, আবার কখনও অনেকটা করে ওপরে উঠছি। অতি সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলতে হচ্ছে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা এখন আর ফুলদলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, তারা গিয়েছে হারিয়ে। না হারিয়ে উপায় কি? পথের পাশের পাহাড়গুলো যে প্রায় সবাই ন্যাড়া—রুক্ষ পাথুরে পাহাড়। কাঁটাগাছ পর্যন্ত জন্মাতে পারে নি।

আমরা ফকিরবাবু মেহমান। থাকা-খাওয়ার দুশ্চিন্তা নেই আমাদের। যাঁরা আমাদের মতো ভাগ্যবান নন, অর্থাৎ নিজেরাই দল বেঁধে যাত্রায় এসেছেন, তাঁদের অনেকেই যথাসাধ্য জুনিপারের গাছ বয়ে নিয়ে চলেছেন। পথ চলতে চলতে পথের পাশ থেকে তুলে নিয়েছেন।

জুনিপার উচ্চ-হিমালয়ের একপ্রকার ছোট-ছোট জংলী গাছ। পাতায় ধূপের মৃদু সৌরভ। তাই পাহাড়ীরা বলে ধূপ গাছ। তুষারপাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রকৃতি উচ্চ-হিমালয়ে গাছপালার পাতাকে প্রচুর পরিমাণে তৈলাক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। জুনিপারের পাতায় তেলের ভাগটা খুবই বেশি। তাই জুনিপার কাঁচা অবস্থাতেও বেশ ভাল জ্বলে।

যাত্রীরা জুনিপার নিয়ে চলেছেন। কারণ তাঁরা শুনেছেন, পঞ্চতরণী বৃক্ষ-লতাহীন রুক্ষ প্রান্তর। সেখানে জ্বালানীর বিশেষ অভাব।

শেষনাগের সেই নদীটা এখনও ডাইনে রয়েছে, কখনও কাছে আসছে কখনও বা দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু সর্বদা রয়েছি তার সঙ্গে সঙ্গে। না থেকে উপায় নেই যে! শেষনাগের এই সুন্দরী, স্রোতস্বিনী আমাদের পৌঁছে দেবে মহাগুণাস গিরিবর্ত্মে।

পথের পাশে আবার সাইনবোর্ড। এটি দেখলেই খুশি হয়ে উঠি। কারণ সাইনবোর্ড মানেই আরেক মাইল পথ কমে গেল। এটিতে লেখা রয়েছে—

'Holy Cave 10 Miles
Panchtarni 6 "

অতএব আমরা শেষনাগ থেকে দু-মাইল পথ এসেছি। দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে। চড়াই পথ হলেও এত সময় লাগা উচিত ছিল না। কিন্তু কি করব? সহযাত্রীদের অধিকাংশ অনভিজ্ঞ, তার ওপরে সরকারদা আজ ভাল হাঁটতে পারছেন না।

আস্তে চলার আরও কারণ রয়েছে। আমরা যে চারিদিক দেখতে দেখতে পথ চলেছি। সহযাত্রীরা গতকালের মতোই উদাস হয়ে পড়েছেন। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। বেশ চড়া রোদ উঠেছে। কিন্তু গরম লাগছে না। লাগবে কেমন করে? সেই হিমেল হাওয়াটা যে এখনও রয়ে গিয়েছে।

উদাস হবার মতোই বটে। চড়াই পথ বেয়ে আমরা একটি প্রায় সমতল সংকীর্ণ ও সবুজ উপত্যকায় উপনীত হয়েছি। চারিপাশ পাহাড়ে ঘেরা রমণীয় অধিত্যকা। নদীটা পাশের পাহাড়ের পরোপারে পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে এই রমণীয় উপত্যকার কোন ক্ষতি হয় নি। এখানে যে একটি চমৎকার ঝরণা রয়েছে। উপত্যকার বুক বেয়ে সে কলকল ছলছল করে ছুটে চলেছে।

একজন মধ্যবয়সী মহিলা ঝরণার তীরে চোখ বুজে বসে রয়েছেন। পাশে একখানি বাংলা শিবপুরাণ। ভদ্রমহিলা ধ্যান করছেন কি?

করতেই পারেন। ধ্যান করার উপযুক্ত স্থানই বটে। প্রকৃতির এমন অনন্ত ও অপরূপ পরিবেশেই তো জীবাত্মার পরমাত্মায় বিলীন হওয়া সহজ।

ঝরণার মিঠে জল পান করে তেষ্টা মেটাই। তারপরে শুরু করি পথ চলা।

আবার চড়াই পথ। গৌরীর ঘোড়াওয়ালা জানায়—এই জায়গাটার নামই আষাঢ়ঢাকি।

বেলা দশটা। ইতিমধ্যে উঠে এসেছি অনেক ওপরে। এখান থেকে পেছনে ফেলে আসা পথ ও প্রান্তরকে ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে।

"একটু বসবে নাকি?" সরকারদা আবার বলেন। তাঁর শরীরটা আজ সুবিধের নয়।

"বসলে তো ভালই হয়।" ব্রহ্মচারী বলে ওঠে মাঝখান থেকে।

"কেন তোমারও কি আবার শরীর খারাপ হল নাকি?" অসীম জিজ্ঞেস করে।

"না।" ব্রহ্মচারী উত্তর দেয়। "বসলে একটু ভাল করে নিচের উপত্যকাটি দেখা যেতো।"

অতএব বসতে হয়। বসে বসে নিচের উপত্যকাটি দেখতে থাকি। সহসা সুর করে ব্রহ্মচারী বলে ওঠে,

> "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥"

থামে ব্রহ্মচারী। আমরা ওর দিকে তাকাই। সে নিজের থেকেই বলতে থাকে, "মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এই শ্লোকটি রয়েছে। এখানে রাজা আপন মনে বলছেন—রমণীয় বস্তু দর্শন ও মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকও উদাসী হয়ে পড়ে। হৃদয়ের অতি গভীরে নিবদ্ধ জন্মান্তরের কোন প্রিয় স্মৃতি যেন আপনা থেকেই তার মনে জেগে ওঠে।"

শুরু করি পথচলা। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই আবার থামতে হয়। আমরা আরেকখণ্ড প্রায় সমতল প্রান্তরে উঠে এসেছি। তবে আগের সমতলের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। এটি উপত্যকা নয়, অনেকটা গিরিবর্ত্মের মতো।

তুলতুল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, "চড়াইটা কি ফুরিয়ে গেল?" তার কণ্ঠস্বরে আন্তরিক প্রত্যাশা।

তাহলেও তাকে মনের মতো উত্তর দিতে পারি না। শুধু বলি, "সামনের ঐ সাইনবোর্ডটার কাছে গেলেই বুঝতে পারা যাবে।"

"সাইনবোর্ড! আরে তাই তো! চলুন তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক্।"

না, তুলতুলের অনুমান মিথ্যে নয়। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—

'Mahagunas top
Ht. 14,500 ft.
You are at the highest
point on this route.'

শুধু এ পথের নয়। ভারতের আর কোন গিরিতীর্থে যেতে এত উঁচু গিরিপথ পেরোতে হয় না।

"হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুলতুল মাটিতে বসে পড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, "বাঁচা গেল, আজ আর চড়াই ভাঙতে হবে না।"

স্বস্তি তার একার নয়, আমরাও আশ্বস্ত। সুতরাং সবাই বসে পড়ি। বসে বসে মহাগুণাস শিখরের সৌন্দর্য দেখতে থাকি। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র বর্ণের পাথর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো রঙের বিরাট একখানি মসৃণ পাথর। মনে হচ্ছে তুষারপাতের পরেও এর মাথাটি জেগে থাকে বরফের ওপর। এবং মসৃণতার জন্য সেখানে তেমন বরফ পড়তে পারে না। ফলে সীমাহীন সাদার মাঝে কালোরূপে গিরিবর্ত্মের নিশানা হয়ে থাকে এই পাথরখানি। আর এটি কেবল এই গিরিবর্ত্মের বৈশিষ্ট্য নয়, হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেক গিরিবর্ত্মে

পথিকের প্রয়োজনে প্রকৃতি এমনি ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ভক্তরা অবশ্য বলেন, এখানি সাধারণ পাথর নয়—শিলারূপী জনৈক প্রকৃতি প্রেমিক সন্ন্যাসী। আর তাই প্রকৃতি সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতেও ফুল ফুটিয়েছেন—সন্ন্যাসীকে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছেন।

সেই কথাই জিজ্ঞেস করে অশোক। পরিতোষবাবু উত্তর দেন, "আপনি ঠিকই শুনেছেন সে সত্যযুগের কথা। একজন সত্যান্বেষী সন্ন্যাসী এলেন এখানে, অমরনাথের যাত্রায়। কিন্তু তিনি বাবা অমরনাথকে দর্শন করতে পারলেন না।"

"কেন?" গৌরী প্রশ্ন করে।

পরিতোষবাবু জবাব দেন, "তার যে আর যাওয়াই হল না এখান থেকে। প্রকৃতিপ্রেমিক সন্ন্যাসী ওখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অপরূপ রূপসুধা পান করতে থাকলেন। দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর, বছর থেকে যুগ কেটে গেল। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হল, কিন্তু তার রূপতৃষা মিটল না—আজও মেটে নি। ইতিমধ্যে কেবল তাঁর রক্ত-মাংসের দেহটা প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে।"

একবার একটু থামেন পরিতোষবাবু। তারপরে আবার বলেন, "এই পাথরখানি সেই সৌন্দর্যপাগল ঋষি। আজও তিনি মহাগুণাসের সৌন্দর্য দর্শন করে চলেছেন।"

চুপ করলেন পরিতোষবাবু। সঙ্গীরা সবাই নীরব।

মনে পড়ছে প্রবোধদার সেই কথাগুলো। তিনি এই পাথরখানির বর্ণনা প্রসঙ্গে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' লিখেছেন, 'পথের বাঁদিকে একটু পাশে সেই ঋষির আয়তন পাহাড়ের সঙ্গে মিশে একাকী দাঁড়িয়ে। আমরা স্তব্ধ, বিমূঢ়।··· আমরা যেন অনেকটা মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেই আয়তনকে এককালের ঋষি বলে ভাবতে লাগলুম। বিচিত্র বর্ণের পাথরে, নানা রঙের ফুলে ও লতায় গুল্মে ও শিকড়ে এবং পরিশেষে মানব-অবয়বের কল্পনায় দৃশ্যটা অভিনব সন্দেহ নেই।'

আমরাও অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি পাথরখানির দিকে। একটু বাদে নীরবতার অবসান করি। বলি, "স্থানীয় লোকদের ধারণা এই পাথরখানি অমরতীর্থের দ্বারী। তাঁরা মহাগুণাসকে বলেন নগরপাল! তাই এখানে এসে তাঁর অনুমতি নিয়ে অমরলোকে প্রবেশ করতে হয়। আসুন আমরাও প্রণাম করি সেই মহর্ষিকে। পথের নিরাপত্তার জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁকে বলি—তুমি আমাদের কৃপা করো। আমরা যেন অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ দর্শন করে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে যেতে পারি।"

ভাগনে ও অসিতের ছবি তোলা শেষ হল। আমরা উঠে দাঁড়াই। এবারে রওনা হতে হবে। এখনও পাঁচ মাইল পথ বাকি। তবে আজকের মতো কষ্টকর পথ শেষ হয়েছে। তিন মাইলে দু'হাজার ফুট চড়াই ভেঙেছি। এবারে উৎরাই। পাঁচ মাইলে তিনহাজার ফুট উৎরাই পেরোতে হবে। পঞ্চ-তরণীর উচ্চতা ১১,৫০০ ফুট।

রওনা দিতে গিয়ে বাধা পাই। সামনের তিনটি শৃঙ্গ দেখিয়ে তুলতুলের ঘোড়াওয়ালা বলে, "ওঁরা হচ্ছেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আর ঐ দেখুন শিবের জটা থেকে মা-গঙ্গা অবতরণ করছেন।"

লোকটি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলছে। তবু ওর ভাষা ও কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হই। সে মুসলমান কিন্তু কথাগুলো বলল শ্রদ্ধাভরা স্বরে।

তাকাই শৃঙ্গ তিনটির দিকে। আমরা নীরবে দর্শন করি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে। কিন্তু নীরব থাকে না ব্রহ্মচারী। সে বলে ওঠে,

"নাদোপাসানয়া দেবাঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
ভবন্ত্যপাসিতাঃ নূনং যস্মাদেতে তদাত্মকাঃ॥"

"শ্লোক তো শুনলাম।" ব্রহ্মচারী থামতেই অসীম বলে, "কিন্তু বামুনের ছেলে হয়েও স্বীকার করছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। অতএব হে পণ্ডিত! অর্থম্ পরিবেশনং কুরু।"

অসীমের ভাষা ও ভঙ্গিতে সবাই হেসে ওঠে।

হাসি থামলে ব্রহ্মচারী বলে, "এটি নাদব্রহ্ম প্রসঙ্গে সঙ্গীত রত্নাকরের শ্লোক।"

"তা তো বুঝলাম, অর্থটা কি?"

"এই শ্লোকে বলা হয়েছে", ব্রহ্মচারী বলতে থাকে, "নাদ-সাধনার ফলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাদাত্মক ও সকলের আরাধ্য হয়ে উঠেছেন।"

অসীম কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পেরে ওঠে না। হঠাৎ একটা সমবেত সঙ্গীত শুনতে পাই। কারা যেন গাইছেন—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!'...

তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি, দেখতে পাই ওঁদের। সবার আগে ফকিরবাবু, সবার শেষ মিসেস মণ্ডল মাঝখানে আমার কয়েকজন নারী ও পুরুষ সহযাত্রী। ওঁরা গান গাইতে গাইতে ঘোড়ায় চড়ে চড়াই ভাঙছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে হাত নাড়ছেন আর গাইছেন—

'গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথমাঝ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।...'

ওঁরা কাছে আসেন। ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। ফকিরবাবু অন্যান্য অশ্বারোহীদের এগিয়ে যেতে বলেন। তাঁরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেন।

ভাগনে ও অসিত আবার ক্যামেরা খোলে। ওঁরা আমাদের সঙ্গে ছবি তোলেন। ফকিরবাবু তুলতুলকে বলেন, "আজও আমরা তোমার সঙ্গী হতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি পঞ্চতরণী না পৌঁছতে পারলে, সেখানে আবার খাবার সময় গোলমাল শুরু হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে।" তুলতুল মাথা নাড়ে। বলে, "আমরা ঘোড়া থেকে নামাবার আরও লোক পাবো। এখনও তাঁদের কোমর ব্যথা হয় নি, এইবার শুরু হবে।"

হাসতে হাসতে ফকিরবাবুরা ঘোড়ায় চাপেন। তাঁরা এগিয়ে যান। আমরাও শুরু করি পথ-চলা। পথের পাশে তেমনি পাথব আর টিনের চালা। সরকারী ভাষায়—Shelter Shed. চারটি আশ্রয়-নিবাস আছে এখানে।

যে নদীটির তীরপথ অবলম্বন করে আমরা শেষনাগ থেকে এখানে এসেছি, সেটি সৃষ্ট হয়েছে মহাদেবের জটা থেকে। সুতরাং সে রয়ে গেল এখানে। আমরা বিদায় নিলাম তার কাছ থেকে।

এতক্ষণ সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। তাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবু যেতে হবে। তাই বিদায় বেলায় তার জন্মস্থানটি আরেকবার দেখি —মহেশ্বরের মাথা থেকে তুষার প্রবাহ নেমে এসেছে নিচে, তার গা বেয়ে পাদদেশে নেমেছে। সেই হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে নদীটি।

তাকে বলি—তুমি দুঃখ করো না। আগামীকাল আমরা আবার ফিরে আসব তোমার কাছে। তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো শেষনাগ।

নদী ছাড়া গতি নেই হিমালয়-পথিকের। শেষনাগের নদীটি রয়ে গেল এখানে। সঙ্গী হল আরেকটি নদী—মহাগুণাসের নদী। সে আমাদের নিয়ে যাবে পঞ্চতরণীতে। এতক্ষণ আমরা এসেছি নদী-প্রবাহের বিপরীত দিকে, এবারে নদীটি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রায়-সমতল গিরিবর্ত্মটি শেষ হয়ে গেল, শুরু হল উৎরাই। তবে পথটি মোটেই খাড়া নয়। আমরা ধীরে ধীরে নিচে নামছি। সুন্দর ও সহজ পথ।

তাহলেও তুলতুলের আশা পূর্ণ হয়েছে। উৎরাই দেখে বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী সহযাত্রী ভয় পেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছেন। ওদের মধ্যে রয়েছে অজিত বৌমা ও ডাক্তার ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

আবার সাইনবোর্ড—

'Wavbal Top
Ht. 13.500′ft'

অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যে একহাজার ফুট নেমে এসেছি। এই নামা-ওঠাটাই অমরনাথ পথের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আজ সকালে ১২,৫০০ ফুট থেকে যাত্রা শুরু করে ১৪,৫০০ ফুটে উঠেছি। এবারে নেমে যাবো ১১,৫০০ ফুট উঁচু পঞ্চতরণীতে। আগামীকাল সেখান থেকে যাত্রা করে আবার উঠব ১৩,৫০০ ফুটে—অমরতীর্থ অমরনাথে।

এই ওঠা-নামা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। হিমালয়ের দুর্গমপথে, যেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চড়াই ভাঙতে হয়, সেখানে এটি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ নামা মানেই আবার উঠতে হবে। কিন্তু এরও একটা সুফল আছে। পথ একটানা চড়াই কিংবা উৎরাই হলে পা-দুখানি বিষের টুকরো হয়ে ওঠে, অচল হয়ে পড়ে। আর চড়াই-উৎরাই মেশানো পথ হলে, পা-দু'খানি সচল থাকে।

"মা! মা এসে গিয়েছো?"

"হ্যাঁ বাবা! আমি পায়ে হেঁটে মহাগুণাস পেরিয়েছি।" গৌরী উত্তর দেয়।

তাকিয়ে দেখি পথের পাশে একখানি পাথরের ওপর শুয়ে আছেন তারাপীঠের সেই সাধুবাবা। গতকাল গৌরীর সঙ্গে তিনি অনেকটা পথ চলেছেন।

সাধুবাবা শুয়ে শুয়ে আপেল খাচ্ছেন। গৌরী গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ায়। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "আপনি ভাল আছেন বাবা?"

না, সে প্রশ্নের উত্তর দেন না সাধুবাবা। তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন, "জানো আমার ভাই Press Editor. আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে লিখতে বলব—This bloody State Govt. belongs to the Capitalists."

তীর্থপথ পরিক্রমা করতে করতে হঠাৎ সাধুবাবা সরকারের ওপর কেন ক্ষেপে গেলেন বুঝতে পারছি না? তাঁর সম্পাদক ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই আমাদের। কিন্তু তিনি তাঁর দাদার আদেশ পালন করবেন বলে মনে হচ্ছে না। আর যদি সত্যিই পালন করেন, তাহলেও আমাদের করার কিছু নেই। অতএব গৌরীকে ইশারা করে এগিয়ে চলি।

তেমনি উৎরাই পথ। পথের পাশে আবার সাইনবোর্ড—

'Holy Cave—9 Miles

Panchtarani—5 " '

মহাগুণাস থেকে একমাইল এসেছি। পৌঁচেছি একটুকরো তৃণাচ্ছাদিত সমতলে। জায়গাটি ভারী সুন্দর। মনে হচ্ছে সবুজ গালিচা দিয়ে ঢেকে রেখেছে কেউ। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অসংখ্য ছোট-ছোট রঙিন ফুল। এগিয়ে চলি।

উপত্যকাটির দু-দিকেই পাহাড়। নানা রঙের পাহাড়। কোনটি ঘাসে ছাওয়া সবুজ পাহাড়, কোনটি নিরেট পাথরের কালো কিংবা ধূসর পাহাড়। প্রান্তরের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি রূপোলী ঝরণা।

ঝরণার পাশে পাশে পথ। পথের ধারে সাইনবোর্ড—

'Poshpather (Flower Meadow)

Holy Cave 8 Miles.'

তাহলে এটাই পুষ্পত্রী অর্থাৎ স্থানীয়দের পৌষপাত্থর। এখানকার উচ্চতা ১২,৫০০ ফুট। এখান থেকে অমরতীর্থ ৮ মাইল, অর্থাৎ আমরা আজ চার মাইল হেঁটেছি। আরও চার মাইল হাঁটতে হবে। সাড়ে এগারোটা বাজে, চারঘণ্টায় চার মাইল এসেছি। সবাইকে নিয়ে আসতে হয়েছে। ভালই হেঁটেছি। এবারে একটু বসা যেতে পারে।

এখানেও ছুটি আশ্রয়-নিবাস রয়েছে। কিন্তু ওটা কি? সবারই নজর পড়ে। কিন্তু প্রথম বলেন পরিতোষবাবু, "ওটা কি চায়ের দোকান নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" ভাগনে ভাল করে দেখে নিয়ে বলে।

"তাহলে চলো, গিয়ে বসা যাক ওখানে।" সরকারদা জোরে জোরে পা চালান। গরমপানীয়ের নাম শুনে তাঁর বোধহয় পায়ের ব্যথা সেরে গেল।

দোকানের সামনে আসি। হ্যাঁ চায়ের দোকানই বটে। এখন আমাদের দলটি রীতিমত ভারী। প্রায় পঁচিশজন। তুলতুল কথা রেখেছে—হেঁটে যাবার সুবিধে সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে প্রায় জনদশেক অশ্বারোহীকে পদাতিকে পরিণত করেছে। এবং তাদের মধ্যে অজিত ও বৌমা, মিস্টার ও মিসেস বোস এবং শ্রীযুক্ত শালীবাহন রয়েছেন।

এতগুলো মানুষ, তবু তুলতুল বলে, "আমি চায়ের দাম দেবো।"

"কেন তুমি সবার ছোট বলে?" মামা জিজ্ঞেস করে।

"না। আমি চা খাই না বলে।" তুলতুল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

"কিন্তু তোমার অতিথিদের সম্মানে তোমার এখন একগ্লাস চা খাওয়া উচিত হবে।" অশোক অভিমত দেয়।

"তার মানে তুমি ওর আতিথ্য মেনে নিলে ?" অসীম প্রশ্ন করে।

অশোক একটু ঘাবড়ে যায়। বলে, "না, মানে ও যখন খাওয়াতে চাইছে···"

"তখন আর আমাদের খেতে দোষ কি ?" ব্রহ্মচারী যোগ করে।

চা খেয়ে আবার এগিয়ে চলি উৎরাই পথে। পথের একপাশে পাহাড়, আরেকপাশে পাহাড়ী নদী। নদীর ওপারে আবার পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে। বহু ভেড়া-ছাগল খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছে সেখানে। তারা অক্লেশে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা-নামা করছে।

তুলতুলের বোধহয় ঈর্ষা হচ্ছে ওদের দেখে। সে হঠাৎ বলে ফেলে, "চারটে পা থাকলে আমরাও ওদের মতো ভাল Climber হতে পারতাম।"

"কিন্তু তাহলে যে তোমাকেও সবাই চতুষ্পদ বলত ?"

সবাই আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ওঠে। বেচারী তুলতুল লজ্জা পেয়ে নীরব হয়। সে জোরে জোরে পা ফেলে সবার আগে এগিয়ে যায়। সহাস্যে বলি, "পাহাড়ের দিকে নজর রেখে পথ চ'লো। ভেড়া চড়ছে, তাদের পায়ে লেগে যে-কোন সময় পাথর গড়াতে পারে।"

বেলা সওয়া বারোটা। অনেকটা পথ প্রায় খাড়া নেমে আসতে হয়েছে। কারণ এখুনি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

নদী পেরিয়ে চড়াই পথ—পাথুরে পথ। পাথর বলতে বিরাট বিরাট পাথর—boulders পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার মানে পাশের পাহাড় থেকে তারা নেমে এসেছে পথে। সুতরাং এ-পাহাড়ে ভেড়া না চড়লেও সাবধানে পথ চলতে হয়।

গত দুদিন ধরেই দেখছি ওদের। আজও দেখা হল পথে। ওরা বাঙালী। ছেলেটি যুবক, মা ও স্ত্রীকে নিয়ে অমরনাথে চলেছে। মা খুবই বৃদ্ধা তবু ঘোড়া নেন নি। স্ত্রী চলেছে আগে আগে। মাঝখানে মা, তার পেছনে ছেলে। গত দুদিন যখনই দেখা হয়েছে, শুনেছি ছেলে মাকে পথচলায় উৎসাহ দিচ্ছে। আস্তে আস্তে বলছে—এই তো এসে গিয়েছো, কষ্টের পথ পেরিয়ে এসেছো। আর সামান্যই বাকি।

কিংবা বলছে—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা ? পথ তো এমন কিছু কঠিন নয়। না পারলে বলো, আমি তোমাকে ধরছি।

আজ ছেলে বলছে, "ঘোড়াভাড়ার টাকা না থাকলে কি মানুষ তীর্থে যাবে

না? তোমার চেয়ে বুড়ো, তোমার চেয়ে দুর্বল কত মানুষ বাবা অমরনাথকে দর্শন করে এলেন! তুমিই তো সেই খোঁড়া ভদ্রলোককে আজ সকালে দেখলে, সেই অন্ধ বৃদ্ধকেও ফিরে যেতে দেখলে! তাঁরা যদি পারেন, তুমি কেন পারবে না?"

"পারব না তো আমি বলি নি বাবা!" মা বলেন, "পারব, নিশ্চয়ই পারব। তবে আমি যে বড্ড আস্তে আস্তে চলছি, তোর আর বৌমার অসুবিধে হচ্ছে।"

"না মা!" পুত্রবধূ থেমে পেছন ফেরে। শাশুড়ীকে বলে, "অসুবিধে হবে কেন? আপনি তো আমাদের সঙ্গে সমানে পথ চলেছেন। তাছাড়া হিমালয়ের পথে খুব তাড়াতাড়ি পথ চলার কোন মানে হয় না। দেবলোকে এসেছি, চারিদিক একটু ভাল করে দেখে নিতে হবে তো!"

ছেলে-বউ এমনি কথাবার্তায় ব্যস্ত রেখে বৃদ্ধাকে আস্তে আস্তে নিয়ে চলেছে অমরতীর্থের পথে। মনে মনে পুত্র ও পুত্রবধূকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি।

পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরণা নেমে এসে পাহাড়ী নদীতে মিশেছে। ঝরণার ওপরে কাঠের সাঁকো। পেরিয়ে এলাম।

সরকারদা আজ একেবারেই হাঁটতে পারছেন না। ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছেন। আমাকেও আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে। একটু একটু করে সহযাত্রীদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে আমাদের।

॥ তেরো ॥

শেষ পর্যন্ত ছেলে-বউকে নিয়ে সেই বৃদ্ধাও ছাড়িয়ে গেলেন আমাদের। কি করব? সরকারদার আজ খুবই কষ্ট হচ্ছে পথ চলতে। তবে তিনি মোটেই মনোবল হারিয়ে ফেলেন নি। বরং বারবার আমাকে বলছেন, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য। তুমি এগিয়ে যাও, আমি আস্তে আস্তে ঠিক পৌঁছে যাবো।"

কেমন করে ওঁকে বলি—সহযাত্রীকে ফেলে এগিয়ে যাওয়া হিমালয়-পদযাত্রীর ধর্ম নয়। শুধু জানাই, "সরকারদা, আমি তো পঞ্চতরণীতে অফিস করতে যাচ্ছি না। 'লেট' হবার ভয় যখন নেই, তখন চলুন একসঙ্গেই যাওয়া যাক।"

'Holy Cave—6 Miles
Panchtarni—2 " '

সাইনবোর্ডটায় চোখ পড়তেই সরকারদার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, "তাহলে আর দু-মাইল।"

"হ্যাঁ, মাত্র দু-মাইল।" আমি বলি।

সরকারদা একটু হাসেন। বলেন, "আমার যা 'স্পীড্' তাতে তিনঘণ্টার কমে দু-মাইল যেতে পারব না।"

"না, না। এর পরেই শুনেছি উৎরাই ও সমতল পথ। বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। এখন পৌনে একটা, আমরা দুটো নাগাদ পৌঁছে যাবো।"

সরকারদা কোন প্রতিবাদ করেন না। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেন।

আস্তে আস্তে পথ চলে আমার কিন্তু একটা লাভ হয়েছে। আমি ইচ্ছেমত ডায়েরী লিখতে পারছি। আর তাই দেখে জনৈক অবাঙালী অশ্বারোহী আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন, "Are you counting Yatris?"

কি উত্তর দেব? যাত্রী গুণে আমার কি লাভ? সবিনয়ে শুধু বলি, "না।"

বাঁক ফিরতেই সামনের সব বাধা অপসারিত হল। এতক্ষণ আমরা যে পাহাড়টার ওপরে পথ চলেছি, সেটি শেষ হয়েছে এখানে। অনেক নিচে সবুজ ও ধূসর সমতল। সবুজের বুক জুড়ে সাদা আলপনা—আঁকাবাঁকা কয়েকটি ধারা। পাঁচটি তরঙ্গিণী বিধৌত পঞ্চতরণী।

তারপরে ধূসর উপত্যকা। তার বুক জুড়ে সাদা ও রঙীন তাঁবুর মেলা। উপত্যকার শেষে সাদা ও কালো সারি সারি পাহাড়। জীবনে এমন আশ্চর্য-সুন্দর দৃশ্যের খুব কমই সম্মুখীন হয়েছি।

আবার 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র সেই বর্ণনাটি মনে পড়ছে। প্রবোধদা এই পথের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—'প্রতিঘণ্টায় আবিষ্কার করেছি নতুন দেশ, নতুন জগৎ, নতুন প্রকৃতি। প্রতি মাইল পথ হোলো আমাদের জীবনের এক-একটি পরিচ্ছেদ, এক-একটি ইতিহাস। এত অল্প পথে এমন দুস্তর গিরিলোক আগে আমার দেখা ছিল না।'

আমাদেরও নয়। কিন্তু সেকথা না বলে সরকারদার সঙ্গে এগিয়ে চলি। একটা কাঠের পুল পেরিয়ে নদীর অপর পারে আসি। তারপরেই সোজাসুজি নামতে থাকি পঞ্চতরঙ্গিণী বিধৌত বিচিত্র বর্ণের পঞ্চতরণী উপত্যকায়। আমাদের সঙ্গী নদীটিও এখানে এসে পঞ্চনদীর সঙ্গে মিশে গেল। শুনেছি এই পাঁচটি নদীর নাম—ভীমা, ভগবতী, সরস্বতী, ঢাকা ও বর্গশিখা।

এই পঞ্চনদীর সঙ্গে পাঞ্জাবের কোন সম্পর্ক নেই। এরা অমরগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিন্ধ উপত্যকায় চলে গিয়েছে। সিন্ধ আর সিন্ধু (Indus) এক নয়। সিন্ধ উপত্যকা কাশ্মীরের অন্তর্গত। সোনামার্গ এই উপত্যকায় অবস্থিত।

এপারে পাহাড়ের গা থেকেই সবুজ উপত্যকা। ওপারে সবুজের শেষে খানিকটা উঁচুতে অনেকখানি পাথুরে সমতল। তারপরে পাহাড়। তার মানে উপত্যকাটি দুটি অংশে বিভক্ত—একটি এই ময়দানের মতো ঘাসে ছাওয়া নিচু অংশ, যেখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে পাঁচটি নদী। আরেকটি মালভূমির মতো পাথুরে উঁচু অংশ, যেখানে সারি সারি তাঁবু পড়েছে। পাহাড়ের কোলে নদীর ধারে তাঁবু-নগরীটিকে দেখাচ্ছে চমৎকার।

আমরা সবুজ সমতলে নেমে এলাম। পথটি পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। কোমল মাটি ও ঘাসের ওপর পাথর বিছিয়ে পথ। ডানদিকে সমতলের শেষে পাশাপাশি তিনটি ন্যাড়া পাহাড়। তাদের গা বেয়ে হিমবাহ এসেছে নেমে। সেই হিমবাহ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে পঞ্চতরণীর পঞ্চতরঙ্গিণী। তাদের পেরিয়েই ওপারে যেতে হবে আমাদের।

তীর্থের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে পঞ্চতরঙ্গিণীতে স্নান করতে হয়। আমি পুণ্যার্থী নই, শুধুই দর্শনার্থী। সুতরাং আমি স্নান করব না। তবে এই স্নানের কথা মনে পড়ছে আমার। 'বিশ্বকোষে' পড়েছি—

'যাত্রীরা এইখানে স্নান করে। স্নানের পর বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভূর্জপত্রের বস্ত্র পরে। কেহ কেহ বিবস্ত্র হইয়াই মনের উল্লাসে হর-হর জয়-জয় শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে।'

স্বামীজীও স্নান করেছিলেন এখানে। এ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, 'এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শুষ্ক এবং প্রীতিপ্রদ ছিল। ছাউনীর সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই, একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রীগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এই নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।'

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, 'পঞ্চতরণীর পাঁচটি ধারা পার হয়ে "ভৈরবঘাট" বা "বৈরাগীঘাট" পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত নাতিবৃহৎ মাঠ। এটাই পঞ্চতরণী। এখানে আসতে নদীটিকে পাঁচবার পার হতে হয় বলে জায়গাটার নাম পঞ্চতরণী। দুটি ধারার জল এক হাঁটুর কম। অপরগুলি গভীর ও বেগবতী। কাঠ ও পাথর দিয়ে ধর্মার্থ বিভাগ পুল করে দিয়েছে।'

অভেদানন্দজী বলেছেন, একটি নদীকে পাঁচবার পার হতে হয়। কথাটা একদিক থেকে সত্য কারণ এই পাঁচটি ধারা পরে একটি নদী হয়ে গিয়েছে। তবে এখানে কিন্তু পাঁচটি পৃথক ধারা, অনেকের মতে পাঁচটি নদী।

সে যা-ই হোক, আমরা কাঠ ও পাথরের পুলের ওপর দিয়ে একটির পর একটি নদী পেরিয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকার উঁচু অংশের দিকে চলেছি। এখান থেকেও তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখনও বহুদূর—মাইল দেড়েক তো বটেই। এটা খুবই কষ্টকর। ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চাইছে। আশ্রয় দেখা যাচ্ছে কিন্তু পৌঁছতে পারছি না।

পেরিয়ে এলাম উপত্যকার নিচু অংশ, উঠে এলাম মালভূমি সদৃশ উঁচু অংশে। এতক্ষণ পশ্চিম থেকে পুবে এসেছি, এবারে আবার উত্তরে এগিয়ে চললাম। আমাদের বাঁয়ে নদী, ডাইনে পাহাড়—অনেকটা দূরে।

"ওখানে কি হচ্ছে?" সরকারদা প্রশ্ন করেন, "সিনেমা শুটিং নাকি?"

তাই তো! পথ থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের ধারে মাঠের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছেন দু'জন সুন্দরী যুবতী ও একজন সুদর্শন যুবক। তাঁদের মুখে 'মেক-আপ,' পরনে, 'কস্টিউম্'। তিনজন লোক 'রিফ্লেক্টার' দিয়ে তাঁদের মুখে আলো ফেলছেন। সামনে ক্যামেরা চলছে।

সুতরাং সরকারদার অনুমান মিথ্যে নয়, ফিল্ম শুটিং হচ্ছে। কিন্তু কোন

কাহিনীচিত্রের শুটিং কি? কি ছবি? বাংলা বই? কে পরিচালনা করছেন? কারাই বা অভিনেতা-অভিনেত্রী? এখান থেকে যে চেনা যাচ্ছে না কাউকে!

তাহলেও মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। হিমালয়ের ছবি হচ্ছে। এখানে এসে শুটিং করছেন। মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ জানাই ওঁদের। তারপরে সরকারদাকে বলি, "সিনেমার শুটিং চলেছে। পরে বিস্তারিত জানা যাবে। এখন তাঁবুতে চলুন। দুটো বেজে গিয়েছে, খিদে পেয়েছে।"

"হ্যাঁ, চলো।" সরকারদা বলেন, "আমার জন্যই তোমার এত দেরি হয়ে গেল। একা হেঁটে এলে তুমি অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে পৌঁছতে পারতে।"

"হয়তো পারতাম। কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম পথে লক্ষ্যে পৌঁছনই বড় কথা নয়, সহযাত্রীদের সবাইকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছনই পদযাত্রার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও আপনি যে এই বয়সে পায়ে হেঁটে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছেন, এটাও তো কম কথা নয় সরকারদা!"

ডানদিকে পথের ধারে একটা বেশ বড় পাহাড়। পাহাড় থেকে ঝরণা নেমে এসেছে। কাঠের পুল পেরিয়ে আমরা ঝরণার অপর পারে আসি। আর এখানেই রয়েছে দুটি সাইনবোর্ড। প্রথমটিতে লেখা—

'Holy Cave—4 Miles.'

দ্বিতীয়টিতে— 'Panchtarni
Ht. 11,500 ft.
Holy Cave 4 Miles.'

প্রথমটির পেছনে লেখা—

'Srinagar—85 Miles
Pahalgam—26 " '

"তাহলে ২৬ মাইল হাঁটলাম!" সরকারদা সহাস্যে বলেন।

"শুধু হাঁটলেন নয়, ভারতের দুর্গমতম তীর্থপথের ২৬ মাইল অতিক্রম করলেন।" আমি যোগ করি। মনে মনে ভাবি—আর মাত্র ৭ মাইল। কাল সকালেই পৌঁছব অমরতীর্থে, দর্শন করব অমরনাথজীর তুষারলিঙ্গ। আমার বহুবছরের স্বপ্ন সফল হবে।

এগিয়ে চলেছি তাঁবুনগরীর দিকে। দেড়ঘণ্টা ধরে তাকে দেখছি চোখের সামনে, কিন্তু এখনও পৌঁছতে পারলাম না। পদযাত্রীর পক্ষে এর চেয়ে বড় যন্ত্রণা আর কি হতে পারে?

শুনেছিলাম পঞ্চতরণী বৃক্ষ-লতা শূন্য বন্ধ্যা প্রান্তর। শুধু আমি নই, শুনেছেন

সকলেই। তাই অনেকে পথ থেকে 'জুনিপার' সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখানে এসে দেখছি পঞ্চতরণী মোটেই বন্ধ্যা নয়। ময়দান সদৃশ নিম্ন-উপত্যকায় সবুজ ঘাসের কথা আগেই বলেছি, মালভূমি সদৃশ এই পাথুরে উঁচু অংশেও ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছি। পাশের পাহাড়টিতে তো প্রচুর ঘাস। তাই গুর্জর মেষপালকরা ভেড়া-ছাগল নিয়ে এসেছে এখানে। তারা আসছে বহুকাল ধরে। আক্রামবাট মল্লিকও এসেছিলেন এদেরই মতো। আর তাই আজ আমরা এসেছি এখানে—এই পঞ্চতরণীতে। চলেছি অমরতীর্থে।

শুধু ভেড়া-ছাগল নয়, শেয়ালও রয়েছে দেখছি—হিমালয়ান ফক্স্। হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে আরেকটা ঝোপের আড়ালে ছুটে গেল।

আর রয়েছে পাখি—ছোট-ছোট নানা রঙের পাখি। গাছপালা আছে বলেই ওরা আছে। শীতকালে যখন বরফ পড়ে গাছপালা তলিয়ে যাবে, ওরাও পালিয়ে যাবে এখান থেকে।

অবশেষে পাখির গান শুনতে শুনতে আমরা তাঁবু-নগরীতে প্রবেশ করলাম। বেলা আড়াইটে। অর্থাৎ আট মাইল পথ আসতে সাতঘণ্টা লেগেছে। তা লাগুক গে, সরকারদাকে নিয়ে এসেছি তো!

তাঁবুতে এসে বসি। একটু বিশ্রাম করে জুতো মোজা খুলে ফেলি। বাইরের কল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসি। ওপরের কোন ঝরণা থেকে পাইপ দিয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে।

সুরেন ও মদন খাবার নিয়ে আসে। গরম ভাত ডাল ও তরকারী। মায়া চাটনীর বোতল নিয়ে সঙ্গে এসেছে তদারকি করতে।

এই মেয়েটা সত্যি বিস্ময়কর। দেখতে রোগা, বয়সও বেশি নয়—বছর বাইশ হবে হয়তো। কিন্তু যেমন মিষ্টি ব্যবহার, তেমনি বুদ্ধিমতী। কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। সকালে উঠেই সে যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে নেয়। তারপর কিচেনে গিয়ে ঠাকুরকে ব্রেক-ফাস্ট পরিবেশনে সাহায্য করে। পরিবেশন শেষ হতেই নিজে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। পদযাত্রীদের প্রথম দলে প্রতিদিন শিবিরে পৌঁছয়। আর তখুনি কিচেনে ঢুকে কাজে লেগে যায়। অথচ মায়া প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স-এর কর্মচারী নয়, সে দার্জিলিঙের 'হোটেল কুণ্ডুস'-এ কাজ করে। অতিথি হিসেবেই মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে যাত্রায় এসেছে।

মায়ার কাছ থেকেই জানা গেল ফিল্ম-শুটিং-এর ব্যাপারটা। অমরনাথ নিয়ে একখানি বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে। নাম 'তুষারতীর্থ অমরনাথ।' ছবির

পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনিই কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। ছবিটি প্রযোজনা করছেন তারক বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন—দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। তাঁদেরই আমরা শুটিং করতে দেখে এলাম।

সংবাদটা শুনে খুশি হলাম। হিমালয়ের তীর্থপথকে অবলম্বন করে আরেকখানি বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে এবং ছবি তোলার জন্য পরিচালক, প্রযোজক, কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দুর্গম ও দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র পরে এটি হবে'এ ধরণের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। আমার পক্ষে এটি বিশেষ গৌরবের। কারণ প্রথম প্রচেষ্টাটিকে সার্থক করে তোলার জন্য আমি কিছু সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম।*

আমরা 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র শুটিং করেছি ১৯৭০ সালে। অর্থাৎ হিমালয় নিয়ে আরেকখানি ছবি তৈরি করতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সাত বছর লেগে গেল। তাহলেও 'বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার।' এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলে অমরনাথ এবং হিমালয় আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। সুতরাং এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য প্রভাতবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অমৃতময় অমরনাথের কাছে আমি তাঁদের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের আলোচনা থেমে যায়। হঠাৎ তাঁবুটা নড়ে উঠেছে। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে ক্রমাগত। সবাই সচকিত! ব্যাপার কি? ভূমিকম্প নাকি?

না। ঝড় উঠেছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে শুরু হল মেঘের গর্জন। কাছাকাছি কোথায় যেন একটা বাজ পড়ল।

তাঁবুটা ভীষণ দুলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে জলের ঝাপটা আসছে। তাড়াতাড়ি স্লীপিং ব্যাগ ও কাপড়-চোপড় সরিয়ে আনি। সহযাত্রীরা অনেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছেন। এ যাত্রায় তাঁরা প্রকৃতির এমন রুদ্র-রূপ আর দেখেন নি।

কিন্তু আমার তাঁবুতে কেউ কোন শব্দ করছে না। সবাই চুপচাপ খাটিয়ায় শুয়ে আছে। হয়তো মনে মনে বাবা অমরনাথের নাম জপ করছে কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলছে না।

আর্তনাদ ভেসে আসছে অন্যান্য তাঁবু থেকে। নারীকণ্ঠই কানে আসছে বেশি। তাঁরা তারস্বরে বাবা অমরনাথের করুণা ভিক্ষা করছেন।

বৃষ্টি বাড়ছে, বাতাস বাড়ছে, আর্তনাদ বাড়ছে। কোন মহিলা ক্রন্দন জড়িত

* লেখকের 'গঙ্গা-যমুনার দেশে' বইখানি দ্রষ্টব্য

[illegible] বাবা। আর দুইডা দিন। দুইডা দিন তুমি এই [illegible]। হেয়ার পরে, তুমি যত ইচ্ছা ঝড়-তুফান পাডাইও।

ঠিকই বলেছেন ভদ্রমহিলা। পরশুদিন এসময় আমরা পহেলগাঁয়ে পৌঁছে যাবো। অতএব অমরনাথ দুটো দিন প্রকৃতিকে সংযত করে রাখুন। দুদিন বাদে যত ইচ্ছে ঝড়-তুফান পাঠান। তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। তখনকার যাত্রীদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই।

এই স্বার্থপর উক্তির পরেও অমরনাথ কিন্তু কৃপা করলেন আমাদের। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ঝড় থেমে গেল, বৃষ্টিও বন্ধ হল একটু বাদে।

সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে। শুধু আমরা নই, সবাই। যাঁরা এতক্ষণ তারস্বরে 'ত্রাহি অমরনাথ' বলে আর্তনাদ করছিলেন, তাঁরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন বাইরে। আর এসেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছেন। মিঠে রোদে ভরে গিয়েছে চারিদিক। কে বলবে কয়েক মিনিট আগেও অমন ঝড়ের তাণ্ডব চলেছিল এখানে? বিচিত্র প্রকৃতি! এতকাল হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করছি কিন্তু আজও তার মনের খবর পেলাম না।

সীতাংশু এসে হাজির হয়। সীতাংশু গোপালের মতো কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর আরেকজন ম্যানেজার। সে-ও খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং কর্মঠ যুবক। পরশু রাতে সে তো প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে। একজন ঠাকুর ও দু'জন 'বয়' সহ মালপত্র নিয়ে রাত দশটায় চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সারারাত অশ্বারোহণ করে সকালে শেষনাগ পৌঁচেছে। সেখানে পৌঁছেও বিশ্রামের অবকাশ পায় নি। আমাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থায় লেগে গিয়েছে।

ফকিরবাবু এখানে আরও তিনজন ম্যানেজার নিয়ে এসেছেন—অমিতাভ, কিশলয় ও রাজকুমার। তারাও সবাই কর্মঠ যুবক। কিন্তু তাদের কথা পরে হবে। আগে শোনা যাক সীতাংশু কি সন্দেশ নিয়ে এসেছে।

আমার কাছেই এসে দাঁড়ায় সীতাংশু। বলে, "ন'দা আপনাকে ডাকছেন।"

"কোথায়?"

"তাঁর তাঁবুতে।"

"চলুন।" আমি সীতাংশুর সঙ্গে চলতে থাকি।

"নমস্কার!"

কয়েকজন বাঙালী পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি করছিলেন। তাঁদেরই একজন হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার করেন।

প্রতি নমস্কার করি। ভাল করে দেখি ওঁদের। ওঁরা ছ'জন—দু'জন প্রৌঢ়, চারজন যুবক। কিন্তু আমি তো কাউকে চিনতে পারছি না।

প্রথমে একজন প্রৌঢ় নমস্কার করেছেন আমাকে, তারপরে অন্যরা।

প্রৌঢ় ভদ্রলোককেই প্রশ্ন করি, "আপনারা?"

"কলকাতা থেকে আসছি। এখান থেকে মণিমহেশ যাবো।" প্রৌঢ় উত্তর দেন।

জনৈক যুবক যোগ করে, "তাই গত দু'দিন ধরে সারাপথে আপনাকে খুঁজেছি।"

"পাই নি।" আরেকজন যুবক বলে, "কেন জানেন?"

"কেন?" জিজ্ঞেস করি।

"আপনার এই নীল 'উইণ্ড্প্রুফ'টার জন্যে।"

"মানে!" আমি বিস্মিত।

দ্বিতীয় প্রৌঢ় বলেন, "আমরা আগেই শুনেছিলাম, আপনি কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স-এর সঙ্গে যাত্রায় এসেছেন। তাই চন্দনবাড়িতে আপনার খোঁজ করলাম। কিন্তু আপনি তখন বেরিয়ে পড়েছেন। গোপালবাবু বললেন—আপনার গায়ে হলুদ রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। কাল ও আজ সারা পথে আমরা হলুদ সোয়েটার খুঁজেছি। বহুবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু আপনার গায়ে নীল উইণ্ড্প্রুফ দেখে আর আলাপ করি নি।"

সহাস্যে বলি, "হলুদ সোয়েটার কিন্তু আমার গায়েই আছে।" উইণ্ড্প্রুফের বোতাম খুলে নিচের সোয়েটারটা দেখাই। বলি, "গোপাল ঠিক বলেছে। গতকাল চন্দনবাড়ি থেকে বেরুবার পরেই সোয়েটারের ওপরে উইণ্ড্প্রুফ পরেছি।"

"এবং সেটি আর গা থেকে খোলেন নি।" প্রথম প্রৌঢ় যোগ করেন।

আবার হাস্যরোল।

হাসি থামলে জিজ্ঞেস করি, "তা আজ হলুদ সোয়েটার ছাড়া চিনতে পারলেন কেমন করে?"

"এখানে পৌঁছবার পরে আমরা আর হলুদের ভরসা করি নি। আপনার সহযাত্রীদের শরণ নিয়েছি। তাঁদেরই একজন একটু আগে চিনিয়ে দিলেন আপনাকে।"

প্রস্তাবনার পরে কাজের কথা পাড়েন ওঁরা। বলেন, "আমরা আপনার 'হিমতীর্থ-হিমাচল' পড়েছি। আপনি লিখেছেন অমরনাথ মণিমহেশ রূপে বিরাজ করছেন সেখানে। তিনি এখান থেকেই সেখানে গিয়েছেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

ওঁরা আবার বলেন, "আমরাও এখান থেকে মণিমহেশ যাবো। এ বিষয়ে কিছু খোঁজ-খবর নেবার জন্যই আমরা আপনার দর্শনার্থী।"

"এতো আমার কর্তব্য।" আমি বলি, "কিন্তু এখন মাপ করতে হবে। ফকিরবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে যাচ্ছি। আপনারা তো আজ এখানেই আছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে এক কাজ করুন।"

"কী?"

"একটু কষ্ট করে সন্ধ্যের পরে আমার তাঁবুতে চলে আসুন।"

"বেশ, আসবো।"

"কোন অসুবিধে হবে না তো?"

"না, না। অসুবিধে হবে কেন?" ওঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, "আমরা আপনাদের কাছেই আছি।"

প্রথম প্রৌঢ় যোগ করেন, "আচ্ছা নমস্কার! খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করে। আমরা ভাগ্যবান।"

"আমিও সৌভাগ্যবান।" উত্তর দিই, "আপনারা আমার পাঠক, আপনারা ভালোবাসেন আমাকে। শুধু একটা কথা বলে রাখি—আপনাদের ভালোবাসাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

সীতাংশুর সঙ্গে ফকিরবাবুর তাঁবুতে এসে ঢুকি। এযে দেখছি লোকে-লোকারণ্য। সব কয়খানি খাটিয়া বোঝাই। বলা বাহুল্য সবাই আমার সহযাত্রী। এবং মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

ফকিরবাবুর পাশে এসে বসি। মিসেস মণ্ডল ও মায়া চা পরিবেশন করছে। আমিও এক কাপ পেয়ে যাই। সহাস্যে প্রশ্ন করি, "কাঁর সম্মানে এই চায়ের আসর?"

"আমার।"

ভদ্রমহিলার দিকে তাকাই। আমাদের সামনের খাটিয়ায় দরজার পাশে বসে আছেন তিনি। ভদ্রমহিলা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। তিনি আমাদের সহযাত্রী নন। তবু তাঁকে চেনাচেনা মনে হচ্ছে।

কোথায় দেখেছি?

না। মনে পড়ছে না।

তিনি মৃদু হাসছেন আর মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন।

ফকিরবাবু আমাকে বলেন, "ইনি অভিনেত্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।"

"অর্থাৎ শুভেন্দুর (চট্টোপাধ্যায়) বুড়োদা মানে অভিনেতা তরুণকুমারের…"

"স্ত্রী।"

তাই চেনাচেনা লাগছিল। চিনতে পারছিলাম না কারণ এখন তাঁর গায়ে ওভারকোট মাথায় বালাক্লাভা টুপি।

ভদ্রমহিলাকে নমস্কার করি।

তিনি প্রতি নমস্কার করেন। বলেন, "আমিই কষ্ট দিলাম আপনাকে। ফকিরদার কাছে শুনলাম আপনি এসেছেন। আপনার বইতে এত হিমালয়ের কথা পড়েছি। আজ আমিও হিমালয়ে এসেছি। হিমালয়ে বসে হিমালয়ের লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ সামলাতে পারলাম না।"

"এতে কষ্ট পাবার কি আছে? বরং আপনার মতো একজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম।"

"না না। এ কি বলছেন?" সুব্রতা যেন আমার কথায় একটু লজ্জা পেলেন।

ওঁর বিনম্র ব্যবহার ভাল লাগে আমার। বিনয় কেবল বিদ্বানের ভূষণ নয়, 'কাল্‌চার'-এর পরিচয়ও বটে।

স্বাভাবিক ভাবেই শুটিং-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সুব্রতা বলেন, "আমরা চন্দনবাড়ি ও শেষনাগের শুটিং সেরে এখানে এসেছি। অমরনাথে দু'দিন শুটিং করেছি। এখানকার কাজও আজ শেষ হয়ে গেল। আগামীকাল সকালে রওনা হব পহেলগাঁও। সেখানে কিছু কাজ বাকি আছে।"

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, ছবি করতে হিমালয়ের এমন দুর্গমস্থানে আপনি তো এই প্রথম এলেন?"

সুব্রতা মাথা নাড়েন।

"আর কোন ছবির আউট-ডোর শুটিং-এ নিশ্চয়ই আপনাকে এত কষ্ট পেতে হয়নি?"

সুব্রতা কি যেন একটু ভাবেন। তারপরে বলেন, "দৈহিক কষ্টের বিচারে হয়তো হয় নি। কিন্তু মনের কথা বললে বলতে হয়, সে কষ্টের তুলনায় আনন্দ পেয়েছি অনেক বেশি। এবং এমন অপার্থিব আনন্দলাভের জন্য আমি সারাজীবন হিমালয়ের পথে ও প্রান্তরে শুটিং করতে রাজী আছি।"

॥ চোদ্দ ॥

মণিমহেশ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ওঁরা বিদায় নিলেন। আর ঠিক তখুনি তাঁবুর পর্দা তুলে টর্চ জেলে গৌরী আমাদের তাঁবুতে ঢুকল।

"আরে এসো, এসো! কি খবর?" সরকারদা গৌরীকে স্বাগত জানান।

গৌরী আমার খাটিয়ার এক কোণে বসে পড়ে। বলে, "খবর একটা নিশ্চয়ই আছে। নইলে এই শীতের রাতে কম্বল ছেড়ে এখানে আসব কেন?"

অসীম নিজের একখানি কম্বল তাকে দিয়ে বলে, "এইটে গায়ে দিয়ে নিন।"

ব্রহ্মচারী বলে, "পা তুলে আরাম করে বসুন।"

গৌরী তাদের পরামর্শ মেনে নেয়। আমি ভাবি অন্যকথা—এমন কি খবর, যে এই শীতের রাতে সে এখানে ছুটে এসেছে? কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না! কিসের খবর? কোন দুর্ঘটনা নয় তো?

গৌরী আমাকে বলে, "পহেলগাঁও থেকে মালপত্র নিয়ে ফকিরবাবুর লোক এসেছে। সে একখানি 'ভ্রমণবার্তা' নিয়ে এসেছে।

ভ্রমণবার্তা! আমি বিস্মিত। ভ্রমণবার্তা বর্তমান বাংলাসাহিত্যের একমাত্র ভ্রমণবিষয়ক পাক্ষিক। কিন্তু সে পত্রিকা তো কোন ধনী পত্রিকা গোষ্ঠির ব্যবসা নয়, প্রমোদাদিত্য মল্লিক নামে চুঁচড়ার জনৈক পর্যটনপ্রিয় বেকার যুবকের আদর্শ। সে পত্রিকা পহেলগাঁয়ে আসবে কেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে গৌরী বলে, "মঞ্জু ও প্রণতি হোটেলের ঠিকানায় আমাকে পাঠিয়েছে। তাই ফকিরবাবুর লোক নিয়ে এসেছে।"

মঞ্জুলিকা রায় ও প্রণতি বসাক গতবছর আমাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিল। দুটি মেয়েই শিক্ষয়িত্রী, অবিবাহিতা এবং হিমালয়কে ভালোবাসে। দুজনে খুবই বন্ধুত্ব আর সর্বদা একসঙ্গে থাকে।

"কিন্তু ওরা হঠাৎ তোমাকে ভ্রমণবার্তা পাঠালো কেন, ওরা তো ভ্রমণবার্তার কেউ নয়?"

"ওদের লেখা ছাপা হয়েছে।"

"কি লেখা?"

"বলতাল হয়ে অমরনাথ।"

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। আমরা অমরনাথ যাচ্ছি। মঞ্জু ও প্রণতি তাদের লেখাটি আমাদের পড়ার জন্ত পাঠিয়েছে। তাছাড়া আমারও মঞ্জুদের সঙ্গে আসার কথা ছিল। আর তাই লেখাটি পাওয়া মাত্র গৌরী আমাদের তাঁবুতে ছুটে এসেছে।

"লেখাটা একবার পড়ুন না, শুনি।" ব্রহ্মচারী মোমবাতিটা গৌরীর দিকে এগিয়ে দেয়।

"হ্যাঁ, খাবার আসতে এখনও দেরি আছে। লেখাটা পড়ে ফেল একবার, বল্‌তাল থেকে অমরনাথের পথটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।" সরকারদা যোগ করেন।

"আমি পড়ব?" গৌরী তবু দ্বিধা করে।

অসীম কৃত্রিম ধমক লাগায়, "আপনি নয় তো কে পড়বে আপনার প্রিয়-বান্ধবীদের কাহিনী?"

গৌরী তাড়াতাড়ি পত্রিকাটি খুলে পড়তে শুরু করে—

'হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে ইনট্যুরের সঙ্গে কেদার-বদ্রী ঘুরে আসার পর বিভাস দাসকে বলেছিলাম—যদি কোন একটা গ্রীষ্মের ছুটিতে অমরনাথ যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, আমরা যেতে পারি।

গত মে (১৯৭৭) মাসের প্রথম দিকে খবর এলো—যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চলছে পূর্ণোদ্যমে।

২৯শে মে হাওড়া স্টেশনে এলাম আমরা মোট সাড়ে বারো জন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিভাস দাস, গৌর চন্দ্র ও পাচক নিত্যানন্দ ছাড়া হরপ্রসাদ পাল, তাঁর স্ত্রী রেবা দেবী, তাঁদের সাত বছরের ছেলে পার্থপ্রতিম পাল বা P3, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, গৌরদার মা, রঞ্জিত দত্ত, মালদহ নিবাসী বৃদ্ধ কার্তিকচন্দ্র বর্মন (দাদু) ও আমরা দুজন।

৩১শে মে সকালে নির্দ্ধারিত সময়ের মাত্র এক ঘণ্টা পরে আমরা জম্মুতে নামলাম। বাস ছাড়লো বেলা দশটা নাগাদ। সেই রাতেই পৌঁছলাম শ্রীনগর।

অবশেষে এলো সেই ক্ষণ। ৩রা জুন রাতে জানলাম পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। প্রচণ্ড উত্তেজনা, অস্থিরতা, গোছগাছ শুরু হয়ে গেল—কে কতটা সংক্ষেপ করতে পারে বোঝা। মুখে কেউ কিছু বলছে না, মনে মনে অস্থির সবাই। এখন যাত্রার সময় নয়। মেলা বা ছড়িদারের যাত্রার অনেক আগে আমরা যাব। যে পথে অধিকাংশ লোক যায় সে পথে নয়,

সোনামার্গ হয়ে একটা অপরিচিত পথে। সব মিলিয়েই সন্দেহ, সংশয় হয়ত ভয় —ভয় অনিশ্চয়তার জন্য। সেদিন রাতে খেতে বসে আনন্দদা বলে উঠলেন—কাল থেকে পরীক্ষা শুরু, ফাইন্যাল পরীক্ষা। কথাটা সত্যি। ৩রা জুনের রাত পরীক্ষার আগের রাতের মতোই কাটলো।

৪ঠা জুন রাত শেষ হতে না হতেই সবাই উঠে পড়েছে। আমরা প্রস্তুত। আপাততঃ গন্তব্য বাসে সোনামার্গ। শ্রীনগর থেকে ৮৩ কিঃ মিঃ।

আমরা রওনা হলাম সঙ্গে চলল সেই লাঠি—যা কেদার-বদ্রী, যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখীর পথে আমাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলো। দলের আর সকলেই নতুন করে লাঠি সংগ্রহ করে নিয়েছেন শ্রীনগর থেকে।

বাস ছুটেছে সিন্ধ নদীর ধার ধরে, আমাদের মন ছুটেছে পাহাড় পেরিয়ে আরো দূরে। কিন্তু আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, পারা না পারার সংশয় সঙ্গ ছাড়ছে না। অদম্য উৎসাহ, অসীম ইচ্ছা, দুর্গম পথে হিমবানের আহ্বান—অমরনাথের আকর্ষণ একদিকে, আর একদিকে আত্মীয়-পরিজন, চেনা-অচেনা সকলের বিস্ময়। আমরা কোন কিছুতেই দমে যাই নি। সংশয়কে মনের নিচে চাপা দিয়ে মুখে বলছি—জয় অমরনাথ!

সোনামার্গ পৌঁছলাম প্রায় ১২টা। "প্যাক্ লাঞ্চ" খেয়ে পথের ধারে একটু অপেক্ষা করতে হোল। বলতাল পর্যন্ত যাবার জন্য যদি কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ১৫ কিঃ মিঃ হাঁটার পরিশ্রম কমে যায়। পথও আছে কারণ আজকাল লে পর্যন্ত বাস চলে।

সঙ্গে কুলির সংখ্যা ১৩ জন। প্রথমে ওরা যেতে চায় নি। কম মাল নেবে ও অনেক বেশি টাকা পারিশ্রমিক পাবে এই সর্তে রাজী হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

একটা বাসের ব্যবস্থাও হল। মালপত্র, কুলি ও যাত্রী সকলকে বলতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তার জন্য পুরো বাসের ভাড়া দিতে হবে। ফেরার পথে তো হাঁটতেই হবে—যা পাওয়া যায়। আবার বাসে উঠলাম। সোনামার্গের ট্যুরিষ্ট অফিসার আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। আমাদের অবশ্য তার আগে তাঁকে লিখে দিতে হয়েছে—কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ দায়ী হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলতাল, লে বা লাদাকের পথে একটা ছোট্ট উপত্যকা, জোজিলা গিরিবর্ত্মের ঠিক নিচে। উচ্চতা প্রায় ৯৫০০ ফুট। গাছ বলতে পাইন, আর ইতস্ততঃ ছড়ানো কিছু ভূর্জগাছ। মালপত্রসহ আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল।

তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছে। নদীর বাঁ তীরে একটু সমান জায়গায় পর পর

দুটো তাঁবু পড়ল। স্টোভ জ্বলল, চায়ের জল বসে গেল। এমন সময় একজন মিলিটারী বাঙ্গালী ভদ্রলোক এসে বললেন—কেন আর তাঁবুতে থাকবেন, আমরা একটা ঘর খুলে দেবার ব্যবস্থা করছি, চলে আসুন।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ঘরে এসে উঠলাম, তাঁবু দুটো কুলিদের জন্য রইলো। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে পর্যন্ত ঠাণ্ডা তেমন ছিল না। রাত্ত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পড়তে লাগল। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হট্‌ড্রিঙ্কস পেয়ে আমরা স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে দিলাম।

পরদিন সকালে সূর্যের আলো এসে পড়ল সেই ছোট্ট উপত্যকার ওপর। কুলিরা পিঠে মালপত্র তুলে নিলো। আমাদের পদযাত্রা শুরু হোল। আগের দিনই পথের জন্য যার যার 'ড্রাই র‍্যাশন' খেজুর কিসমিস মিছরী আমসত্ত্ব লজেন্স দেওয়া হয়ে গেছে।

এখান থেকে অমরনাথ গুহা ১৫ কিঃ মিঃ। প্রথম ২ কিঃ মিঃ পথ সমান—জীপের চাকার দাগের পাশ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। তাবপর একটু চড়াই পার হয়ে পাহাড়ের গায়ে পথ ধরলাম। পথ চলার অযোগ্য নয়। কিছুদিন পর যখন পরিষ্কার করা হবে, মিলিটারী যাবে এই পথ দিয়ে মালপত্র যন্ত্রপাতি নিয়ে তীর্থের পথ পরিষ্কার করতে, একমাস ধবে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করতে, তখন এপথ আরো ভালো হবে। অমরনাথের নদী অমরগঙ্গার বাঁ-ধার ধবেই চলেছি। পথের বরফ গলে নেমে গেছে নদীর কাছে, কোথাও বা পথটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। নদীব জলের স্রোত বেশির ভাগই বরফের তলা দিয়ে বইছে। কোথাওবা বিবাট বিরাট গর্ত বরফের মাঝে মাঝে। নদী সেখানে উচ্ছল, চঞ্চল। পথ ধীরে ধীরে ওপবদিকে উঠে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা পাহাড় পড়ছে। সবজায়গায় নিজেরা পার হতে সাহস পাচ্ছি না। দাঁড়িয়ে পড়ছি। বিভাসবাবু ও গৌরদা হাত ধরে পার করে দিচ্ছেন।

কুলিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের সঙ্গে পরিমাণমত দূরত্ব বজায় রেখে পেছনে পেছনে আসছে। পথে দেখা হোল ছ'জন যাত্রীব সঙ্গে। ওঁরা পহেলগাঁও দিয়ে এসেছেন—দর্শন করে এপথ দিয়ে ফিরছেন।

পথ ক্রমশঃ চড়াই হচ্ছে। আমরা মাঝে মাঝে একটু দাঁড়াচ্ছি, হাঁফাচ্ছি, আবার হাঁটছি। নদী অনেক নিচু দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওয়াটার বট্‌লের জল শেষ। নদীর গর্জন শুনছি কানে কিন্তু তাতে তো তৃষ্ণা নিবারণ হয় না।

পথের পাশে বসে পড়েছিলাম, হাঁফাচ্ছি। মনে হোল আর চলতে পারব না। কিন্তু দাদু হাঁটছেন এই বয়সে, মাসীমা হাঁটছেন বাতের ব্যথা নিয়ে, বাচ্চা ছেলে

চড়াই শেষ হয়েছে। নাঃ, এগিয়ে চলি আবার। এগিয়ে যাওয়া সহযাত্রীরা হৈচৈ করে উঠলেন। পালদা চীৎকার করে বললেন—চড়াই-এর শেষ আজকের মতো। এবার নামা।

প্রায় সমতল ঐ জায়গাটার নাম সান্তসিংহ টপ্। একটাও ঝর্ণা নেই কাছাকাছি। তবু দাঁড়ালাম সবাই। একটু বিরতি, দুচারটে ছবি তোলা হোল। কুলির দলের সর্দার গোলাম নবী জানালো—কুলিলোগ থক্ গয়া, ও লোগ চায় পিনে মাঙ্‌তা।

"মাঙ্‌তা" বললেই যদি পাওয়া যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল না। অবশ্য তখন বললে হয়ত অত নিচের থেকেই জল আনতে ছুটতো কেউ না কেউ। আমরা বললাম—আমরা মোটেই ক্লান্ত নই।

ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। এবার পথ কখনো সমান, কখনো নামছে। পথের ধারে ধারে ফুটে আছে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল, জুনিপারের ঝোপে হল্‌দে ফুলের গুচ্ছ। সামনে বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাথাগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। এতক্ষণ দুপাশে জমে থাকা বরফ। এবার তুষারাবৃত অঞ্চলও চোখে পড়ছে। দূরে নিচে বরফে ঢাকা একটা জায়গা দেখিয়ে কুলিরা বলল—ওটাই পঞ্চতরণী।

তার মানে আমরা প্রায় এসে পড়েছি। পথে জায়গায় জায়গায় বরফ রয়েছে। তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়, তবু সন্তর্পণে পার হলাম।

কুলিরা বলে—কয়েকদিন আগেও এ পথ পুরো বরফে ঢাকা ছিলো। অবিশ্বাস করতে পারলাম না কারণ নদীর অপর পারে তখনও পাহাড় থেকে বরফ নেমে নদীর বুক ছুঁয়ে আছে।

একটা ঝর্ণা পেয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ দিয়ে তৃষ্ণা মেটানো হোল।

১১ কিঃ মিঃ পথ পার হয়ে সঙ্গমে এসে পৌছালাম বিকাল ৫টায়। নেমে এলাম অনেকটা তবু নদী রইলো অনেক নিচে। পথটা দেখে মনে হচ্ছিল ফেরার পথে এই চড়াই আবার পার হতে হবে। তবে সে ভাবনা বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ পেলাম না।

চারদিকে জমাট বাঁধা সাদা সাদা কঠিন বরফ। উঁচু নিচু জমি একটু, তারই মাঝে তাঁবুর স্থান পাওয়া গেল। পরপর পাঁচটা তাঁবু পড়ল। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, সবাই ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। বিভাসবাবু বা গৌরদার ক্লান্তি নেই। তাঁরা তাঁবু পাতলেন কুলিদের সহায়তায়। তারপরই চায়ের জল বসল। রাত হতে দেরি আছে—তবু তখনই খিচুড়ি হলো, আমরা খেয়ে নিলাম। আটটা

পর্যন্ত দিনের আলো থাকছে এ অঞ্চলে রাত ৯টা নাগাদ আবার এলো হালুয়া, তারপর বোর্ণভিটা। অনেকেরই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, বোধহয় উচ্চতার জন্য। তাঁবুর দরজা বন্ধ করলাম। কালই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। কলরব থেমে গেল। ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে কুলিদের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। একটা তাঁবু—ওরা সবাই শুতে পারে নি—আগুন জেলে কেউ কেউ বসে আছে। মাঝে একটু বৃষ্টি পড়তেই ওদের কথাবার্তার আওয়াজ বাড়লো। নিস্তব্ধ জনহীন তুষারমণ্ডিত পর্বতমালার মাঝে আমরা ক'টি মানুষ। প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে বাঁচার চেষ্টা করা বৃথা।

৬ই সকালে ঘুম ভাঙ্গল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশ পরিষ্কার। রোদ উঠলেই যাত্রা শুরু হবে। নদীর পুল পার হয়ে সামনের পাহাড়টার মাথায় উঠতে হবে। আঁকাবাঁকা চড়াইপথ দেখা যাচ্ছে। প্রাতঃরাশ শেষ করে আমরা লাঠি নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম।

প্রায় এক কিলোমিটার পাব হয়ে দুটো পথ দেখা গেল। আমরা থামলাম। কুলিরা বলল—আমাদের বাঁদিকে যেতে হবে। পহেলগাঁও দিয়ে চন্দনবাড়ি, শেষনাগ, পঞ্চতরণী হয়ে যে পথ এসেছে, এটি সেই পথ। এতক্ষণ আমরা যে পথে চলছিলাম, সে পথ এখন প্রচলিত পথের সঙ্গে এসে মিশলো। পথে আর অন্য কোন যাত্রী নেই। আমরা চলেছি প্রায় একই সঙ্গে সারি বেঁধে। বেশি চড়াই আর নেই। পথের ওপর বরফ রয়েছে, কঠিন বরফ। এই বরফ কেটে পথ করার জন্য আইস্ এক্স্ কেনা হয়েছিল। ভুলক্রমে তা কলকাতায় ..য় গেছে। তাই আমাদের দলনেতা, পা দিয়ে অথবা লাঠি দিয়ে পথ করছেন, আমরা তারই ওপর দিয়ে পার হচ্ছি।

বরফ গলছে, পথে বেশ কাদা। সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে। ক্রমে পথ আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা তখন পথ ছেড়ে নেমে এলাম অমরগঙ্গার ওপর। পুরো নদীটার ওপরে বরফ জমে আছে—তলায় কঠিন, ওপরে পরিষ্কার ঝকৃঝকে নরম বরফ। চলতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না, তবে প্রতিটি পদক্ষেপেই শরীর দুলে উঠছে। এরই নাম বোধ হয় তুষাররাজ্য। এর আগে এমন পথে চলার অভিজ্ঞতা হয় নি। মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে, আছাড়ও খাচ্ছি। তবে তেমন বড় কিছু নয়। আঘাত লাগার সম্ভাবনা নেই। ভয় শুধু বরফ ভেঙ্গে জলের স্রোতে ভেসে যাবার। কারণ এই বরফের তলা দিয়ে দুর্বার বেগে জল বইছে।

আমরা অবশ্য ঠিক মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি না, একটু একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে,

বাঁ দিকে রেখে চলেছি। মনোযোগটা বেশির ভাগ পায়ের দিকে।

বরফ জমা নদীর পারে পাথর আর মাটি বেরিয়ে পড়েছে। আমরা বসলাম সবাই। একটু খেজুর, কিস্‌মিস্ মুখে দিলাম। সেখান থেকেই প্রথম দেখা গেল বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ে গুহা—নদীর বুক থেকে কিছু ওপরে। আর থেমে থাকা ঠিক হবে না। আবার নামি পথে, বরফ জমা নদীতে।

গুহা সামনে এসে গেছে। নদী ছেড়ে বাঁদিকে উঠতে লাগলাম। একটু চড়াই। তারপর সিঁড়ি—১৬০ খানির মতো। পালদা ও বৌদি আগের দিকে ছিলেন, ওঁরা ঘণ্টা বাজাচ্ছেন—ওঁরা পৌঁছে গেছেন। আমরা যাত্রীদলের পিছে পড়ে গেছি। আমরা কি সবার নিচে, আমাদের কি ঠাঁই হবে না?

জয় অমরনাথ—পৌঁছে গেলাম আমরাও। জনমানব শূন্য গুহায় গুহাধীশ একা ছিলেন। আমাদের উচ্ছ্বাস আর কলরবে মুখর হয়ে উঠলো সেই নির্জন গিরিকন্দর। বাঁদিকের রেলিং-এর গায়ে একটা ফলকে লেখা আছে ইংরাজীতে —"আমরা এখন ১৩,৫০০ ফুট ওপরে অমরনাথ গুহায় রয়েছি।"

রেলিং-এর মাথাটা শুধু জেগে আছে বরফের মধ্যে। গুহায় ডান দিকের কোণে স্বয়ম্ভু সেই তুষারলিঙ্গ শ্রীঅমরনাথ। তারপর ক্রমে বাঁদিকে আরও তিনটি ছোট ছোট লিঙ্গ। বেদীর সবটাই বরফে ঢাকা। লিঙ্গের রঙ দুগ্ধফেনিভ ধবল নয়, ঈষৎ নীলচে, না সবুজাভ? ঠিক বুঝতে পারছি না।

কঠিন অথচ মসৃণ, কোথাও কোন খাঁজ নেই, ভাঁজ নেই। স্পর্শ করলাম। পুরোহিত পূজারী কেউ নেই, নিজেরাই মন্ত্র পড়লাম, যার কাছে যা ছিল, তাই দিয়ে আমরা দিলাম ভক্তি-অর্ঘ্য। সকলের চোখে জল।

জানি না দেবতা কোথায় আছেন—এই স্বয়ম্ভু তুষার লিঙ্গে, পর্বত কন্দরে, হিমালয়ের হিমমণ্ডিত চূড়ায়—কিংবা মানুষের আপন অন্তরে? আমরা সবাই সেই সর্বস্রষ্টা, সর্বনিয়ন্তা, সত্য মঙ্গল প্রেমময় সুন্দরকে প্রণতি জানালাম।'

গৌরীর পাঠ শেষ হয়। সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, "আমি তাহলে এখন আসি। একটু বাদেই রাতের খাবার আসবে।"

"এসো।" আমি বলি, "কাল কিন্তু সকাল-সকাল বেরুতে হবে, মনে আছে তো?"

গৌরী মাথা নাড়ে। সে বেরিয়ে যায় আমাদের তাঁবু থেকে।

রাতের খাবার আসতে এখনও কিছু দেরি আছে। বাইরে বেশ বাতাস বইছে। শীত শীত করছে। ওরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। আমিও স্লিপিং-ব্যাগের জীপ খুলি।

শুয়ে শুয়ে মঞ্জু ও প্রণতির লেখাটার কথাই ভাবতে থাকি। ভেবে চলি বলতাল-অমরনাথ পথের কথা। অমরনাথ দর্শনের জন্য আমাদের ৬০ মাইল হাঁটতে হবে আর ওদের মাত্র ১৮ মাইল হাঁটতে হয়েছে। আমারও ওদের সঙ্গে আসার কথা ছিল। আমিই বিভাসকে বলতালের পথে যাত্রার আয়োজন করতে বলেছিলাম। অথচ শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গী হতে পারি নি।

কি জানি বাবা অমরনাথের বোধহয় ইচ্ছে নয় যে আমি সেই সংক্ষিপ্ত পথে যাত্রা শেষ করি। তাই সেবারে সামান্য কারণে আসা হয় নি আর এবারে গৌতম অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আসা হয়েছে। তবে অমরনাথের আশীর্বাদে সে নিশ্চয়ই এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আমাদের এই পথ অনন্তকালের যাত্রাপথ। এপথ শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দের পথ। যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই পথে অমরনাথ দর্শন করেছেন। হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই পথের ধুলোয় শেষ শয্যা পেতেছেন। সুতরাং বলতালের পথে না এসে ভালই করেছি। তিনি যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

তবে একটা কাজ করা যেতে পারে। এই পথে অমরনাথ এসে বলতালের পথে সোজা শ্রীনগর ফিরে যাওয়া যেতে পারে। তাতে একদিকে যেমন দুটি পথ দেখা যায়, আরেক দিকে তেমনি দুটি দিনও বেঁচে যায়। ঐ পথে ফিরে গেলে আমরা অমরনাথ দর্শন করে আগামীকাল রাতেই শ্রীনগর ফিরে যেতে পারি আর এপথে পহেলগাঁও হয়ে শ্রীনগর যেতে আরও তিন দিন লেগে যাবে।

সেদিন রাতে পঞ্চতরণীর তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে যখন এসব কথা ভাবছিলাম, তখন একবারও মনে পড়ে নি কালিদাসবাবুর কথা। কিন্তু আজ একবছর পরে পঞ্চতরণীর সেই রাতের প্রসঙ্গে আমার বারবার মনে পড়ছে হিমালয়-প্রেমিক বন্ধুবর কালিদাস রায় গোষ্ঠীপতির কথা। মনে পড়ছে কারণ তিনিও এই পথে অমরনাথ দর্শন করে বলতালের পথে তাড়াতাড়ি শ্রীনগর ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। পারেন নি। কালিদাসবাবু ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী সুজাতাদেবী অমরনাথের পথে চিরবিশ্রাম নিচ্ছেন।

কালিদাসবাবু বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু উৎসাহ ও কর্মশক্তিতে তিনি ছিলেন চিরনবীন। ভারতের প্রথম বে-সরকারী পর্বতারোহণ সংস্থা হিমালয়ান এসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এসোসিয়েশন অফিসেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর উৎসাহ কর্মকুশলতা স্পষ্টবাদিতা এবং হিমালয়-প্রেম প্রথম থেকেই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তিনি প্রায় প্রতিবছর হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করেছেন। ১৯৫২ সালে বৃদ্ধ পিতা-

মাতাকে কেদার-বদ্রী দর্শন করিয়ে এনেছিলেন। ছোট ভাই হিরণ্যমোহনকে নিয়ে ১৯৫৫ সালে কৈলাস-মানস সরোবর পরিক্রমা করেন।

হিমালয়ের প্রায় সমস্ত দুর্গম গিরিতীর্থ দর্শন করেছেন কালিদাসবাবু। হিমালয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল হিমালয়ের মতোই অসীম ও অনন্ত। আর তাই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি হিমালয়েই তাঁর স্থায়ী বাসভূমি নির্বাচিত করেছিলেন। কয়েকজন কাশ্মিরী বন্ধুর অনুরোধে প্রায় বছরখানেক ধরে কাশ্মীরে বসবাস করছিলেন। ছেলে-মেয়েদের কলকাতায় রেখে স্ত্রী ও ছোটছেলে ছ'বছরের রাজর্ষিকে নিয়ে তিনি শ্রীনগরে বাসা বেঁধেছিলেন।

কালিদাসবাবু অনেক আগেই অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। কিন্তু সুজাতা-দেবীর সে সুযোগ হয় নি। তাই দাশরথির সহকর্মী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সুজাতাদেবী ও রাজর্ষিকে নিয়ে তিনি এবার এইপথে অমরনাথ রওনা হয়েছিলেন। ১৮ই জুলাই (১৯৭৮) তাঁরা শেষনাগ পৌছলেন। সুজাতাদেবী সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাপসবাবুদের সঙ্গে অমরনাথ দর্শন সম্ভব হল না কালিদাসবাবুর। তিনি তাঁদের বললেন—তোমাদের ছুটি কম, তোমরা এগিয়ে যাও। আমি অবসরপ্রাপ্ত বেকার মানুষ। তোমাদের বৌদি সুস্থ হয়ে উঠলে, আমি ধীরে-সুস্থে বাবাকে দর্শন করে শ্রীনগর ফিরে যাবো।

দর্শন শেষে তাপসবাবুরা ২০শে জুলাই শেষনাগে ফিরলেন। দেখলেন সুজাতাদেবী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। তবু কালিদাসবাবু তাঁকে অমরনাথ দর্শন করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শেষ পর্যন্ত কালিদাসবাবুর বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তিনি তাঁর জীবন-সঙ্গিনীকে বাবা অমরনাথের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁরা দু-জনে প্রাণভরে অমরনাথকে দর্শন করেছিলেন।

জানি না, করুণাময় অমরনাথের কাছে সেদিন তাঁরা কি প্রার্থনা করেছিলেন? তবে মনে হয় ভক্তবৎসল অমরনাথ তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁদের পার্থিব-প্রেমকে স্বর্গীয়-প্রেমে রূপান্তরিত করেছেন। অমরনাথজী তাঁদের দু-জনকে একই সঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছেন। জীবনসঙ্গিনী সুজাতাদেবী কালিদাসবাবুর মরণসঙ্গিনী হয়েছেন।

স্ত্রী অসুস্থ বলে কালিদাসবাবু অমরনাথ দর্শনের পরে তাড়াতাড়ি বাসায় (শ্রীনগর) ফিরতে চান। তিনি বলতালের পথ ধরেন। তিনি জানতেন

যাত্রার মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে, সেদিনই শ্রীনগরের বাস পেয়ে যাবেন। সেই অভিশপ্ত দিনটা ছিল ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮।

অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিকের অনুমান মিথ্যে হয় নি। শ্রীনগর-লে (লাদাক) রোডে পৌঁছবার আগেই একটা মিনিবাস পেয়ে গেলেন। 'বাস'টা যাত্রী ধরবার জন্য আইনের নিষেধ অমান্য করে কাঁচা রাস্তায় অমরনাথের দিকে এগিয়ে এসেছিল।

ঘরে ফেরার জন্য আকুল যাত্রীরা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। নিরাপত্তার কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা সেই বাসের সওয়ার হলেন। বাস-কণ্ডাক্টারের বাসনাও পূর্ণ হল। সে বিয়াল্লিশ জন যাত্রী পেয়ে গেল। বলা বাহুল্য বাসের আসন-সংখ্যা ছিল অনেক কম। এ পথে দাঁড়িয়ে যাওয়া বিপজ্জনক জেনেও যাত্রীরা দাঁড়িয়ে যেতে সম্মত হলেন।

কণ্ডাক্টারের আনন্দ আর ধরে না। মূল-পথ থেকে এগিয়ে এসে ভাল দাও মারা গেছে। কিন্তু সারথি সম্মত হল না। তার হাতে গাড়ির 'স্টীয়ারিং': এবরোথেবড়ো চড়াই-উৎরাহ আঁকাবাঁকা ও সরু কাচা রাস্তা। ভারসাম্যের একটু এদিক-ওদিক হলেই আর রক্ষা নেই। সুতরাং সে বলে বসল—এত লোক নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।

কিন্তু কে গাড়ি থেকে নামবে? তাছাড়া কণ্ডাক্টারও দণ্ডায়মান যাত্রীদের দলে। সুতরাং ড্রাইভারের গণতান্ত্রিক পরাজয় ঘটল।

সে গাড়ি ছাড়ল। কিন্তু তার রাগ পড়ল না। বাস চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই সে পাশ ফিরে কণ্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকল।

কালিদাসবাবু বসেছিলেন সামনের দিকে। তিনি বারবার ড্রাইভারকে শান্ত হবার অনুরোধ জানান। কিন্তু ড্রাইভার সে অনুরোধ উপেক্ষা করে বাস এবং ঝগড়া দুটোই একসঙ্গে চালাতে থাকে। সে বোধহয় ভেবেছিল এইভাবেই চালিয়ে নিতে পারবে।

প্রায় কিন্তু পেরেছিল। প্রশস্ত জাতীয় সড়ক শ্রীনগর-লে রোড যখন আর মাত্র গজ পঁচিশেক দূরে, তখুনি অঘটন ঘটল। হিমালয়ের পথে অসাবধানে গাড়ি চালাবার ফল ফলল। চোখের নিমেষে বাস গড়িয়ে পাশের খাদে।

কালিদাসবাবু শহীদ হলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর ভাঙা হাতঘড়ি বলছে তখন সময় বিকেল ৫-৫০ মিনিট।

অন্যান্য আহতদের সঙ্গে সুজাতাদেবীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। রাত দুটোয় তিনিও স্বামীর অনুগামিনী হন।

ছ'বছরের রাজর্ষির আঘাত কিন্ত খুবই সামান্য। তার দাদা শ্রীনগর গিয়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছে কলকাতায়। দাদা-দিদিদের সঙ্গে সেও তাঁর বাবা ও মায়ের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করেছে। তবে আজও সে ঘুমের ঘোরে সেই মরণখাদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বাবার পাশে বসে বারবার বলতে থাকে—বাবা, বাবাগো! তুমি কথা বলো। বাবা তুমি একবার কথা বলো।

অবোধ শিশু বোধকরি আজও বুঝতে পারছে না, তাঁর সত্যাশ্রয়ী পিতা ছিলেন হিমালয়-প্রেমিক। তাই স্পষ্টবক্তা কালিদাস রায় গোষ্ঠীপতির কণ্ঠস্বর হিমালয়ের বাতাসে হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের মতো। তিনি সস্ত্রীক শিবলোকে চলে গিয়েছেন।

তাঁদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

॥ পনেরো ॥

সুযোগ পেয়ে কলহপ্রিয় দেবর্ষি দেবী পার্বতীকে বললেন—মা, ত্রিভুবনে একমাত্র মহেশ্বর সেই অমরকথা জানেন।

—তাই নাকি! ভগবতী উল্লসিতা।

কাজ হয়েছে বুঝতে পেরে নারদ সবিনয়ে নিবেদন করলেন—হ্যাঁ মা! একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর কেউ জানেন না এই অনন্ত সৃষ্টির মূল-রহস্য। সে কাহিনী অমরকাহিনী। আপনি যদি একবার তাঁর কাছ থেকে সে কাহিনী শুনে নিতে পারেন, তাহলেই অমর হয়ে যাবেন।

পার্বতীর কাছে কথাটা বলে নারদ যথারীতি বিষ্ণুলোকে চলে গেলেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই শিব কৈলাসে ফিরে এলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী আবদার শুরু করলেন—আজই আমাকে তোমার অমরকথা বলতে হবে, আমি অমর হব।

শিব বুঝতে পারলেন, এ নারদের কাজ। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, হয়ে গিয়েছে। সুতরাং নারদকে না ডেকে পাঠিয়ে তিনি পার্বতীকেই ভোলাবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

পারলেন না। বরং গৌরী রেগে গিয়ে বলে বসলেন—আমি আরেকবার বলছি, আমাকে অমরকথা বলো, আমি অমর হব। না বললে এখুনি আমি কৈলাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।

শিব প্রমাদ গণলেন। তাঁর সতীর কথা মনে পড়ল। তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে যথাসম্ভব মধুর স্বরে বললেন—তুমিও যেমন। আমি কি একবারও বলেছি, তোমাকে অমরকথা বলব না? শুনে অবশ্য তোমার কোন লাভ নেই, কারণ তুমি এমনিতেই অমর। তবু তুমি যখন শুনতে চাইছ, আমি বলব। কিন্তু সেকথা তো এখানে বসে বলা যাবে না দেবী!

—কেন?

—অমরকথা গুপ্তকথা। সেকথা যে শুনবে, সে-ই অমর হয়ে যাবে। কাজেই এমন গুপ্তস্থানে বসে বলতে হবে যে, কেউ না শুনতে পায়।

—এমন জায়গা কি আছে নাথ?

—আছে।

—কোথায়?

—হিমালয়ে। সে এক অপরূপ গুহা। মানুষ তো দূরের কথা দেবতারাও তার খবর জানে না। সেখানে বসে বললে, কেউ সে কাহিনী শুনতে পাবে না।

পার্বতী সানন্দে সম্মত হলেন। কারণ তিনি হিমালয়ের মেয়ে, এই সুযোগে একবার বাপের বাড়িও বেরিয়ে আসা যাবে।

হর-পার্বতী পৌঁছলেন প্রকৃতির সেই অপরূপ নিভৃত নিকেতনে।

কাহিনী শুরু করার আগে উমাপতি উমাকে বললেন—অমরকথা কিন্তু অনেক বড়। শুনতে শুনতে তুমি যেন আবার ঘুমিয়ে প'ড়ো না। ঘুমোলেই কিন্তু আমি বলা বন্ধ করে দেব। আমি চোখ বুজে তোমাকে সে কাহিনী বলব। কাজেই তুমি যে জেগে রয়েছো, তার প্রমাণ স্বরূপ তোমাকে মাঝে মাঝে 'হুঁ' 'হুঁ' বলে শব্দ করতে হবে।

গৌরী সম্মত হলেন, শিব শুরু করলেন তাঁর অমরকথা—সৃষ্টির মূল-রহস্য (Cosmogonic mystery)। ঋগ্‌বেদের নারদীয় সূক্তে সেই সৃষ্টি-রহস্য সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে।

দিন গেল, রাত গেল, কেটে গেল দিনের পর দিন। অবশেষে শেষ হল অমরকাহিনী। ত্রিলোচন চোখ মেললেন। সবিস্ময়ে দেখলেন গৌরী সমাধিস্থা। তাহলে কে এতদিন 'হুঁ' 'হুঁ' করে সাড়া দিয়েছে? তিনি যে বহুবার সে শব্দ শুনেছেন। নিশ্চয়ই কেউ তাঁর সঙ্গে বেইমানী করেছে।

ক্রুদ্ধ রুদ্র চারিদিকে তাকালেন। দেখলেন গুহার এককোণে একটি শুকপাখি বসে রয়েছে। পশুপতি ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সেই শুকপাখিকে হত্যা করতে গেলেন।

পারলেন না। শুক গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো। ঈশানও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি তাকে তাড়া করলেন। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও নদী-নালার ওপর দিয়ে শুক উড়ে পালাতে থাকল। পিনাকীও ত্রিশূল হাতে তার পেছন পেছন ছুটতে থাকলেন।

এই শুক গোলোকের লীলাশুক। রাধা-কৃষ্ণ মর্ত্যে অবতীর্ণ হবার পরে সে বিষ্ণু-বিরহে অধীর হয়ে কৃষ্ণের খোঁজে মর্ত্যে আসে। উড়তে উড়তে একদিন সে শ্রান্ত হয়ে ঐ গুহায় আশ্রয় নেয়। দেখতে পায় হর-পার্বতীকে। সে সমাধিস্থা পার্বতীর কণ্ঠস্বর নকল করে 'হুঁ' 'হুঁ' বলে অনন্ত সৃষ্টি-রহস্য শ্রবণ করে।

শুক ভয়ে উড়ে পালাতে থাকে, শিবও তাকে তাড়া করতে থাকেন। তাঁদের

খেয়াল নেই যে অমরকথা শুনে শুক অমর হয়ে গিয়েছে। শিবের আর সাধ্য নেই শুককে মেরে ফেলেন।

উড়তে উড়তে শুক পৌছল বদরিকাশ্রমে—সরস্বতী নদীর তীরে ব্যাসদেবের আশ্রম শ্যামাপ্রাসে। সে দেখতে পেল ব্যাসদেবের স্ত্রী বটিকাদেবী স্নান শেষে সরস্বতীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করছেন। যোগবলে শুক সূক্ষ্মদেহ ধারণ করল। প্রণাম শেষে সহসা বটিকাদেবী একটা হাই তুললেন। শুক সেই সুযোগ বটিকাদেবীর মুখের ভেতর দিয়ে উদরে প্রবেশ করল।

একে সতী, তার ওপরে ব্যাসদেবের সহধর্মিণী, সুতরাং আশুতোষকে হার মানতে হল। তিনি শান্ত হলেন। শুকপাখিটির বুদ্ধি, তার জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে শিব খুশি হলেন।

ব্যোমকেশ বটিকাদেবীকে আশীর্বাদ করে বললেন—এই শুক তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞানী হবে। সে জগতবাসীকে ভাগবত তত্ত্বরস পরিবেশন করবে। আর যে গুহায় বসে সে আমার অমরকথা শ্রবণ করেছে, সেটি আজ থেকে অমরতীর্থে পরিণত হল কারণ আমি অমরনাথ রূপে চিরস্থায়ী হব সেখানে।

বলা বাহুল্য সেই শুকই পরবর্তীকালের ব্যাসপুত্র পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী। বারো বছর মাতৃগর্ভে বাস করে তিনি ভূমিষ্ঠ হন এবং সেদিনই সংসার ত্যাগ করেন। তিনিই মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজা পরীক্ষিৎকে সপ্তাহকাল অখণ্ডভাবে হরিকথার অমৃতবাণী শুনিয়েছিলেন। সেই 'শুক মুখাদ-মৃত-দ্রব-সংযুতং' বার্তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত—নিখিল শাস্ত্রের সার, দুঃখতপ্ত কলি-গ্রস্থ সংসারী জীবগণের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের অমৃতকথা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নয়। আমরা অমরনাথের কথায় ফিরে আসি। কৃত্তিবাস যে গুহায় বসে পার্বতী ও শুকপাখিকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন, সেই গুহাই অমরতীর্থ, সেখানেই শিব অমরনাথ রূপে চিরবিরাজমান।

আজ আমরা সেই অমরতীর্থে পদার্পণ করব। সুধালিঙ্গ রূপী শাশ্বত-সুন্দর ও মঙ্গলময় মহেশ্বরকে দর্শন করব। অতএব আর গল্প নয়। সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখুনি চা এসে পড়বে। এবারে উঠে পড়া যাক।

"আজ আর তাড়াহুড়া করছেন কেন ঘোষদা", অসীম এখুনি শয্যাত্যাগ করতে রাজী নয়। সে বলে, "আজ তো আর ব্রেক-ফাস্টের হাঙ্গামা নেই!"

"কিন্তু প্রাতকৃত্য শেষ করে জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে দিতে হবে তো।"

"কেন ?" সরকারদা জিজ্ঞেস করেন।

"আমরা অমরনাথজীকে দর্শন করে এখানে ফিরে আসার আগেই ফকিরবাবু মালপত্র শেষনাগে পাঠিয়ে দেবেন। এখানে ফিরে এসে লাঞ্চ্ করেই আমরা শেষনাগ রওনা হয়ে যাবো।"

"তার মানে আজ কত মাইল হাঁটতে হবে ?" ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করে।

"১৬ মাইল। এখান থেকে অমরতীর্থ ৪ মাইল অর্থাৎ যাতায়াতে ৮ মাইল আর শেষনাগ ৮ মাইল।"

"আগামীকাল রাতে আমরা কোথায় থাকব ?"

"দি নিউ পাইনভিউ হোটেলে।"

"মানে ?" ব্রহ্মচারী বিস্মিত এবং পুলকিত।

"হ্যাঁ, কাল আর তাঁবুতে বাস করতে হবে না। কাল আমরা পহেলগাঁয়ে ফিরে যাবো, শেষ হবে পদযাত্রা।"

"আগামীকাল তো তাহলে আমাদের ১৮ মাইল হাঁটতে হবে ?"

"হ্যাঁ। উৎরাই পথ, অসুবিধে হবে না তেমন। সকালে ব্রেক-ফাস্ট করে বায়ুযান থেকে রওনা হব। ৮ মাইল হেঁটে দুপুরে চন্দনবাড়ি পৌঁছব। সেখানে লাঞ্চ্ করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে যাবো পহেলগাঁও। পূর্ণ হবে অমরতীর্থ অমরনাথ পদপরিক্রমা।"

আলোচনার যতি টেনে উঠে পড়ি। জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করি। কাজ হয়, প্রথমে ব্রহ্মচারী এবং পরে সরকারদা ও অসীম গাত্রোত্থান করে। তারাও নিজেদের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দেয়।

একটু বাদে চা আসে। উপবাসী থেকে তীর্থদর্শন বিধেয়। কিন্তু আজকাল উপবাস দুই প্রকার—নিরম্বু ও চাম্বু। আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। অর্থাৎ শুধু চা খেয়ে দর্শনে বের হচ্ছি। বাবা অমরনাথ অবশ্যই আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন। কারণ চায়ে কোন দোষ নেই। বলা বাহুল্য, তবু ব্রহ্মচারী চা খেল না।

সকাল ঠিক সাড়ে ছ'টায় শুরু হল পদযাত্রা। সাধারণতঃ পঞ্চতরণী থেকে যাত্রীরা আরও সকালে বের হন। বেরিয়েছেনও অনেকে। শুনেছি কেউ কেউ নাকি অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়েছেন। হোচট খেয়ে পা ভাঙতে প্রস্তুত নই বলে, আমি অন্ধকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। তাছাড়া আমরা শুধু অমরনাথ দর্শনে আসি নি। সেই সঙ্গে দেবতাত্মা হিমালয়ের অপরূপ রূপ আস্বাদন করতে এসেছি। সুতরাং দিনের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হবার পরে ধীরে-সুস্থে পথে নেমেছি।

প্রায়-সমতল ও সোজা পথ। প্রশস্ত পথ। তবু সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। কারণ পাশাপাশি পথ চলবার চেষ্টা করলেই অশ্বরক্ষীদের চিৎকার কানে আসছে 'হোশ্'।

সামনে ও পেছনে মানুষ আর ঘোড়ার শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে শেষরাত থেকে, শেষ হবে মধ্যরাতে। এখন যাবার ভিড়, দুপুরের পর থেকে শুরু হবে ফেরার পালা। কিছুকাল আগেও কেবল শ্রাবণী পূর্ণিমাতেই প্রকৃত ভিড় হত অমরনাথের পথে। এখন আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে ভাদ্র পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন এপথে ভিড় লেগে থাকে। অনেকের মুখে শুনেছি আজকাল নাকি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সুধালিঙ্গ সবচেয়ে বড় হয়। আমরা এসেছি ভাদ্রমাসে। মলমাস পড়ার জন্য এবছর শ্রাবণী পূর্ণিমার যাত্রা ভাদ্র পূর্ণিমায় হচ্ছে। জানি না আমরা সেই স্বয়ম্ভু সুধালিঙ্গকে কতবড় দর্শন করতে পারব?

আগেই বলেছি পাঁচটি আশ্রয়-কুটির ও দুটি বিশ্রাম-ভবন আছে পঞ্চতরণীতে। তারই পাশ দিয়ে পথ চলেছি এখন। মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছি। সারা অধিত্যকাটিকে ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। দু-পাশে সাদা সবুজ ও কালো পাহাড়। দূরে সাদা ও সবুজ নিম্ন-উপত্যকা আর স্ফটিক-স্বচ্ছ পাঁচটি ধারার আলপনা। পার্বতীকে নিয়ে অমরতীর্থে যাবার সময় অমরনাথ নাকি ওখানে আনন্দনৃত্য করেছিলেন। তাই নীলকণ্ঠের জটাজাল থেকে ওখানে পাঁচটি ধারার সৃষ্টি।

ওখানে পাঁচটি কিন্তু এখানে একটি। পাঁচটি ধারা একটি ধারায় পরিণত হয়ে সামনে প্রবাহিত। তারই তীরে তীরে পথ—অমরতীর্থ অমরনাথের পুণ্যপথ। আমরা সেই পথে চলেছি এগিয়ে। আমার বহুবছরের বাসনা পূর্ণ হবে আজ।

বাঁয়ে নদী, ডাইনে পাহাড়, মাঝখানে পুণ্য পথ। সামান্য চড়াই। অক্লেশে এগিয়ে চলেছি। হাওয়ার জন্য অবশ্য একটু একটু শীত লাগছে। লাগবেই তো, রোদ উঠতে যে এখনও অনেক দেরি।

নদীর ওপারেও পাহাড়। নাম গড়নগর। এপারের পাহাড়ের নাম ভৈরবঘাট। শিবতীর্থে এসেছি, ভৈরবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে, সে যে শিবক্ষেত্রের রক্ষক।

অনেকে কিন্তু এ পাহাড়কে বৈরাগীঘাটও বলেন। আর্থার নেভে-ও তাই বলেছেন। এই পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'Cross several torrents; wind round shoulder to Googam; ascend steeply over the precipitous spur; then drop to the snow-bedded

Amarawati stream, and ascend gradually to the cave, a lofty but shallow recess in the gypsum rock, with some frozen springs which represent the great Himalayan God Shiva

এখন পর্যন্ত আমরা অবশ্য পথের সঙ্গে এ বর্ণনার মিল খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো পাওয়াও যাবে না। কারণ নেভে এপথে এসেছিলেন এই শতাব্দীর প্রথম দশকে। ইতিমধ্যে পথের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। দুর্গমতাও অনেকখানি কমে গিয়েছে। আরেকটা কথা—নেভে অমরগঙ্গাকে অমরাবতী বলেছেন। কেন বুঝতে পারছি না। তখন কি অমরগঙ্গাকে অমরাবতী বলত?

আমরা অক্লেশে এগিয়ে চলেছি। এখনও পঞ্চতরণীর অধিত্যকা শেষ হয় নি। নদীতীরের এই বেলাভূমি থেকে দূরের ঐ পাহাড় পর্যন্ত ঘাস আর ঝোপঝাড়। শুনেছি এই সব ঝোপঝাড়ের মাঝে প্রচুর ভেষজ গুল্ম (Medicinal Plants) রয়েছে। এবং ভারতীয়-হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই।

হিমালয় শুধু দেবালয় কিংবা শৈলপুরী নয়, সে অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার। ভারত দরিদ্র দেশ। হিমালয় আমাদের দারিদ্র্য দূর করে দিতে পারে, ভারতের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। অথচ আজও আমরা হিমালয়ের ঐশ্বর্য আহরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে উঠতে পারলাম না।

কিন্তু হিমালয়ের কথা থাক, অমরনাথজীর কথাই ভাবা যাক। ভক্তদের বিশ্বাস কেউ পথ হারায় না অমরনাথের পথে। অমরনাথ নিজেই যাত্রীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। আর শিবরাত্রির দিন কেউ যদি তুষারাবৃত দুর্গম পথ পেরিয়ে পঞ্চতরণী পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, তাহলে বাবা অমরনাথ নাকি তাঁর নিজের বায়ুযানে করে তাঁকে শিবলোকে নিয়ে যান।

আরে! ওখানে কে? চমকে উঠি। শুধু আমি একা নই, অনেকেই। এই মেয়েটিকেই তো সেদিন পহেলগাঁয়ের পথে চটের জামা গায়ে দিয়ে একটা নেড়ীকুত্তা নিয়ে যেতে দেখেছি। সঙ্গে তার সেই সাহেবও রয়েছে দেখছি।

মেমসাহেবের সঙ্গে সাহেব কিংবা সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেব—থাকবেই। তারাও যখন যাত্রায় এসেছে, তখন যাত্রাপথে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং দেখা হবার জন্য চমকে উঠি নি। বিস্মিত হয়েছি, কারণ ওরা পথ না চলে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

না, ঠিক দাঁড়িয়ে নেই। সাহেব নদীর ধারে বালুকাবেলায় একটা গর্ত খুঁড়ছে। কিন্তু কেন? ওরা ওখানে গর্ত খুঁড়ে কি করবে?

"মনে হচ্ছে কুকুরটা মারা গিয়েছে।" মামা বলে, "এই উচ্চতায় এত ঠাণ্ডায় কি কুকুর বাঁচে?"

"কুকুরটাকে কবর দেবার জন্যই সাহেব ওখানে গর্ত খুঁড়ছে।" ভাগনে যোগ করে।

মামা-ভাগনের অনুমান মনে হচ্ছে মিথ্যে নয়। যে কারণেই হোক নেড়ী-কুত্তার বাচ্চাটা মারা গিয়েছে এবং ছেলেটি তার শেষকৃত্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করছে।

আর মেয়েটি? সে মরা কুকুরটাকে কোলে নিয়ে হিমালয়ের আকাশের দিকে রয়েছে তাকিয়ে। তার দু-চোখের কোল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা।

আশ্চর্য! আমরা এদের হিপি বলি। বলি বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো অপদার্থের দল। এরা নোংরা, এরা ঝগড়াটে, এরা গাঁজাখোর। এরা এল. এস. ডি. খায়! আমরা এদের স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে করি না। অথচ এদের বুকের মাঝেও এত স্নেহ, এত ভালোবাসা।

পহেলগাঁয়ের পথে এমন কত কুকুর ঘুরে বেড়ায়। মেয়েটি নেহাৎ খেয়ালের বসে কুকুরটার গলায় দড়ি বেঁধেছিল। অকারণেই সে তাকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথ চলেছিল। একবারও ভাবে নি কুকুরটা দুর্গম পথের ধকল এবং উচ্চ-হিমালয়ের আবহাওয়া সইতে পারবে না।

বরং ইতিমধ্যে পথের কুকুরের জন্য ভালোবাসায় মেয়েটির বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তাই আজ তার চোখের জল বাঁধ মানছে না। সে কাঁদছে। কি করবে ভালোবাসা যে বড় অন্ধ, অপত্য-স্নেহের কোন গণ্ডী নেই এ জগতে।

না, মেয়েটিকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারি না। নীরবে ফিরে আসি পথে। ভারাক্রান্ত মনে এগিয়ে চলি অমরতীর্থের পথে। ভাবি—ভালই হল, কুকুরটা এখানে পৌঁছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। পঞ্চতরণী পুণ্যভূমি। এখানে পুণ্যার্থীরা পূর্বপুরুষদের আত্মার সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ করে থাকেন। পরদেশী যুবক-যুবতীর বাসনা পূর্ণ হবে। তাদের প্রিয় কুকুরটির আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি লাভ করবে।

পঞ্চতরণীর উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। শুরু হল চড়াই—খাড়া চড়াই। এবারে এক মাইলে প্রায় হাজার দেড়েক ফুট ওপরে উঠতে হবে। অনেকের মতে এটি পিস্থুর চেয়ে কঠিন। তাঁরা বলেন—'most toilsome ascent.'

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা সত্যি সত্যি

শ্রান্ত। বারবার বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। তবু বলব, পিস্থুর চেয়ে কঠিন নয় এ চড়াই। উচ্চতা বেশি বলেই এমনটি মনে হচ্ছে।

সারি বেঁধে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। একটির পর একটি গিরিশিরা অতিক্রম করছি। কেবলি ওপরে উঠছি। উঠছি আর উঠছি।

মাঝে মাঝে পথের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। পাশের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছি, সব শ্রান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। দেখছি আর দেখছি। দু-চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে নিবেদিতার সেই বর্ণনা —'At these heights we often found ourselves in great circles of snow-peaks, those mute giants that have suggested to the Hindu mind the idea of the Ash-encovered God.—' সত্যি তাই! আমরা ভস্মমাখা ধূর্জটির দেশে এসেছি।

প্রতিদিনের মতো আজও সেই খোঁড়া ভদ্রলোক আমাদের পরে রওনা হয়েছেন। প্রতিদিনের মতো আজও তিনি আমাদের ধরে ফেললেন। 'জয় বাবা অমরনাথ!' বলে অভিনন্দিত করলেন। তারপরে প্রতিদিনের মতো আজও তিনি আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন।

তবে আজ আমরাও বেশ তাড়াতাড়ি পথ চলেছি। কেউ অযথা সময় নষ্ট করছে না। আবৃত্তি গান ও সাধুসঙ্গ—সব বন্ধ। কথাও বড় একটা বলছে না কেউ। সবচেয়ে বিস্ময়কর সরকারদা সবার আগে আগে চলেছেন।

অথচ আজ আমরা অভুক্ত। আর আজকের পথ, বিশেষ করে এখন আমরা যে চড়াই পার হচ্ছি, তা যেমন খাড়া তেমনি পেছল। উচ্চতাজনিত কষ্টও হচ্ছে খুব। তবু সবাই একমনে পথ চলেছে। আজ যে আমরা সবাই একমন। অমরতীর্থ দর্শনের আগ্রহ ও আকাঙ্খায় পথের দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে কৌতূহলী মন নিয়ে চলেছি এগিয়ে।

পথের পাশে গাছপালা নেই বললেই চলে। তবে পাহাড়ের গা বেয়ে মাঝে মাঝে ঝরণা আসছে নেমে। আর নীল আকাশের বুকে চলেছে অবিরত মেঘের খেলা।

সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি এখনও। তার সময় হয় নি যে! তবে চড়াইয়ের জন্য শীত লাগছে না। মাঝে মাঝে অবশ্য কোথা থেকে যেন পাগলের মতো ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসছে। তখন একেবারে হাড় শুদ্ধু থর থর করে কেঁপে উঠছে। তাহলেও স্থির ও অচঞ্চল চরণে চলেছি এগিয়ে। আমরা যে অমরতীর্থের দ্বারে উপনীত, আমরা যে আজ অমরনাথজীকে দর্শন করব!

হঠাৎ ভাবনা থেমে যায়। ওদের দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াই। ওঁরা কারা? ঐ যে পথের পাশে বসে গলাগলি করে গাঁজায় দম দিচ্ছেন।

"ঠিকই সন্দেহ করেছেন শঙ্কুদা!" অশোক বলে, "এই দু'জন সাধুই সেদিন পহেলগাঁয়ের পথে মারামারি করছিলেন।"

আশ্চর্য! সেদিন তো ভাবতেই পারি নি এঁরা আর কখনও পাশাপাশি পথ চলতে পারবেন। বরং ভেবেছি—মারামারিটা ভবিষ্যতের জন্য জমা রইল, কারণ এঁরা একদিনে যাত্রায় আসবেন।

তাই এসেছেন। তবে আমার আশঙ্কা সত্য হয় নি। আজ তাঁরা একসঙ্গে দর্শনে চলেছেন। অভিন্ন হৃদয় হয়ে গঞ্জিকা সেবন করছেন।

কিন্তু একি শুধুই সাধুবাবাদের সাধন-ভজনের ফল? না, হিমালয়ের বিচিত্র লীলা, বাবা অমরনাথের অপার করুণা?

॥ ষোল ॥

পঞ্চতরণী থেকে রওনা হবার ঠিক একঘণ্টা পরে ভৈরবঘাটের চড়াই শেষ হল। সেখানেই সাইনবোর্ড—

'Santsingh Top

Ht. 13,500′.'

ভেবে অবাক হই! মাত্র একঘণ্টায় সবাইকে নিয়ে দু-মাইল পথ এসেছি। এর মধ্যে মাইলখানেক কঠিন চড়াই। এক মাইলে ওদের প্রায় দু-হাজার ফুট উঠে আসতে হয়েছে। আসবেই তো! আজ যে অমরনাথ চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছেন। তাই পথশ্রম ও দৈহিক দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পাগলের মতো ছুটে চলেছি।

তাহলেও এখানে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। অনেকটা চড়াই পেরিয়ে এই সংকীর্ণ ও নাতিদীর্ঘ সমতলটুকু পাওয়া গিয়েছে। জায়গাটিও ভারী সুন্দর। প্রায় পর্বতশিখরে একটি গিরিখাত (Gully)। দু-পাশে পাহাড়ের প্রাচীর, মাথার ওপরে মেঘমুক্ত নীলাকাশ। সরকারী নাম 'শান্ত্ সিংহ পারি।' আর ভক্তরা বলেন ভৈরবঘাটি। শৈবতীর্থ অমরনাথের ক্ষেত্রপাল ভৈরবনাথ এখানেই বাস করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া অমরতীর্থে যাওয়া সম্ভব নয়।

হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেক শিবতীর্থে এমনি একটি করে ভৈরবঘাটি আছে। সে জায়গাগুলোর অবস্থানও ঠিক একই রকম—শিবক্ষেত্রের সীমান্তে এমনি একটুকরো উঁচু সমতল।

এ জায়গাটির আরেকটা নাম রয়েছে—সঙ্গম। স্থানীয় লোকেরা একে সেই নামেই ডাকে। সঙ্গম মানে পঞ্চতরণী নদী ও অমরগঙ্গার সঙ্গম। অমরগঙ্গা এসেছে অমরনাথ থেকে। এখানে সে মিলিত হয়েছে পঞ্চতরণী নদীর সঙ্গে। তারপরে চলে গিয়েছে বলতাল। বলতালের যাত্রীরা অমরগঙ্গার তীরপথ দিয়ে অমরনাথে আসেন। মঞ্জু-প্রণতিরাও তাই এসেছে।

কিন্তু ওদের কথা আর নয়। অমরগঙ্গার কথাই ভাবা যাক। শুধু এ অমরগঙ্গা নয়, সেই সঙ্গে আরেক অমরগঙ্গার কথা—মণিময় মণিমহেশের অমৃত-ধারাও অমরগঙ্গা। তারই তীরে তীরে পথ চলে আমরা হাড়সার থেকে মণি-

মহেশ গিয়েছি। কোথায় কাশ্মীর আর কোথায় চাম্বা? কোথায় মণিমহেশ আর কোথায় অমরনাথ? কিন্তু অমরগঙ্গা দুই তীর্থের পুণ্যবারি নিয়ে চলেছে।*

অমরগঙ্গার সঙ্গে কিন্তু আজ দেখা হয় নি এখনও। সঙ্গমও দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। আমরা পঞ্চতরণী উপত্যকা থেকে ভৈরবঘাটের ওপরে উঠে এসেছি। এবারে তার গা বেয়ে অমরনাথ উপত্যকায় অবতরণ করব। সেখানেই দেখা হবে অমরগঙ্গার সঙ্গে।

অতএব আর দেরি নয়। তীর্থের দেবতা ডাক দিয়েছেন, এবারে তাঁর কাছে যাওয়া যাক।

"বাবা অমরনাথজী কি?"

"জয়!"

উঠে দাড়াই। আবার শুরু হয় পথ-চলা—অমরতীর্থের পথ।

মিনিট কয়েক হাঁটার পরেই সমতল শেষ হয়ে গেল। শুরু হল উৎরাই। আমরা অমরনাথ উপত্যকায় নেমে চলেছি, ভৈরবঘাটের অপর পাশে অবতরণ করছি।

কিছুক্ষণ বাদেই দেখা হল তার সঙ্গে—অমরগঙ্গার সঙ্গে। অনেক নিচে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে সঙ্গম—পঞ্চতরণী নদী ও অমরগঙ্গার সঙ্গম।

পথটা এখানে এসে দু-দিকে প্রসারিত। পথের পাশে পথনির্দেশিকা—ইংরেজী সাইনবোর্ড। বাঁদিকে বলতাল, সোজা পঞ্চতরণী ও ডানদিকে অমরতীর্থের পথ। বলতালের পথটি এখানে এসে পঞ্চতরণীর পথের সঙ্গে মিশেছে। অর্থাৎ এটি শুধু নদীর সঙ্গম নয়, পথের সঙ্গমও বটে।

বলতালের পথটিকে একবার ভাল করে দেখে নিই। এই পথ দিয়েই মঞ্জু ও প্রণতিরা এখানে এসেছিল। গিয়েছিল অমরনাথে।†

এতক্ষণ আমরা উত্তর-পশ্চিমে এসেছি, এবারে যেতে হবে উত্তর-পূর্বে। এতক্ষণ এসেছি পঞ্চতরণী নদীর প্রবাহকে অনুসরণ করে, এবারে চলেছি অমরগঙ্গার প্রবাহের বিপরীত দিকে।

ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে চলি। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। আস্তে আস্তে ঢালু হয়েছে। নদীর ওপারে পাহাড় একটু দূরে। তীরভূমির কাছাকাছি

* 'হিমতীর্থ হিমাচল' বইখানি দ্রষ্টব্য।

† কালিদাসবাবুর কথা সেদিন মনে পড়ে নি আমার। কারণ সে দুর্ঘটনা ঘটেছে একবছর বাদে। অমরনাথ দর্শন করে কালিদাসবাবু ওখান থেকেই বলতালের পথ ধরেছিলেন।

কোথাও কোথাও বরফ জমে আছে, কিন্তু অমরগঙ্গা স্বচ্ছ শীতল স্রোতস্বিনী। শুধু সুন্দরী নয়, বেগবতীও বটে। আমরা তার তীরভূমির দিকে নেমে চলেছি।

একটা বাঁক ফিরেই দেখতে পেলাম তাঁকে—সেই অপরূপকে, আমার শৈশবের স্বপ্ন অমরতীর্থ অমরনাথকে।

নদীর ওপারে অনেকটা উঁচুতে সেই শাশ্বত-সুন্দর শিবালয়—বাবা অমরনাথের অভিনব আলয়। আমি প্রণাম করি। মনে মনে বলি—ঠাকুর, সকল বাধা উপেক্ষা করে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি আমার প্রাণের প্রণতি গ্রহণ কর।

এখনও কিন্তু কিছুদূরে! ভৈরবঘাটি থেকে গুহা দু-মাইল। আমরা তার আধমাইলের মতো পথ পেরিয়েছি। এখন উৎরাই পথে নেমে যেতে হবে অমরগঙ্গার বেলাভূমিতে। সেখানে পুল পেরিয়ে ওপারে। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছতে হবে অমরতীর্থে।

—জয় বাবা অমরনাথ!

সামনের যাত্রীদল জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। আমরাও সাড়া দিই—জয় অমরনাথ!

দূর যে আর দূরে নয়। দুঃখের পথ শেষ হয়েছে, আনন্দতীর্থ সমাগত। পরম প্রত্যাশা পূর্ণ হবার আনন্দে উদ্বেলিত ভক্তবৃন্দ ভগবানের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। জয় আর জয়! ভগবানের জয়, ভক্তের জয়! অমরনাথের জয় আমাদের জয়—আমরা যে দূরকে নিকট করেছি।

দু-জোড়া সাহেব-মেম এদিকে আসছে। ওরা অমরনাথ দর্শন করে ফিরছে। অমরতীর্থ কোন বিশেষ ধর্মের খাসমহল নয়। সর্বধর্মের সমান অধিকার সেখানে। অমরনাথজী মানুষের ভগবান।

এ ধারণা আজকের নয়, বহুবছরের। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত বইতেও পড়েছি—'Along with the train of Hindu pilgrims many Europeans and Americans have been seen going to this place.' (R. C. Arora.)

ওরা কাছে আসে। মামা-ভাগনে যুবকদের সঙ্গে কথা বলে, তুলতুল গৌরী ও মামা কথা বলে যুবতীদের সঙ্গে। শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতীরা খুব খুশি। অমরতীর্থকে ওদের নাকি ভারী ভাল লেগেছে। বারবার 'fantastic' 'splendid' ও 'sublime' প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করছে। তারপরে ধীরেসুস্থে জানায়,

ওরা গতকাল সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা দিয়ে বলতাল হয়ে বিকেলে অমরনাথ পৌঁচেছে। গুহার নিচের সমতল জায়গাটুকুতে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস করেছে। আজ সকালে আবার অমরনাথজীকে দর্শন করে পঞ্চতরণীর পথে ফিরে যাচ্ছে। পহেলগাঁও। অর্থাৎ ওরা দুটি পথেই পদচারণা করতে পারল। আর সেই সঙ্গে শ্রীনগর এবং পহেলগাঁও থেকে সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকা ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে গেল।

অভিনবত্বের জন্য অভিনন্দন জানাই পরদেশী হিমালয়-প্রেমিকদের। তারপরে এগিয়ে চলি আপন পথে।

নেমে এলাম অমরগঙ্গাব তীরে। পথটি দু-ভাগে বিভক্ত। প্রশস্ত অংশটি একটা কাঠেব সাঁকো পেরিয়ে ওপাবে চলে গিয়েছে। আর সংকীর্ণ অংশটি পাহাড়ের গা বেয়ে সামনে প্রসারিত আমরা পুল পেরিয়ে অমরগঙ্গার ডানতীরে এলাম।

অমরতীর্থ হারিয়ে গেল।

না, না, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। আছেন সামনের ঐ পাহাড়গুলোর পেছনে। পাহাড আড়াল করেছে তাঁকে। আবাব তিনি আবির্ভূত হবেন আমার সামনে। তাঁব সঙ্গে আমাব সকল ব্যবধান যাবে ঘুচে। সেই পরমমুহূর্তকে নিকটতর করাব জন্য চলার বেগ বাড়িয়ে দিই।

কিন্তু খুব জোরে চলতে পারছি না। এপারে আসার পরে যে উৎরাই পথ চড়াই হয়েছে। 'ইনট্যুর'-এর সঙ্গে মঞ্জু ও প্রণতিরা দু-মাস আগে অমরনাথ এসেছিল। অমরগঙ্গার ওপরে তখন কঠিন বরফ। তারা সেই তুষারাবৃত সমতল প্রান্তর পেরিয়ে অর্থাৎ অমরগঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে অমরতীর্থের পাদদেশে পৌঁচেছে। তাদের এমন চরাই ভাঙতে হয় নি।

আজ অমবগঙ্গা তবল-তরঙ্গিনী। তাই আমরা অমরগঙ্গার তীরে তীবে পথ চলেছি। সে ওপর থেকে নিচে নামছে, আমরা নিচেব থেকে ওপরে উঠছি। সে আসছে অমরনাথের কাছ থেকে, আমরা যাচ্ছি অমরনাথেব কাছে। কিন্তু সেও অশান্ত, আমরাও অশান্ত। তার অস্থিরতা স্বর্গবারি মর্ত্যে পৌঁছে দেবার জন্য, আমাদের অস্থিরতা স্বর্গদ্বারে পৌঁছবার জন্যে।

'Holy Cave 1 Mile
Srinagar 89 Miles
Pahalgam 29

সাইনবোর্ডটির দিকে নজর পড়তেই ভাবনা থেমে যায়। থমকে দাঁড়াই। পুলকিত কণ্ঠে তুলতুল বলে ওঠে, "উনত্রিশ মাইল এসে গেছি!"

"হ্যাঁ আর মাত্র এক মাইল।" অসীম যোগ করে।

ওরা তাড়াতাড়ি পা চালায়। আমরা ওদের অনুসরণ করি।

তবে এখনও সারি বেঁধে এগোতে হচ্ছে। একে তো সংকীর্ণ পথ, তার ওপরে ঘোড়াওয়ালাদের 'হোশ'। পদাতিকদের পক্ষে প্রকৃতই বিরক্তিকর।

আর তাই বোধহয় কয়েকজন পদযাত্রী পথ থেকে নেমে গিয়েছেন অমরগঙ্গার বেলাভূমিতে। ওখানে পদযাত্রীদের পায়ে পায়ে জলের ধারে ধারে সুন্দর একটি পায়ে-চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে হোশের উৎপাত নেই। তবু আমরা এই মূলপথ দিয়েই এগিয়ে চলি।

সকাল সওয়া আটটা বাজে। রোদ উঠে গিয়েছে। তার সোনালী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে পাহাড় ও অমরগঙ্গাকে। চারিদিকে সুন্দরের ছড়াছড়ি। কিন্তু কোথায় সেই পরমসুন্দর? সেই মঙ্গলময় শিবালয়?

অমরগঙ্গা পার হবার সময়ে সেই যে অমরতীর্থকে হারিয়ে ফেলেছি, তার পরে আর তাঁকে দেখতে পাই নি এখনও। বিশ মিনিট কেটে গেল, হাঁটছি তো হাঁটছিই। কোথায় আমার সেই মানসতীর্থ?

'Look ahead,
You are near the Goal.'

কোথায়? সাইনবোর্ডটার দিকে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই।

হ্যাঁ, ঐ তো। ঐ যে অমরতীর্থ—আমার মানসতীর্থ! পরমারাধ্য অমরনাথের গুহামন্দির!

যেখানে পৌঁছবার জন্য সকল বাধা উপেক্ষা করে ছুটে এসেছি, বিশ্বকর্মার সেই অপরূপ সৃষ্টি আমার সামনে। যাঁর কাছে আসার জন্য আমি অসুস্থ গৌতমকে ফেলে এসেছি, তিনি রয়েছেন ওখানে। কাছে, খুবই কাছে।

সাইনবোর্ড পেরিয়ে নেমে আসি একটুকরো সমতলে। এখানে-ওখানে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। সেগুলোকে ডিঙিয়ে কিংবা পাশ কাটিয়ে এগোতে একটু সময় লাগছে। এখন সাড়ে আটটা। ঠিক দু-ঘণ্টা হল আমরা পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়েছি।

আবার অমরতীর্থ হারিয়ে গেল। আমাদের যে নামতে হচ্ছে নিচের দিকে, বাঁদিকের পাহাড় থেকে একটা হিমবাহ নেমে এসেছে অমরগঙ্গায়। শক্ত বরফের সাদা হিমবাহ। তারই ওপরে ফুটখানেক চওড়া একটা ধাপ কেটে দেওয়া হয়েছে। সেই ধাপের ওপর দিয়ে যেতে হবে ওপারে।

"তবু যাহোক, একটু বরফ পাওয়া গেল।" তুলতুলের আনন্দ আর ধরে না। কি করবে, সে যে জীবনে কখনও বরফের ওপরে হাঁটবার সুযোগ পায় নি। তাই দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটাতে চাইছে।

হিমবাহটি মাত্র শ'খানেক ফুট চওড়া। নতিমাত্রা (Gradient) ৩০° ডিগ্রির বেশি হবে না। তবু অশোক তুলতুলকে সাবধান করে, "দেখো, সাবধানে যেও।"

"পড়ে গেলে মুশকিল হবে কিন্তু।" ব্রহ্মচারী যোগ করে।

কিন্তু ওদের সাবধানবাণী তুলতুলের কানে ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে না। সে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হেলে-দুলে হিমবাহের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। গৌরী এবং মায়াও একই ভাবে তুলতুলকে, অনুসরণ করছে।

না, মোটেই ভুল করছে না ওরা। ব্রহ্মচারী ও অশোকের আশঙ্কা অমূলক। কারণ আগেই বলেছি হিমবাহটির ঢাল তিরিশ ডিগ্রির বেশি নয়। খাদও বহু নিচে। সুতরাং পা-পিছলে পড়ে গেলেও তেমন কিছু হবে না।

শুধু তুলতুল নয়, আমরাও পুলকিত। এ যাত্রায় এই প্রথম পথে বরফ পেলাম। অথচ অনেকের মুখেই শুনেছি, তাঁরা যাত্রায় এসে সঙ্গমের পর থেকেই বরফ পেয়েছেন। এসব জায়গা তো নাকি বরফে ঢাকা থাকে।

হিমবাহ পেরিয়ে ওপরে উঠে আবার অমরতীর্থের সঙ্গে দেখা হল। এবারে আরও কাছে। বলতে গেলে আমরা তাঁর পাদদেশে পৌঁছে গিয়েছি। সামনে শুধু একফালি প্রায়-সমতল পাথুরে প্রান্তর।

নেমে আসি প্রান্তরে। বাঁয়ে পাহাড়, ডাইনে অমরগঙ্গা আর সামনে অমরতীর্থ। প্রান্তরটি খুব বড় নয়। তাহলেও তেরো হাজার ফুট উঁচুতে এতখানি সমতল খুব বেশি দেখা যায় না। এটাই অমরনাথের শিবিরক্ষেত্র বা ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড্। শ্বেতাঙ্গ দম্পতিরা এখানেই গতকাল রাত্রিবাস করেছেন। 'ইনট্যুর'-এর যাত্রীরাও এখানে রাত কাটিয়েছে। আমাদের সে সুযোগ নেই। সুতরাং এগিয়ে চলি।

প্রান্তরের প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে অমরতীর্থ। শত শত মানুষ সারি বেঁধে সেখানে চলেছেন। আমরা ধৈর্যহীন তবু তাড়াতাড়ি চলার উপায় নেই। প্রান্তরে যে মেলা বসেছে। মানুষ আর ঘোড়ার মেলা। অশ্বারোহীদের নামতে হচ্ছে এখানে। কেউ স্নান করতে যাচ্ছেন, কেউ স্নান শেষ করে জামা-কাপড় পালটাচ্ছেন। কেউ দর্শন করতে যাচ্ছেন, কেউ দর্শন করে এসে বিশ্রাম করছেন। কেউ বা চা কিংবা খাবার খাচ্ছেন। গুটিকয়েক চা ও খাবারের দোকান বসে গিয়েছে।

আমাদের খিদে পায় নি। তাছাড়া স্নান করে না খেয়ে বাবার কাছে যাওয়াই যে বিধেয়। আমরা না খেয়ে যাচ্ছি কিন্তু স্নান করব না। কেবল ভাগনে ও গৌরী বলে বসল, "আপনারা এগিয়ে যান, আমরা চট্ করে একটু স্নান করে নিই। মন্দিরে দেখা হবে।"

আপত্তি করা ঠিক নয়। আর আমরা যত উঁচুতে এসে থাকি, এখানকার জল যত ঠাণ্ডাই হয়ে থাক, স্নান করে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে না। শরীর সুস্থ রাখে মন। সেই মনের তাগিদে ভাগনে ও গৌরী স্নান করতে চলেছে। আমি নিজেও এমন স্নান বহুবার করেছি। কখনই কিছু হয় নি। বরং সেই শীতল-অবগাহন পুণ্যস্নানে পরিণত হয়ে দেহ ও মনকে আনন্দময় করে তুলেছে। গৌরীদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবে না।

গৌরীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। কয়েকপা উঠেই পথের বাঁদিকে একটা ঝরণা। ঝরণাধারা নেমে গিয়ে অমর-গঙ্গায় মিশেছে। এখানেও বেশ ভিড়। কেউ জল নিচ্ছেন, কেউ বা স্নান করছেন। জনৈক পুণ্যার্থী বললেন—এখানেই স্নান করার নিয়ম।

হতে পারে। কারণ ১৮৯০ সালে প্রকাশিত গেজেটীয়ারে পড়েছি—'in the Amr Veyut, the stream which flows at the bottom ; the men divest themselves of all clothing, and enter the cave either entirely naked, or with pieces of birch-bark, which do duty of fig-leaves. The women content themselves for the most part with laying aside all superfluous articles of clothing, and shrouding themselves in a long sheet or blanket.'

আমরা কেউ ভূর্জপত্র কিংবা কম্বল নিয়ে আসি নি। অতএব স্নান করছি না। কিন্তু মন্দিরে যাচ্ছি। অন্তত হাতমুখ ধুয়ে নেওয়া উচিত। তাই পাথর ডিঙিয়ে পায়ে পায়ে নেমে আসি ঝরণার তীরে। হাতমুখ ধুয়ে জল খেয়ে ওয়াটার-বটলে জল ভরে নিই—অমরতীর্থ অমরনাথের পুণ্যবারি।

আবার উঠে আসি পথে। এগিয়ে চলি গুহাতীর্থের দিকে। আমাদের আগে আগে সেই খোঁড়া ভদ্রলোক চলেছেন। অবাক কাণ্ড! তিনি যে কখন আমাদের ছাড়িয়ে এসেছেন! তাঁর তো এতক্ষণে দর্শন হয়ে যাবার কথা!

"ভদ্রলোক নিশ্চয় স্নান তর্পণ সেরে তবে গুহাতীর্থে চলেছেন।"

হয়তো মামার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু···। হ্যাঁ একটা 'কিন্তু' থেকে

যাচ্ছে। কেবল স্নান তর্পণের জন্যই তাঁর এত দেরি হয়েছে কি ?

পথের ধারে ধারে সাধুরা বসে আছেন। না, কেউ কিছু চাইছেন না। কি চাইবেন ? টাকা-পয়সা, খাবার-দাবার ? এখানে টাকা-পয়সা মূল্যহীন। আর এখানে এসে যে আমাদেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বোধ হারিয়ে গিয়েছে। ওঁরা তো লোভ-মোহ-কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই পথের পাশে বসে কেউ শাস্ত্রালোচনা করছেন, কেউ ভজন গাইছেন, কেউ বা ধ্যান করছেন।

শুরু হল সিঁড়ি। অমরগঙ্গার বেলাভূমি থেকে শ' তিনেক ফুট উঁচুতে অবস্থিত গুহাতীর্থ। শেষদিকে তার প্রায় একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ শ'খানেক ফুট জুড়ে এই সিঁড়ি—সোজা গুহায় উঠে গিয়েছে। শুনেছি একশ' ষাটখানি সিঁড়ি আছে এখানে। আমরা এখন সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। মানস-তীর্থপথের শেষাংশ অতিক্রম করছি।

সিঁড়িগুলি বেশ খাড়া। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে হচ্ছে। সেই ফাঁকে বারবার চেয়ে চেয়ে গুহাটিকে দেখছি। বিশ্বকর্মার বিচিত্র সৃষ্টি এই গুহামন্দির। আমরা বলি অমরতীর্থ, বৈজ্ঞানিকরা বলেন গুহা। তাঁরা বলেন—৩৪°১৩´ অক্ষরেখা ও ৭৫°৩২´ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই গিরিগুহা। পেছনের পাহাড়টির নাম অমরনাথ পর্বত। উচ্চতা ১৭,৩২১ ফুট। গুহার উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট। তার মানে গুহার ওপরে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। তাঁদের মতে বাতাসের ক্ষয়করণের (Erosion) ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই গুহা। উত্তর-পশ্চিম মুখী গুহা।

গুহাটির আকার নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আমরাও ফিতে নিয়ে আসি নি যে মেপে দেখব। তবে 'একই আকাশ ভুবন জুড়ে' গ্রন্থের লেখক বন্ধুবর দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত বলেছেন—'গুহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা শ'দেড়েক ফুট।' স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড্ এই গুহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন —'The Cave itself is of gypsum, and is fifty yards long by fifty broad at the mouth, and thirty. at the centre Inside is a frozen spring which is the object of worship…'

আমি অমরতীর্থে চলেছি। আর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরে, হ্যাঁ তারপরেই আমার শৈশবের স্বপ্ন সফল হবে। আজ কত কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে একাম্নবুই বছর আগে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ'-এর বর্ণনা—'অমরেশ্বরের গুহা। গুহায় প্রবেশ করিলে প্রথমে প্রায় ৫০ হাত সরল পথ। তাহার পর দক্ষিণ দিকে একটু ফিরিয়া আবার ১৬ হাত অগ্রসর হইতে হয়। গুহার ভিতর অত্যন্ত

শীতল ; উপর হইতে সর্বদাই টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল ঝরিতেছে। মহাদেবের স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ এইখানে—নির্মল স্ফটিকের ন্যায় ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে। কথিত আছে, চন্দ্রের মত এই শিবলিঙ্গের নাকি হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ণিমাতে মহাদেবের পূর্ণমূর্তি দেখা যায়। তাহার পর প্রতিপদ হইতে এক এক কলা করিয়া কমিয়া আসে। অমাবস্যাতে তুষার-লিঙ্গের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,…আবার শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে ঐ লিঙ্গ প্রত্যহ এক এক কলা করিয়া বাড়িতে থাকে।…এই স্থান জনশূন্য, অতিশয় ভয়ানক ; বার মাস তথায় কেহই থাকিতে পারে না। ক্বচিৎ যোগী-সন্ন্যাসীদের কেহ কেহ সেখানে তিন-চারি মাস অবস্থান করেন। তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে অমরনাথের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

'মহারাজা গোলাব সিংহ (কাশ্মীরের রাজা) একবার সেখানে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাদেব সর্পরূপে তাঁহাকে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হন। আরও প্রবাদ আছে, এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নাকি কপোতরূপও (শুক) ধারণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, সে কথা মিথ্যা। অমরনাথে যাইবার সময়ে পাণ্ডারা কতগুলি পায়রা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া লইয়া যায়। শেষে অমরনাথের গুহার কাছে উপস্থিত হইয়া সেই সকল পায়রা উড়াইয়া দেয়। যাত্রীরা কপোতরূপী মহাদেবকে দেখিয়া ভক্তি করে। অমরনাথে আরও কয়েকটি দেবদেবী এবং পাষাণময় বৃষের মূর্তি আছে।'

না, আমাদের সঙ্গে শুকপাখিদের সাক্ষাৎ হয় নি এখনও। আমার ধারণা কপোতরূপী মহাদেব নয়, সেই লীলাশুকের অমরত্ব প্রমাণ করার জন্যই পাণ্ডারা প্রতিবছর যাত্রার সময় একজোড়া পায়রা এনে ছেড়ে দেয় এখানে। অনেকেই সেই কপোত-কপোতীকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করেছেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছেন যে সেই শুকই শ্রীশুকদেব গোস্বামী। কাজেই শুকরূপে তাঁর অমরনাথ গুহায় অবস্থান সম্ভব নয়।

প্রায় এসে গিয়েছি। আর বড়জোর বিশ/পঁচিশ ধাপ সিঁড়ি বাকী আছে। তারপরেই আমরা গুহায় প্রবেশ করব। আজ আমার মনে পড়ছে উনআশি বছর আগের সেই দিনটির কথা, যেদিন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ এই গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। নিবেদিতা বলেছেন—স্বামীজী গুহায় প্রবেশ করলেন। হাসিমুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুবার দুদিক থেকে লিঙ্গমূর্তিকে প্রণাম করলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাঁর সামনে স্বর্গের দ্বার খুলে গিয়েছে।

পরে স্বামীজী সবাইকে বলেছেন যে, পাছে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন তাই

নিজেকে কসে ধরে রেখেছিলেন। সেদিন স্বামীজীর এত বেশি পরিশ্রম হয়েছিল যে তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারত। অথচ পরে একজন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেছেন, সেদিন থেকেই তাঁর হৃৎপিণ্ড চিরদিনের মতো বড় হয়ে গিয়েছে।

শেষ ধাপটি পেরিয়ে এলাম। উঠে এলাম ওপরে—অমরতীর্থের অলিন্দে। আমরা কি সত্যই সকল সংকীর্ণতার ওপরে উঠে আসতে পেরেছি?

একবার নিচের দিকে তাকাই। মাটি আর মানুষের জগৎ। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু। অমরগঙ্গা ও তার বেলাভূমি, ওপারের পাহাড় আর এপারের পথ—সবকিছু ছবির মতো। পথ বেয়ে শত শত মানুষ উঠে আসছেন এখানে, এই স্বপ্নের স্বর্গে—সকল পাপ ও তাপের ঊর্দ্ধে, অমরতীর্থ অমরনাথে।

কিন্তু না, আর নিচের কথা নয়, আমি যে ওপরে উঠে এসেছি। এখানের কথাও আর নয়। এবারে ভেতরে যাওয়া যাক। সতীর্থদের সঙ্গে প্রবেশ করি অমরতীর্থে।

গুহার ভেতরে আলো কম। তার ওপরে জলসিক্ত। কিন্তু পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। প্রথমেই একফালি সমতল। তারপরে কয়েক ফুট উঁচুতে আরেকফালি সমতল। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। দু-পাশে দু-সারি সিঁড়ি। একপাশে 'IN' ও আরেকপাশে 'OUT' লেখা। বেশি নয় পাঁচ-ছ' ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির দু-ধারেও কাঠ ও লোহার রেলিং। যাত্রার দিনে পঁচিশ/তিরিশ হাজার যাত্রী আসেন। তাই ভিড় এড়াবার জন্য এই রেলিঙের ব্যবস্থা। এতে অবশ্য গুহামন্দিরের কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধিও সাধিত হয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। আবার একফালি সমতল। তারপরে আরেকটি স্তর। সেখানেও লোহার রেলিং।

উঠে আসি তৃতীয় স্তরে। বলা বাহুল্য এ স্তরটি সবচেয়ে ছোট এবং এখানে আলো খুবই কম।

তাহলেও দেখতে পাচ্ছি তাঁকে—আমার প্রাণের পরমারাধ্যকে। যাঁকে দর্শন করতে, প্রণাম করতে, আলিঙ্গন করতে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি এই গহন-গিরি-কন্দরে, বাবা অমরনাথের সেই স্বয়ম্ভু সুধালিঙ্গ আমার সামনে। আমি তাঁকে দর্শন করি। অপরূপকে অবলোকন করি। আমার দু-নয়ন সার্থক হয়, মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে।

গুহার ডানদিকে প্রায় শেষপ্রান্তে সুধালিঙ্গ। সুকঠিন ও উজ্জ্বল বরফের লিঙ্গমূর্তি। তাঁর গায়ের রং সাদা হলেও রূপোলী নয়, ঈষৎ নীল। ফলে

[illegible] তুষারস্তূপের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং সুন্দর। তিনি যে সুন্দর, অনন্তসুন্দরের মূর্ত প্রতীক।

ভক্তদের ফুল ও বেলপাতার সজ্জায় তিনি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছেন। তাঁর শিয়রে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, মাথার ওপরে ঝুলছে ঘণ্টা। মাঝে মাঝেই ঘণ্টাধ্বনিতে ভক্তদের কোলাহল যাচ্ছে হারিয়ে।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তারই সামনে প্রায় দু-ফুট উঁচু গোলাকার যোনিপীঠ। পরিধি আট ফুটের মতো। সেখানেই তিনি রয়েছেন দাঁড়িয়ে। আজ তাঁর উচ্চতা সাড়ে তিন ফুটের মতো হবে। আমি দেখি, দু-চোখ ভরে দেখি আর মৃত্যুঞ্জয়কে আমার চোখের জলের নৈবেদ্য নিবেদন করি।

কেউ মন্ত্রপাঠ করছেন, কেউ ষোড়শ উপচারে পুজো করছেন। আমি যে মন্ত্র জানি নে, আমার তো কোন উপচার নেই। আমি শুধু আমার হৃদয়ের নির্যাস অশ্রু দিয়ে তোমাকে অন্তরে বরণ করে নিলাম।

ভক্তদের আবৃত্তি ও গানে মুখরিত মন্দির। মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনায় বিশ্বকর্মা সৃষ্ট অমরতীর্থ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত। ব্রহ্মচারী অমরনাথকে ইংরেজী অনুবাদ শোনাচ্ছে, গৌরী গান গাইছে, পরিতোষবাবু পুজো করছেন। সবাই কিছু না কিছু প্রার্থনা করছে। কেউ যশ চাইছে, কেউ জ্ঞান, কেউ অর্থ। আমি? আমার কি কিছুই চাইবার নেই অমরনাথজীর কাছে?

আছে। আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসি। যেমন করে শিলারূপী কেদারনাথকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছি, তেমনি করেই তুষাররূপী অমরনাথকে আলিঙ্গন করি।

স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, আমিও প্রণাম করছি তাঁকে। তাঁর কাছে আমি জগতের মঙ্গল কামনা করি। আর কাঁদতে কাঁদতে বলি—হে শুভ, হে মঙ্গল, হে করুণাময়! আমার গৌতমের ভাল-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত করে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি তাকে সুস্থ করে তোলো। আমি যেন পহেলগাঁয়ে ফিরে গিয়ে তার কুশল সংবাদ পাই।

কতক্ষণ পরে জানি না, কেউ ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে। আমার যেন সম্বিত ফিরে আসে। উঠে বসি। চোখ মুছি। আবার তাঁকে দর্শন করি। পুনরায় প্রণাম করি।

তারপরে উঠে আসাই। গুহার অপর প্রান্তে এসে পার্বতী ও গণেশের তুষারমূর্তি দর্শন করি, প্রণাম করি।

অমরতীর্থ অমরনাথ দর্শন সাঙ্গ হল আমার। কিন্তু সঙ্গীরা সকলেই পূজা প্রার্থনা ও ছবিতোলায় ব্যস্ত। কি করবে ওখানে যে বেজায় ভিড়। ক্যামেরা-ম্যানদের দাপটই বেশি। কেনই বা হবে না? তারা যে অমরনাথ দর্শনের প্রমাণ পেশ করার জন্য বহু বিশ্ববিখ্যাত ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে আমাদের ভাগনে পেরে উঠবে কেন?

সুতরাং সঙ্গীদের দেরি হবে। আমি তাই নেমে আসি নিচে—প্রথম স্তরে। এখানে ভিড় কম। ঠেলাঠেলি ও চিৎকার চেঁচামেচি তেমন নেই।

একপাশে একখানি পাথরের ওপর এসে বসি। বসে বসে ভাবতে থাকি নানা কথা—আজকের এই মধুর মুহূর্তের কথা। মনে পড়ছে স্বামীজীর কথা। অমরনাথ দর্শনের পরে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'I have enjoyed it so much....I thought that the ice-lingam was Siva Himself... I never enjoyed any religious place so much!'

তিনি বলেছিলেন—অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন। তুমি আজ বুঝতে পারছ না, কিন্তু একদিন বুঝতে পারবে। এইমাত্র তুমি যে তীর্থযাত্রা সুসম্পন্ন করলে, তার সুফল অবশ্য ফলবে। 'You have made the pilgrimage, and it will go on working. Causes must bring their effects You will understand better afterwards. The effects will come '

ভগিনী নিবেদিতা যা বুঝতে পারেন নি, আমার পক্ষে তা বুঝতে চাওয়া বাতুলতা। আমি শুধু জানি—স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হবার নয়। সঙ্গীরা সবাই অমরনাথ যাত্রার সুফল লাভ করবেন। এবং প্রাণের ঠাকুর আমার প্রার্থনাও পূর্ণ করবেন।

আর সেই সঙ্গে অমরতীর্থ অমরনাথের পুণ্যস্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে রইবে।

॥ সতরো ॥

স্বর্গ হতে বিদায় নিয়ে মর্ত্যে নেমে এসেই আবার স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল। মৃদু হেসে মিসেস ঝর্ণা মণ্ডল এক কাপ চা এগিয়ে দিলেন। চা দেহ ও মন দুয়েরই উপবাস ভঙ্গ করায়।

ঝর্ণাদেবীকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রান্তরের একপাশে একখানি পাথরে এসে বসি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভেবে চলি। না, অমরতীর্থ অমরনাথের কথা নয়, কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর কথা। এঁদের ব্যবস্থাপনা সত্যই প্রশংসনীয়। অমিতাভ, কিশলয় ও রাজকুমার তিনজন ম্যানেজার এখন এখানে। তারা এতক্ষণ তাদের সহকারী মদন, মাখন ও হরির সাহায্যে অশক্ত এবং দুর্বল যাত্রীদের দর্শন করিয়েছে। ইতিমধ্যে গণেশ ও বিষ্টু খাবাব ও চা তৈরি করে ফেলেছে। এবারে সবাই মিলে জলখাবার পরিবেশন করছে।

এই উচ্চতায় চার মাইল দুর্গম পথ পেরিয়ে ওবা নিজেরাই খাবার-দাবাব বাসনপত্র ও চা তৈরির সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে এসেছে। গুহায় উঠবার মুখে অমরগঙ্গার তীরে রীতিমত একটা ক্যান্টিন খুলে বসেছে। বলা বাহুল্য ঝর্ণাদেবী সানন্দে ক্যান্টিন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

"জ্যারা একমিনিট শুনিয়ে গা!"

তাকিয়ে দেখি সেই খোঁড়া ভদ্রলোক। তিনি আমাকেই ডাকছেন। খাবারের ঠোঙাটা হাতে নিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে আসি তাঁর কাছে।

ভদ্রলোক একটুকাল চুপ করে থাকেন। কি যেন একটু ভাবেন। তারপরে একহাতে নিজের পেট দেখিয়ে সলাজস্বরে হিন্দীতে বলেন, "বড্ড খিদে পেয়েছে। আজ তিনদিন খাবার জোটে নি।"

"তিন দিন কিছু না খেয়ে এই দুর্গম পথ পেরিয়েছেন!" আমি বিস্মিত।

বিস্মিত হবার কথাই বটে। প্রতিদিন পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। 'জয় বাবা অমরনাথ' বলে হাসিমুখে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গিয়েছেন। কোনদিন কিছু চান নি।

তবে আজও তাঁর মুখখানি হাসিমাখা। আজও একটু হেসে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। তবে কি জানেন, এ ক'দিন ঠিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ

ছিল না। শুধু আজ সকাল থেকে একটু দুর্বল লাগছিল, তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিলাম না। তাহলেও তেমন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু দর্শনের পরেই কেন যেন প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। সারা শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমাকে কিছু খেতে দেবেন ?"

তাই ভদ্রলোকের আজ পথে এত দেরি হয়েছে। অভুক্ত দেহে অবসন্ন শরীরে ঠিকমত হাঁটতে পারেন নি। কিন্তু সেকথা তাঁকে বলা নিষ্প্রয়োজন। ওঁর প্রয়োজন কিছু খাবারের। আমি পকেটে হাত দিই।

"কি ব্যাপার ?" ঝর্ণাদেবী এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন ?

খোঁড়া ভদ্রলোক অসহায় ভাবে আমার দিকে তাকান। অর্থ সুস্পষ্ট—তিনি চাইছেন না যে আমি কথাটা মিসেস মণ্ডলকে বলি। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সব শুনে মিসেস ভদ্রলোককে বলেন, "আপনি এদিকে আসুন !"

ভদ্রলোক দ্বিধা করেন।

ঝর্ণাদেবী বলেন, "আপনি পুণ্যাত্মা! আপনাকে ভোজন করাতে পারা পরম সৌভাগ্যের। আপনি আসুন, এখানে এসে বসুন।"

আমিও একই অনুরোধ করি।

তিনি আমাদের অনুরোধ রাখেন। ধীরে ধীরে এসে একখানি পাথরের ওপর বসেন।

মিসেস মণ্ডল ইসারা করেন। রাজকুমার ও অমিতাভ তাঁকে খাবার এনে দেয়, মায়া চা নিয়ে আসে।

ঝর্ণাদেবী জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?"

ভদ্রলোক জবাব দিতে পারেন না। খাওয়াও শুরু করতে পারেন নি তিনি। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুধারা নেমে এসেছে।

মিসেস মৃদুকণ্ঠে তিরস্কার করেন, "ছিঃ বাবা! আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনি খঞ্জ এবং দরিদ্র, কিন্তু তীর্থের দেবতা ডাক দিয়েছেন আপনাকে, আপনি তাঁকে দর্শন করেছেন। তিনিই তাঁর ভক্তকে খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনি তাঁর দান গ্রহণ করুন, আপনি খান।"

ভদ্রলোক চোখ মুছে খেতে আরম্ভ করেন। আমরা মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। আর ভাবি, ঝর্ণাদেবী ঠিকই বলেছেন—তীর্থের দেবতা ডাক না দিলে তীর্থদর্শন হয় না।

ভদ্রলোক নিঃশব্দে খেয়ে চলেছেন।

"আপনি ঠিকই বলেছেন মা, এবারে বাবা অমরনাথ ডাক দিয়েছিলেন আমাকে।" ভদ্রলোক মিসেস মণ্ডলকে বলছেন, "আমি দিল্লীর মানুষ, একটা মাইনর স্কুলের দরিদ্র শিক্ষক। বহুকাল থেকে অমরনাথজীকে দর্শন করার বাসনা। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পাথেয় সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। এবারে কি যেন মনে হল, যা ছিল তাই নিয়েই পথে বেরিয়ে পড়লাম। বাবার অসীম দয়া, দর্শন হয়ে গেল।" তাঁর চোখে-মুখে পরম প্রশান্তির পরশ।

আমারও যে একই কথা। তিনি ডাক দিয়েছিলেন বলে তো আমারও তীর্থদর্শন হল। তীর্থের দেবতা ডাক দিলে তীর্থদর্শন হবেই এ সত্যটি জীবনে আমি আরেকবার প্রত্যক্ষ করলাম।

"কিন্তু এখন ঘরে ফিরবেন কেমন করে?" মায়া জিজ্ঞেস করে, "বাসভাড়া, রেলভাড়া, পথের খাবার!"

ভদ্রলোকের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ক্রাচে ভর করে তিনি একপায়ে উঠে দাঁড়ান। একটু হেসে বলেন। "ওসব নিয়ে আপনারা ভাববেন না মা! যিনি ডেকে এনেছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

তিনি আমাদের নমস্কার করেন। তারপরে বলেন, "জয় বাবা অমরনাথ!"

তিনি পথ-চলা শুরু করেন।

"একটা কথা!" মিসেস এগিয়ে যান তাঁর দিকে।

ভদ্রলোক থেমে পেছন ফেরেন। বলেন, "কি কথা মা!"

"ফেরার পথে এ-দু'দিন যদি পঞ্চতরণী শেষনাগ ও চন্দনবাড়িতে আপনি আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন, তাহলে বড়ই খুশি হব।"

"বেশ মা! তাই হবে।"

"আরেকটা অনুরোধ।"

"বলুন।"

"আমরা রিজার্ভড বাসে জম্মু যাবো, সেখানে আমাদের রেলওয়ে কোচ্ রয়েছে। আমরা দিল্লী হয়েই কলকাতা ফিরব। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না?"

ভদ্রলোক আবার হাসেন। বলেন, "আপাতত পহেলগাঁও পর্যন্ত আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করলাম, তারপরে দিল্লীর কথা ভাবা যাবে।"

তিনি আবার নমস্কার করেন। বলেন, "জয় বাবা অমরনাথ!"

"জয় অমরনাথ!" আমরা প্রতি নমস্কার করি।

তিনি চলতে শুরু করেন। আমরা মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি বাবা অমর-

নাথের প্রবীণ ও খঞ্জ ভক্তটির দিকে।

চমক ভাঙে। এবারে যে আমারও রওনা হওয়া দরকার। সওয়া দশটা বাজে। আজ আরও বারো মাইল হাঁটতে হবে। তার মধ্যে খাবার জন্য পঞ্চতরণীতে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য থামতে হবে। সহযাত্রীরা সবাই রওনা হয়ে গিয়েছে।

না, সবাই রওনা হয় নি। পরিতোষবাবু অপর্ণা ও অসীম রয়েছে। ঝর্ণা-দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে শুরু করি পথ-চলা। সেই পথ। যেপথে অমরনাথ এসেছিলাম। সেই পথে ফিরে চলেছি শেষনাগ। কিন্তু দুয়ের মাঝে অনেক তফাৎ। তখন ছিল স্বর্গের পথ, এখন মর্ত্যের। তখন ছিল তীর্থের পথ, এখন ঘরের। তখন ছিল মুক্তির পথ, এখন আসক্তির।

কিন্তু আসক্তির কথা থাক। মায়াবদ্ধ মানুষ হলেও স্বর্গ এবং মর্ত্য দুই-ই আমার কাছে সমান প্রিয়। মর্ত্যের খেলা সাঙ্গ হলে হাসতে হাসতে স্বর্গে ফিরে আসব। অতএব স্বর্গের কথা আলোচনা করতে করতেই আপাতত মর্ত্যে ফেরা যাক।

তাই পরিতোষবাবুকে প্রশ্ন করি, "আপনি শিবের উপাসক, সাধক মানুষ। শৈবতীর্থ অমরনাথ দর্শন করে ঘরে ফিরছেন। এখন আপনার কি মনে হচ্ছে?"

না, তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেন না। কোন রকম প্রস্তাবনা ছাড়াই পরিতোষবাবু শুরু করেন, "বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা তুষারতীর্থ অমরনাথ ও মরুতীর্থ হিংলাজ দর্শন করব। হিংলাজ দর্শন সম্ভব হবে না বুঝতে পারার পর থেকে অমরনাথের প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। ওঁকে আমার দর্শন করতে হবে। দুর্গম পথ অতিক্রম করতেই হবে।"

একবার থামলেন পরিতোষবাবু। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহাদেবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে। সেগুলো সবই কোনো না কোনো মানুষের আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অমরনাথ কোনো সাধকের সাধনার প্রতিষ্ঠা নয়। এখানে শিব স্বয়ম্ভু, তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত। ফলে এখানে প্রাণের ধর্ম, মানুষের ধর্ম স্থাপিত। এখানে কোন জাতি ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ নেই। অমরনাথ মহামানবের মুক্তিতীর্থ। সবার হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াবার শ্রেষ্ঠ স্থান অমরনাথধাম। মানুষ এখানে এসে অমরত্ব অনুভব করে।

তাই আমি এসেছিলাম এখানে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি বাসনা ছিল।"

"কি?" প্রশ্ন করি।

পরিতোষবাবু উত্তর দেন, "ভেবেছিলাম এই সঙ্গে পীঠস্থানটিও দর্শন করব, যেখানে দেবী মহামায়ার কণ্ঠ পতিত হয়েছে, যেখানে ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর রূপে বিরাজ করছেন, যে পীঠস্থানের তীর্থক্ষেত্র অমরনাথ।"

"কোথায় সেই পীঠস্থান ?"

"ঠিক বলতে পারব না, শুধু জানি যেখান থেকে হিন্দুকুশ পর্বত আরম্ভ, সেখানে।"

"আপনি কি দর্শন করেছেন ?" অপর্ণা জিজ্ঞেস করে।

পরিতোষবাবু উত্তর দেন, "না। কিন্তু সেকথা পরে বলব, এখন অন্য কথা বলে নিই।"

"বেশ বলুন।"

"ভেবেছিলাম, অমরবাণী প্রকাশের জন্য স্বয়ং মহাদেব যে পুণ্যস্থান নির্বাচন করেছিলেন, আমাকে দেখে যেতে হবে সে স্থানটি কত নির্জন কত গোপন।"

আবার থামলেন পরিতোষবাবু। তারপরে বলতে থাকলেন, "অমরনাথ দর্শন অর্থাৎ এই তীর্থযাত্রার কথা ভাবতে গেলে বহু কথা মনে পড়ে। সব কথা বলার সুযোগ নেই এখন, শুধু আজকের কথা—আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনটির কিছু কথা আপনাকে বলছি।"

"বেশ বলুন।" আমি চলতে চলতে বলি।

ইতিমধ্যে আমাদের চড়াইপথ শেষ হয়েছে। আমরা উঠে এসেছি ভৈরব-ঘাটিতে। এবারে নেমে চলছি পঞ্চতরণীর দিকে। এখন বেলা এগারোটা।

পরিতোষবাবু শুরু করেন, "আজ ভৈরবঘাটি পৌঁছতে খুবই কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অমরগঙ্গাকে দর্শন করে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিশ্রম দূর হয়ে গেল। সে সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু বলি আপনা হতেই আমার মাথা নত হয়ে এলো। মনে হল চিরজীবন এখানে কাটাতে পারলে, আর কিছু চাই না।

গুহার সামনে পৌঁছে দেখা হল আপনার বৌদি এবং অপর্ণা ও মীরার সঙ্গে। বেলা বাড়লে ভিড় বাড়বে। তাই ভাবলাম আগে বাবাকে দর্শন করে পরে অমরগঙ্গায় স্নান ও তর্পণ করব। কিন্তু আপনার বৌদি স্নান না করে মন্দিরে যাবে না। কাজেই সে অবগাহন স্নান করল আর আমি অপর্ণা ও মীরা অষ্টাঙ্গ স্নান করলাম। তারপরে রওনা হলাম মন্দিরে। আমার মন আনন্দে ভরে উঠল—বাবার দর্শন পাবো। আমার মতো ক্ষুদ্রজীবের প্রতিও বাবার কত দয়া!

তারপরে, হ্যাঁ তারপরে একসময় মন্দিরে প্রবেশ করলাম। বাবার পুজো করলাম। যাদের নামে পুজো দেবার কথা ছিল, তাদের সবার মঙ্গলের জন্য পুজা করলাম।

পূজাপাঠের পরে গুহায় বসে একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেখানে বসে মহেশ্বর দেবী ভগবতীকে অমরতত্ত্ব শোনাচ্ছেন। সেখানে কোনো তুষারলিঙ্গ নেই। থাকবে কেমন করে? তখন তো তুষারলিঙ্গ ছিল না, ছিলেন স্বয়ং শিব। তুষারলিঙ্গ তো বাবার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য, তাঁর ইচ্ছায় পরে গড়ে উঠেছে।

আমার জীবন সার্থক হল। অমরতীর্থ দর্শন করে বুঝতে পারলাম, আত্মা অমর। তাকে জানতে পারা মানেই তো অমরকাহিনী জানতে পারা। দেহ পচনশীল। তবু জীবমাত্রই অমর। কারণ আত্মা অবিনশ্বর।"

থামলেন পরিতোষবাবু। আমরা নেমে এসেছি পঞ্চতরণীর সমতলে। দূরে তাঁবুর মেলা দেখা যাচ্ছে। বেলা সওয়া এগারোটা। আর মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা শিবিরে পৌঁছে যাবো। যাবার সময় যে পথটুকু যেতে আড়াই ঘণ্টা লেগেছে, ফেরার পথে সেটুকু আসতে মাত্র সওয়া ঘণ্টা লাগল।

কিন্তু এখনও তার কয়েক মিনিট বাকি আছে। তাই পরিতোষবাবুকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি সেই পীঠস্থান দর্শন করেছেন?"

"না।" তিনি উত্তর দেন। বলেন, "গুহা থেকে নেমে অমরগঙ্গায় স্নান করে তর্পণ করলাম, জপ সেরে নিলাম। তারপরে সেই পীঠস্থান অর্থাৎ দেবী কণ্ঠেশ্বরীর মন্দির খোঁজ করতে শুরু করলাম। বহুজনকে জিজ্ঞেস করার পরে একজন সাধু জানালেন—শুনেছি এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে সেই পীঠস্থান, আমি নিজে কখনও যাই নি। কিছুক্ষণ আগে দু-জন সাধু রওনা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন না, কারণ পথ বলে কিছু নেই। অগত্যা অমরগঙ্গার তীরে চণ্ডীপাঠ শেষ করেই ফিরে চলেছি ঘরে।"

খাওয়া-দাওয়া করে পঞ্চতরণী থেকে রওনা হতে দুপুর পৌনে একটা বেজে গেল। তুলতুল গৌরী মায়া ব্রহ্মচারী সরকারদা এমন কি অসীম পর্যন্ত আগে রওনা হয়ে গিয়েছে। পরিতোষবাবু বোসবাবু ও অজিতরাও সস্ত্রীক এগিয়ে গেছে। যাবেই তো, আট মাইল পথ পেরোতে হবে। তার মধ্যে পাঁচ মাইল

চড়াই, তিন হাজার ফুট চড়াই ভেঙে উঠতে হবে মহাগুণাস গিরিবর্ত্মে। অতএব ওরা ঠিকই করেছে।

আমার দেরি হয়েছে অপর্ণার জন্য। অপর্ণার ব্যাগটি ঘোড়ার পিঠ থেকে কোথায় যেন পড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ওর এবং মীরার কাপড়-চোপড় টর্চ প্রভৃতি প্রচুর প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। কিন্তু বৃথাই এতক্ষণ পঞ্চতরণীতে খোঁজ-খবর করা হল। ব্যাগ পাওয়া গেল না। ঘোড়াওয়ালার সেই এক কথা—মালুম নহী।

যাই হোক, অপর্ণা অশোক ও মামা-ভাগনের সঙ্গে শেষপর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছি পথে। অপর্ণার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। সে মাঝে মাঝেই বেড়াতে বের হয়। জিনিসগুলো তার খুবই দরকারী। অথচ কৃষ্ণনগরের অবিবাহিতা স্কুল শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে সেগুলো আবার কিনে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়।

সুতরাং তাকে অন্যমনস্ক করে তুলবার জন্য প্রশ্ন করে ফেলি, "আচ্ছা, আপনি কেন অমরনাথে এলেন?"

মনের অবস্থা যা-ই হোক, অপর্ণা কিন্তু শান্তস্বরে উত্তর দেয়, "ভ্রমণের নেশা ও প্রকৃতির পরম-বিস্ময় তুষারলিঙ্গ দর্শনের জন্যই আমি অমরনাথে এসেছি।"

"এর আগে আপনি কি আর কখনও হিমালয়ে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। দার্জিলিং সিমলা ও কেদার-বদ্রী গিয়েছি।—কাশ্মীরেও এসেছি আরেকবার।"

"আচ্ছা, হিমালয়কে আপনার এত ভাল লাগে কেন যে বার বার হিমালয়ে আসছেন?"

"হিমালয় আমার ভাল লাগে, খুব ভাল। আমি হিমালয়কে ভালোবাসি। ভালোবাসা উপলব্ধির বস্তু, সুতরাং ভালোবাসার কারণ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"

কথাটা মিথ্যে বলে নি অপর্ণা, সুতরাং একটু লজ্জা পাই। তাহলেও আবার জিজ্ঞেস করি, "অমরনাথের পথ সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"পথ খারাপ নয়। তবে কেদার-বদ্রীর পথের মতো মাঝে মাঝে চা ও খাবারের দোকান থাকা দরকার। পিসু টপ্, যোযিপাল ও পৌষপাথর ছাড়া পথে আর কোথাও চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই। আর নেই জল। এপথে ঝর্ণা বড়ই কম।"

"চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ আসার পথে একজন বাঙালী যুবককে একঢোক জল দিয়েছিলাম। জল খেয়ে যুবকটি বললেন—দিদি প্রাণে বাঁচালেন। বাবা

অমরনাথ আপনার মঙ্গল করবেন। জানেন কিছুক্ষণ আগে কয়েকটি কলেজের মেয়ের কাছে একটু জল চেয়েছিলাম। তারা জল তো দিলই না, উপরন্তু উপদেশ দিল, সঙ্গে জল আনা উচিত ছিল।"

একবার থামে অপর্ণা, তারপরে আবার বলে, "এবারে সরকারী ব্যবস্থা খুব সুবিধের নয়। তবু সেদিন পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি যাবার সময় একজন প্রবীণ যাত্রীকে পথের ধারে লাল কাপড় পেতে শুইয়ে অক্সিজেন দিতে দেখেছি। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, আবার শুরু করলেন পদযাত্রা।

আর চন্দনবাড়ির পথেই একটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছি।"

"কি?" ভাগনে জিজ্ঞেস করে।

অপর্ণা উত্তর দেয়, "দেখলাম পথের পাশে একজন মোটা মানুষকে হলুদ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভদ্রলোক বম্বের বাসিন্দা, ব্লাড প্রেসারের রোগী। যাত্রায় আসছিলেন, ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন। ঘোড়াওয়ালা পলাতক। ভদ্রলোকের ছোট ভাই পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন। আমাদের ডাক্তার ভদ্রলোককে পরীক্ষা করে ডেথ্ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।"

থামল অপর্ণা। আমি বলি, "যাত্রাপথে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ছে আপনার?"

"হ্যাঁ।" অপর্ণা বলে, "সেটা পরদিনের, এই পথের।"

"শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণী যাবার সময়ের অর্থাৎ গতকালের।" ভাগনে যোগ করে।

অপর্ণা মাথা নাড়ে।

আমি বলি, "ঘটনাটা বলুন।"

"ও! তাও তো বটে।" অপর্ণা একবার হাসে। তারপরে বলতে থাকে, "গতকাল মহাগুণাস পার হবার পর থেকে বড়ই অসুস্থ বোধ করছিলাম। অল্পক্ষণ পরে পরেই আমাকে পথের ওপর বসে পড়তে হচ্ছিল। ক্রমে সঙ্গীদের থেকে অনেক পেছিয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে দিনের আলো মিলিয়ে গেল, নামল আঁধার। একে অন্ধকার তার ওপর নির্জন পাহাড়ী পথ। মাঝে মাঝে দু-চারজন ঘোড়সওয়ার আমাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। কেমন করে তাকাবে? সবারই শ্রান্ত দেহ, অচেনা দুর্গম পথ। সবাই নিজের চিন্তায় অস্থির।

কিন্তু না, আজও জগতে অপরের বোঝা বইবার জন্য দু-চারজন মানুষ

পাওয়া যায়। তাদেরই দুজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজনেই অবাঙালী যুবক। তারা আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তাদের কাছে একটা বড় টর্চ ছিল।

একজন আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে আমার সামনে সামনে চললো, আরেকজন রইল পেছনে। আমার কষ্ট লাঘবের জন্য সে মাঝে মাঝে বলতে থাকল—ওঁ নমঃ শিবায়। আর আমি দাঁড়িয়ে পড়লেই পথপ্রদর্শক আমাকে উৎসাহ দিতে থাকল—আরাম কর লো দিদি! ধীরে ধীরে চলো!

এই ভাবে চলতে চলতে বাবা অমরনাথের কৃপায় রাত ন'টার সময় আমার যন্ত্রণার অবসান হল। তারপরে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি হেঁটে রাত দশটা নাগাদ পৌছলাম পঞ্চতরণী। যুবকদুটি আমাকে তাঁবুতে পৌছে দিয়ে, তবে নিজেদের আস্তানার খোঁজে গেল। জানি না তারা অত রাতে আশ্রয় পেয়েছে কিনা।"

"আজ তাদের সঙ্গে দেখা হয় নি?" মামা জিজ্ঞেস করে।

"কি জানি, হয়তো হয়েছে কিন্তু চিনতে পারি নি।"

"মানে!" আমরা বিস্মিত।

অপর্ণা বলে, "কাল অতক্ষণ একসঙ্গে পথ চলেছি, অথচ আমি ওদের নাম জিজ্ঞেস করি নি। তাছাড়া পঞ্চতরণী উপত্যকায় চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু আমরা কেউ কারও মুখের দিকে তাকাই নি। তাই আজ তাদের সঙ্গে দেখা হলেও চিনতে পারি নি।"

বিচিত্র ব্যাপার! নিঃশব্দে পথ চলতে থাকি।

একটু বাদে অপর্ণা আবার বলে, "আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?"

"কি?"

"বাবা অমরনাথজী ওদের পাঠিয়েছিলেন আমাকে সাহায্য করতে।"

'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' নীরবে এগিয়ে চলি মহাগুণাসের পথে।

বিকেল সওয়া চারটার সময় মহাগুণাস পৌছলাম। আজ পঞ্চতরণী থেকে এই পাঁচ মাইল আসতে সাড়ে তিনঘণ্টা সময় লাগল। ভালই এসেছি। কারণ এর মধ্যে তিন হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হয়েছে। তাছাড়া এর আগেও আজ আট মাইল চড়াই-উৎরাই করতে হয়েছে। গল্প করতে করতে পথ চলেছি বলে পথকষ্ট টের পাই নি।

কয়েক মিনিট বিশ্রামের পরেই মামা মনে করিয়ে দেয়, "আকাশের অবস্থা ভাল নয়, আর দেরি করা উচিত হবে না।"

মামা অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিক। আকাশের অবস্থা সত্যই ভাল নয়, যে-কোন সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। অতএব বিদায় নিই মহাগুণাসের কাছ থেকে। বিদায় নিই সেই প্রস্তরীভূত প্রকৃতি-প্রেমিক পুণ্যাত্মার কাছ থেকে। তাঁকে বলি—তোমার কৃপায় সুধালিঙ্গ দর্শন করেছি। এবারে আশীর্বাদ করো, আমি যেন পহেলগাঁও ফিরে গিয়ে গৌতমের কুশল সংবাদ পাই।

এগিয়ে চলেছি উৎরাই পথে। মামা চলেছে আমার আগে আগে। তার মাথায় বালাক্লাভা, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা কিন্তু পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী ও চাদর। আমি সারা বছর ধুতি পরেও পহেলগাঁয়ে পৌঁছে প্যান্টের শরণ নিয়েছি, আর সে কিনা সত্যি সত্যি বাবু সেজে বহাল তবিয়তে বাবার সঙ্গে দেখা করে এলো!

ধুতি নয়, তবে পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে আরও একজন অমরনাথ চলেছে। —কুণ্ডু ট্র্যাভেলস-এর অন্যতম ম্যানেজার গোপাল চক্রবর্তী। কিছুক্ষণ আগে দেখা হল তার সঙ্গে। আমাদের পরের দলকে নিয়ে সে আজ পঞ্চতরণী চলে গেল। গোপালের সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধু দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী আভাদেবী। দেবীপ্রসাদ তো বটেই আভাদেবীও হেঁটে যাচ্ছেন দেখে আমার সঙ্গীরা খুব খুশি হয়েছিল। তারা তখনও জানত না যে দেবী শুধু ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নয়, একজন অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিক। এবারেও সে সস্ত্রীক লাদাক বেড়িয়ে এসেছে। সুতরাং তার সহধর্মিণীর পক্ষে ঘোড়সওয়ার না হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু গাঙ্গুলিদের কথা এখন থাক। তাদের সঙ্গে আবার আমার শ্রীনগরে দেখা হবে। অতএব মামার কথায় ফিরে আসা যাক। কথায় কথায় মামাকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি তো বাবু বেশে বাবাকে দর্শন করে এলে, এবারে এই যাত্রা সম্পর্কে কিছু বলো।"

"ঘোষদা, এইবার সত্যি বিপদে পড়লাম।" মামা যেন আঁতকে ওঠে। বলে, "হিমালয়কে ভালোবাসি, তাই হিমালয়ে আসি। এসে দেবানুগ্রহ লাভ করি, তারপরে ঘরে ফিরে যাই। ও-সব বলা-টলা আমার পোষায় না। তার চেয়ে বরং ভাগনে কিছু বলুক।"

ভাগনে কিন্তু মামার মতো আপত্তি করে না। একবার অনুরোধ করতেই সে বলতে শুরু করে, "ব্যক্তিগত জীবনে আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। স্বামীজী অমরনাথ এসেছিলেন, সুতরাং অমরনাথ দর্শনের বাসনা আমার বহুদিনের। শুনেছিলাম অমরনাথ যাত্রায় জীবন আছে, রোমাঞ্চ আছে কিন্তু এটি দুঃসাহসিক

কাজ। তাই পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করার পরে বারবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি পারব তো?

উত্তর পাই নি। তবে ভেবেছি আমার সাধনা নেই কিন্তু বিশ্বাস আছে। আমি বিশ্বাস করি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। আমি সারা পথে তা-ই করেছি।

চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগের পথে চলতে চলতে বারবার মনে হয়েছে, বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃতির কাছে এখনও কত অসহায়? আবার শেষনাগের স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখে ভেবেছি—প্রকৃতি মানুষের চেয়ে কত সুন্দর? আর সেই প্রকৃতির যিনি নিয়ন্তা? তিনি কত সুন্দর, কত শক্তিশালী? যাতায়াতের পথে মহাগুণাসে বসে আপনাদের কি মনে হয়েছে জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে—তিনি শক্তি না দিলে আমার পক্ষে অমরনাথজীকে দর্শন করা সম্ভব হত না।"

একবার থামে ভাগনে। আমিও চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই, তার মুখের দিকে তাকাই। সে আবার বলতে শুরু করে, "কাল বিকেলে কিছুক্ষণ পঞ্চতরণীর পঞ্চধারার পাশে বসেছিলাম। দেখছিলাম কত বিচিত্র ধরণের পাথর আছে হিমালয়ে। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই সংখ্যাতীত প্রস্তরখণ্ডের একখানির সঙ্গে আরেকখানির কোন মিল নেই। তেমনি পৃথিবীতে কত মানুষ, কিন্তু কোটি কোটি মানুষেরও আকৃতি ও প্রকৃতিতে কারও সঙ্গে কারও নেই কোন মিল।"

একটুকাল চুপ করে থেকে ভাগনে আবার কি যেন ভাবে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, "আপনি জানেন ঘোষদা, স্বামী বিবেকানন্দজী পঞ্চতরণীতে স্নান করে কেবল মাত্র কৌপিন পরে অমরনাথে গিয়েছিলেন। সেখানেও সেই অবস্থায় অমরগঙ্গায় স্নান করে তিনি অমরনাথজীকে দর্শন করেছেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

ভাগনে বলে চলে, "আমার অতখানি সাধ্য নেই। কিন্তু আমিও আজ অমরগঙ্গায় স্নান করেছি। এবং আপনি বিশ্বেস করুন, আমার কোন কষ্ট হয় নি। বরং আমার সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে গেছে। এ তো তাঁর কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই অমরনাথজীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল সামলাতে পারি নি। হয়তো কেউ পারে না।"

॥ আঠারো ॥

শেষনাগ, তোমার শুভেচ্ছায় সুধালিঙ্গ দর্শন করে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছি তোমার কাছে। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। তুমি আশীর্বাদ করো—আমরা যেন নির্বিঘ্নে ফিরতে পারি ঘরে, গৌতমকে গিয়ে ভাল দেখতে পাই।

বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি চন্দনবাড়ির পথে। এখন সকাল পৌনে আটটা।

গতকাল বিকেল ছ'টায় শেষনাগ পৌঁচেছি। তার মানে যাবার সময় যে পথটুকু যেতে সাতঘণ্টা লেগেছিল, ফেরার পথে সেটুকু আসতে মাত্র পাঁচঘণ্টা লেগেছে। আরও কম লাগত কিন্তু শেষদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল। কাল সব মিলিয়ে ষোল মাইল হেঁটেছি। তাই তাঁবুতে ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে রয়েছি।

কিন্তু তারপরেই আকাশে চাঁদ উঠেছে। শেষনাগ রূপান্তরিত হয়েছে স্বর্গীয় সরোবরে। সকল শ্রান্তি বিস্মৃত হয়ে তার তীরে গিয়ে বসেছি। কেমন একটা অপার্থিব অনুভূতি আমার দেহ ও মনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আজ সেই শেষনাগের কাছ থেকে শেষবারের মতো নিতে হল বিদায়।

বিদায় বেলায় তোমাকে শুধু বলে যাই শেষনাগ—একটু বাদেই আমি তোমাকে আর দেখতে পাবো না কিন্তু তোমাকে অনুভব করব। শুধু আজ নয়, চিরদিন। আমরণ তুমি আমার অনুভূতিতে দৃশ্যমান হয়ে রইবে।

সঙ্গীরা অনেকেই এগিয়ে গিয়েছে। আমরা আটজন শুধু এখন রয়েছি একসঙ্গে—তুলতুল গৌরী ব্রহ্মচারী অসীম অশোক মামা-ভাগনে ও আমি। তুলতুলের কথাই ভাবছিলাম চলতে চলতে। সত্যি সত্যি সে আর ঘোড়ায় উঠল না।

আরে, তাই তো! ওর কাছ থেকে তো কিছু শোনা হল না। সেই কথাই ওকে বলি।

দু-একবার মৃদু আপত্তি করে তুলতুল বলতে থাকে, "পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পরে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কখনও ভাবি নি, অমরনাথ আসব। ফকিরকাকুই প্রথম অমরনাথের প্রস্তাব দিলেন। বললেন—দারুণ লাগবে। বাবা-মা'র সঙ্গে আমিও রাজী হয়ে গেলাম। এইখানে বলে রাখি—

আমি কিন্তু পুণ্যার্জনের জন্য আসি নি, এসেছি 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার' করতে আর হিমালয়কে দেখতে।

তাই ট্রেনে উঠে আমার সমবয়সী কাউকে না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু আমার ইচ্ছে হেঁটে যাবার। অথচ সঙ্গী কোথায়?

তারপরে শুনলাম—আপনারা হেঁটে যাবেন। আপনারা সবাই আমার চেয়ে অনেক বড়। তবু সাহস করে আপনাকে বলে ফেললাম—আমি আপনাদের সঙ্গী হব। আপনি শুধু রাজী হলেন না, আমাকে উৎসাহ দিলেন। আমার ভাল লাগল।

প্রথমদিন যাত্রার সময় সঙ্গীরা প্রায় সবাই আমার স্বল্প পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পথ-চলার পরে সবাই আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। আর সেই থেকে আপনারা আমার আবদারের অত্যাচার সমানে সয়ে চলেছেন।

এর আগে কখনও পাহাড়ী পথে এমন হাঁটি নি। তাই প্রথম দিন বেশ কষ্ট হচ্ছিল পথ চলতে, কিন্তু সেকথা কাউকে বলি নি। বললেই তো অসীমদা ঘোড়ায় চড়িয়ে দিতেন। সত্যি বলতে কি, আমার একটা ভীষণ জেদ চেপে গিয়েছিল। মা'র ধারণা আমি হাঁটতে পারি না। সেই ধারণা পালটাতে হবে। তাছাড়া আপনারা আমার চেয়ে বড়, আপনাদের সামনে ঘোড়ায় চড়া রীতিমত অসম্মানজনক।

যাবার সময় সত্যি বুঝি নি, কি দেখতে কিংবা কি পেতে যাচ্ছি? চন্দনবাড়ি পৌঁছে ভারী মজা লাগল। কিন্তু শুনলাম পরদিন পিস্থু পার হতে হবে। পিস্থু চড়াই বাজে রাস্তা, দারুণ কঠিন রাস্তা। সেই ধারণা নিয়েই পরদিন রওনা হলাম। কিন্তু কি বলব, সারাপথে পিস্থু চড়াই আমি সবচেয়ে বেশি enjoy করেছি। কালো মাটি আর পাথরের পথ। এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে। একদিকে গভীর খাদ, আরেকদিকে খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল। ওপরে অনন্ত নীলাকাশ। কি যে সুন্দর লাগছিল আমার, কি যে ভাল লাগছিল! সমস্ত পথটা যেন একখানি সুন্দর গানের মতো। আপনারা তো জানেন, আমি গান গাইতে গাইতেই পিস্থু পার হয়েছি।"

আমি মাথা নাড়ি।

ভুলভুল বলতে থাকে, "জানেন, তখন আমার নিজেকে খুব উদার, খুব ভাল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যে-কোন কঠিন কাজ এক নিমেষে করে ফেলতে পারি।

পিস্থ পার হবার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ তখন ভেবেছিলাম পিস্থ সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু সামনে যে আরও সুন্দর আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তা কে জানত?

পৌঁছলাম পাহাড়ে ঘেরা শেষনাগের তীরে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন নরুণ দিয়ে সমান করে পাহাড়গুলো কেটে দিয়েছে। কি আশ্চর্য সুন্দর! বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। শেষনাগের সৌন্দর্য শুধু চোখে দেখি নি, সমস্ত সত্বা দিয়ে অনুভব করেছি—আজও করছি, চিরকাল করব।

পরদিন মহাগুণাস পার হলাম। মনে মনে খুব একটা গর্ব হল। নিজেকে পর্বতারোহিণী বলে ভাবতে শুরু করলাম। তারপরে পৌঁছলাম পোষপাথর। বসলাম সেই ঝরণার তীরে। হাতমুখ ধুয়ে প্রাণভরে অমৃত পান করলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আনন্দের সময়গুলো কেন যে এত তাড়াতাড়ি চলে যায়? তাই সেদিন সেই আনন্দের লগ্নটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য আপনাদের সবাইকে চা খাইয়ে ফেললাম।"

"তারপরে?" তুলতুল থামতেই অশোক বলে ওঠে।

"দাঁড়ান।" তুলতুল বলে, "চলে যাচ্ছি এখান থেকে, আরেকবার সব ভাল করে দেখে যাই।" সে চারিদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে।

আমরা যোজিপাল পার হচ্ছি। এখন সকাল পৌনে ন'টা। তার মানে একঘণ্টায় তিন মাইল এসেছি। পিস্থ টপ্ এখান থেকে দু-মাইল।

"অশোকদা শুনুন!" তুলতুল হঠাৎ বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, বলো!" অশোক এগিয়ে আসে তুলতুলের কাছে।

আমাদের অষ্টাদশী সহযাত্রী আবার শুরু করে, "পৌঁছলাম পঞ্চতরণী। আর মাত্র চার মাইল। কাল সকালেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছব। কিন্তু সেই গুহা তো আমার আসল লক্ষ্য নয়। তবু কেমন যেন একটা কৌতূহল হচ্ছিল। মনে মনে কল্পনা করছিলাম গুহা কেমন হয়? বরফের শিবলিঙ্গ—সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

গতকাল সকাল সকাল রওনা হলাম। সবচেয়ে খাড়া রাস্তা পার হলাম। পথে একটা গ্লেশিয়ার পড়ল। বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা একটা রীতিমত উত্তেজনার ব্যাপার। সত্যি বলতে কি প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিল—যদি পড়ে যাই। কিন্তু পার হতে গিয়ে ভয় কেটে গেল।

অবশেষে পৌঁছলাম সেখানে। কী বিরাট গুহা! আমার কল্পনার সঙ্গে একেবারেই মিলল না। মনে হল—এ আমি কোথায় এলাম?

তবু সবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। গুহায় ঢুকলাম। বরফের শিবকে স্পর্শ করলাম, পুজো করলাম।

সবই করলাম। কিন্তু তখন আমার মনের ভাব যে ঠিক কেমন হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। কিছু বিস্ময়, কিছু ভাল লাগা, কিছু আনন্দ এবং কিছু বেদনা—সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল আমার।…"

থামল তুলতুল। মনে হচ্ছে ওর আরও অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু বলতে পারল না।

এই হয়। হিমালয়ের সব কথা বলা যায় না। বলার চেয়ে না-বলা বেশি থেকে যায়।

না, তুলতুল আবার কথা বলে। বলে, "আজ কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগছে। যাবার বেলায় পথের পাশে পাশে যাদের ফেলে ফেলে চলে গিয়েছি। তাদের আবার নতুন করে কাছে পাচ্ছি। সেই ভৈরবঘাটি পঞ্চতরণী মহাগুণাস ও পৌষপাথর, সেই শেষনাগ ও এই যোজ্ঞিপাল। আবার দেখা হবে পিস্থুর সঙ্গে। ভারী ভাল লাগছে। কিন্তু…"

আবার থামে তুলতুল। আমরা তার মুখের দিকে তাকাই।

একটু বাদে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "কিন্তু এই ভাললাগার মাঝে মিশে আছে একটা মন-কেমন-করা ভাব। এবারে যে ঘরে ফিরছি। আর তো আসব না এদের কাছে। তবে এরা সবাই সর্বদা রয়ে যাবে স্মৃতিতে—আমার মনের মুকুরে।…"

আর কিছু বলতে পারে না তুলতুল। আমাদেরও নেই কোন জিজ্ঞাসা। ওর কথার সঙ্গে আমার কথাও যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া কথা বলবার আর অবকাশও নেই। আমরা যে পৌঁছে গিয়েছি পিস্থু টপে। এবারে একটু বসতে হবে। চা খেতে হবে। একটানা পাঁচ মাইল হাঁটা হল। দু-ঘণ্টা লেগেছে। এখন সকাল পৌনে দশটা।

চা খেয়ে নিয়ে উৎরাই ভাঙা শুরু করা গেল। সেদিনের চড়াই আজ উৎরাই হয়েছে। তুলতুল মায়া ব্রহ্মচারী অশোক এমনকি মামা পর্যন্ত ছুটে ছুটে নামছে। অসীম ও গৌরীর সঙ্গে আমি অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে চলেছি। তাহলেও একটানা উৎরাই। চন্দনবাড়ি পর্যন্ত তিন মাইল পথ যেতে একঘণ্টাও লাগবে না।

চলতে চলতে অসীমকে বলি, "অনেকের কথাই শুনলাম। তুমি তো বললে না কিছু?"

"কি আর বলব? ভাল লেগেছে, এটুকুই বলতে পারি।" অসীম উত্তর দেয়।

"না, না—এভাবে শুনতে চাইছি না আমি। আগে বলো, কেন এলে অমরনাথে?"

"আপনাকে তো বলেছি ঘোষদা, বাবা রেলে চাকরি করতেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গে বহু বেড়িয়েছি। পাঁচ-বছর বয়সে চাঁদের আলোয় দিলওয়ারা মন্দির দেখার আবেশ আজও আমার মনে বাসা বেঁধে আছে। তাই শৈশবেই ভ্রমণের নেশা আমাকে পেয়ে বসে। পরে সেই নেশা পেশায় পরিণত হল। আপনি তো জানেন, 'ট্যুর' করাই আমার প্রধান কাজ।"

আমি মাথা নাড়ি।

অসীম বলতে থাকে, "গত পনেরো বছর দেশে-বিদেশে বহু বেড়ালাম। কিন্তু দেখলাম কর্মব্যস্ত সেই সব সুখ-ভ্রমণের কথা প্রায় সবটাই হারিয়ে যায়। তবু হিমালয়ের কথা কিছু মনে থাকে। এর আগে তিনবার কাশ্মীরে এসেছি। প্রতিবারই প্লেনে। তারই মধ্যে একবার বলতাল থেকে ঘোড়ায় চড়ে অমরনাথ দেখে ফেলেছিলাম। সেই সুখস্মৃতি মনের মাঝে সজাগ হয়ে রইল। তখুনি ঠিক করেছিলাম একবার ট্রেন ও বাসে চড়ে আসতে হবে কাশ্মীর, পায়ে হেঁটে প্রচলিত পথে যেতে হবে অমরনাথ। আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে।

সত্যি বলছি, আমার বড় ভাল লেগেছে এই যাত্রা। আর এ ভাল লাগা সেই প্রথম দিন থেকেই। উঁচুতলার মানুষ আমি নই, কিন্তু পেশার জন্য উঁচুতলাতেই থাকতে হয় সর্বক্ষণ। সেখানে দেখেছি ভ্রমণের পরেও সঙ্গীরা Mr. X, Mr. Y কিংবা Mr. Z থেকে যান। আর এ যাত্রায় প্রথম দিনেই কেউ আমার দাদা কিংবা মামা হয়েছেন অথবা আমি কারও ভাই কিংবা ভাগনে হয়েছি। সেদিন থেকেই সহযাত্রীদের সবার প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করে আসছি।

সত্যি বলতে কি, প্রথম দিকে মনে একটা ভয় ছিল—হয়তো পারব না, হয়তো শেষ পর্যন্ত ঘোড়া নিতে হবে। কিন্তু প্রথম দিনে দশ মাইল হেঁটে অনায়াসে চন্দনবাড়ি এলাম, পৌঁছে গেলাম এক নূতন দেশে। পরদিন পিস্থু পার হলাম। না, পথ তো তেমন দুর্গম নয়। আত্মবিশ্বাসে আমার মন ভরপুর হয়ে উঠল—আমি পারব, নিশ্চয়ই পারব।

তারপর থেকে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে পথ চলেছি। ওপরে উঠেছি, আর দেখেছি আকাশের রং বদলাচ্ছে। ভেবেছি—সমতলের মানুষ তো এমন সুনীল আকাশ

কল্পনাও করতে পারে না। রাতের আকাশে চাঁদের সুশীতল উজ্জ্বলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হিমালয়ের নিস্তব্ধ অথচ প্রাণময় প্রকৃতি আমাকে বার বার হিমেঢাকা উত্তরমেরু ও তপ্তউজ্জ্বল সাহারার রাতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন সকালে উঠে মনে হয়েছে—এইবা বুঝি সৃষ্টির প্রথম প্রভাত।

অবশেষে পৌছলাম অমরনাথ। দর্শন করে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে। চারিদিকে তাকালাম। মনে হল আমি অন্য এক গ্রহে রয়েছি। আমার সামনে, যতদূর দেখা যায় Vast barren twisted stretches of rocks, enduring through endless centuries.

সেই হিমেল হাওয়ায় আদিম যুগের পাথরদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার তখন মনে হয়েছিল অমরনাথ কোন কোমল অনুভূতির স্থান নয়, রাধা-কৃষ্ণের ব্রজলীলা সেখানে অচল। অমরনাথ শিবক্ষেত্র, মহাশক্তির মহানতীর্থ। সংসারে কেউ আমার নয়, আমি একা। আমি সেই মহাশক্তির মাঝে মিশে যেতে চাইলাম।"

থামল অসীম। ইতিমধ্যে আমাদের উৎরাই পথ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা নেমে এসেছি পিস্থু চড়াই থেকে। চন্দনবাড়ি এসে গেল বলে।

অসীম নিঃশব্দে পথ চলেছে, গৌরীও কোন কথা বলছে না! সে আজ সকাল থেকে বড় বেশি নীরব। কি যেন ভেবে চলেছে মনে মনে। নীলগঙ্গার শব্দ শুনতে শুনতে আমিও নীরবে পথ চলেছি।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে অসীমকে বলি, "আচ্ছা, সুধালিঙ্গ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে কিছু ভেবেছো?"

"নিশ্চয়ই।" অসীম উত্তর দেয়। বলে, "আপনারা দেখেছেন, গুহার ছাদ চুইয়ে তুষারলিঙ্গের মাথায় ওপর থেকে ফোঁটাফোঁটা জল পড়ছে।"

আমি মাথা নাড়ি।

অসীম বলতে থাকে, "ঐ জলই জমছে। জমছে দুভাবে—ওপর থেকে তুষারদণ্ডের আকারে নিচে নামছে আর গুহার মেঝে থেকে তুষারদণ্ড ওপরে উঠছে। কয়েকদিন বৃষ্টি হয় নি বলে আমরা মাত্র সাড়ে তিনফুট তুষারলিঙ্গ দেখে এলাম, বৃষ্টি হলে আরও বড় লিঙ্গ দেখতে পেতাম।"

একটু থেমে অসীম আবার বলতে থাকে, "বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ icicle বা তুষারদণ্ডকে বলে Stalactite ও Stalagmite. স্ট্যালাক্টাইট সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য—ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত তুষারদণ্ড সৃষ্ট হয়। আর স্ট্যালাগ্‌মাইট সম্পর্কে তাঁরা বলেন—ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে গুহার মেঝে থেকে সৃষ্ট তুষারদণ্ড ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠতে থাকে। এই

দুটি পদ্ধতিতে সৃষ্ট তুষারদণ্ড মিলিত হয়েই সৃষ্টি করেছে তুষারলিঙ্গ।"

"কিন্তু অসীমদা!" গৌরী কথা বলে এতক্ষণে, "স্ট্যালাগ্‌মাইট তো হয় Conical মোচাকৃতি, তুষারলিঙ্গের মাঝখানটা তো তেমন নয়?"

"না হবার কারণ বায়ুপ্রবাহ। এই গুহাটির এমন অবস্থান যে সামনের উপত্যকা থেকে সর্বদা তার ভেতরে হাওয়া ঢুকছে। প্রকৃত পক্ষে গুহাটাও সৃষ্ট হয়েছে হাওয়ার জন্য। কিন্তু সেকথা যাক্‌ গে, যেকথা বলছিলাম—অবস্থানের জন্য গুহাটির ভেতরে সর্বদা বাতাস ঢোকে। কিন্তু গুহা থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবার অন্য কোন পথ নেই। কাজেই ভেতরে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে সে বাতাস গুহামুখ দিয়েই বেরিয়ে আসে। আবার নতুন বাতাস ঢোকে, আবার ঘুরপাক খেয়ে বেরিয়ে আসে। বায়ুপ্রবাহ তুষারলিঙ্গটিকে পরিক্রমা করে চলে। আর তারই ফলে মোচাকৃতি স্ট্যালাগ্‌মাইট গোলাকার তুষারলিঙ্গে পরিণত হয়।"

বেলা সাড়ে দশটায় চন্দনবাড়ি পৌছলাম। সঙ্গীরা সেই তাঁবুর সামনেই বসে আছে। না, বসে নেই—ওরা খাচ্ছে।

লাঠি ও হ্যাভারস্যাক্‌ রেখে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম। খাবার এসে গেল। পৌনে তিন ঘণ্টায় আট মাইল পাহাড়ী পথ পেরিয়েছি। বেশ খিদে পেয়েছে।

পঞ্চতরণী ও শেষনাগের মতো ফকিরবাবু চন্দনবাড়ির এই তাঁবুগুলিও ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। গাঙ্গুলিরাও আমাদের মতো এখানে থেকে গিয়েছে। এর পরে ফকিরবাবুর আরও দু-দল যাত্রী আসবেন। তাঁরাও এখানে রাত্রিবাস করবেন।

খাওয়াটা ভালই হল। কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর ব্যবস্থাপনা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে এজন্য ওঁদের সবাইকে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। মিসেস মণ্ডল গতকাল পঞ্চতরণীতে রয়ে গিয়েছেন। আর ফকিরবাবু আজ আমাদের সঙ্গে চলেছেন পহেলগাঁও। পরশু পরের দলকে নিয়ে আবার ওপরে আসবেন।

জ্যোতির্ময় সিগারেট কিনতে দোকানে গিয়েছিল। খবরটা পেয়েই ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। জানালো, "একটা 'ট্রাক্‌' পাওয়া গিয়েছে। মাল নিয়ে এসেছিল, এখন খালি ফিরে যাচ্ছে পহেলগাঁও। আমি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছি। সে চল্লিশজন যাত্রী নিয়ে যেতে রাজী আছে। জনপ্রতি দশটাকা করে ভাড়া লাগবে।"

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বলাবাহুল্য পদাতিকদের চেয়ে অশ্বারোহীদের উৎসাহ বেশি। তাঁরা ঘোড়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন। আর বটেই তো সহজ হলেও দশ মাইল রাস্তা। গাড়ি পেলে কে আর ঘোড়ায় চড়ে?

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ লেখা থাকলে, কে তা মুছতে পারে? অশোক দুঃসংবাদ নিয়ে এলো, "পহেলগাঁও-চন্দনবাড়ি মোটরপথ এখনও যাত্রী পরিবহনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া গতকাল বিকেলে এ অঞ্চলেও বেশ বৃষ্টি হয়েছে। কাঁচা রাস্তা, খুবই কাদা হয়েছে কোথাও কোথাও। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাঁরা ট্রাক্-এ কোন যাত্রী যেতে দেবেন না।"

তাঁরা ভাল কথাই বলছেন। কিন্তু ঘরমুখো তীর্থযাত্রীরা কি সহজে সে নির্দেশ মেনে নিতে পারেন। অতএব পুলিশ অফিসারের কাছে 'ডেপুটেশন' গেল।

কোন ফল হল না। ভদ্রলোক নাকি খুবই কড়া। তিনি বলেছেন— যাতে কেউ জীবন সংশয় করে ট্রাক্ কিংবা জীপ-এ না উঠতে পারেন, তা দেখার জন্যই আমি এখানে রয়েছি।

সংসারে কর্তব্যপরায়ণ মানুষগুলো মাঝে মাঝেই এমনি নির্দয় হয়ে পড়েন।

অগত্যা আবার শ্রীচরণের শরণ নেওয়া গেল। আর পুল পেরিয়েই বুঝতে পারলাম, পুলিশ অফিসার ঠিক কাজই করেছেন। গাড়ির পক্ষে পথ সত্যই বিপজ্জনক। যেমন কাদা, তেমনি পেছল। তার ওপরে আবার বাঁকগুলো এখনও ঠিকমত তৈরি হয় নি। নামার সময় সামনে-পেছনে করে গাড়িকে আস্তে আস্তে মোড় ফেরাতে হয়। তখন একটু এদিক-ওদিক হলেই সবশেষ।

গৌরীর আজ কি যেন হয়েছে? সকাল থেকে সে কেবল পেছিয়ে পড়ছে। তাহলেও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কারণ চন্দনবাড়িতে সে দাম মিটিয়ে ঘোড়াওয়ালাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

সঙ্গীদের ইসারায় এগিয়ে যেতে বলি। আমি গৌরীর সঙ্গে হাঁটতে থাকি। আমরা নীরবে পথ চলেছি।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ গৌরী কথা বলে। প্রশ্ন করে, "আচ্ছা শঙ্কুদা, আপনি তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না—অমরনাথ যাত্রা আমার কেমন লাগল?"

এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু উত্তর দিই, "ভেবেছিলাম পরে জিজ্ঞেস করব।"

"কিন্তু পথের কথা, পথে বসে শোনা ভাল নয় কি?"

"বেশ বলো।"

গৌরী চুপ করে আছে। আমি ওর দিকে তাকাই। তার চোখদুটি অশ্রুসজল। গৌরী কাঁদছে! কিন্তু কেন? গত বছর আমরা এক সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিলাম। ওর মা আমাদের সঙ্গে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন। তবু আমি যে ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। শুধু জানি সে শিক্ষিতা আর আধুনিকা হয়েও খুবই ভক্তিমতী।

"শঙ্কুদা!..."

গৌরী বলতে শুরু করেছে। আমি চলতে চলতে শুনি।

গৌরী বলছে, "ছোটবেলা থেকেই আমি সুদূরের পিয়াসী। কেন জানি না, আমার কেবলি মনে হতো, আমি যেন কোন এক অদৃশ্য সৌন্দর্যলোক থেকে নির্বাসিত হয়ে মাটির পৃথিবীতে এসে জীবনযন্ত্রণা ভোগ করছি। আমার মন এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইতো। মনে হতো আমার মুক্তি মুক্ত-আকাশের নিচে। ভগবান আমাকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেন না। প্রায় প্রতি বছর মা-বাবার সঙ্গে আমি বেড়াতে বের হতাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

১৯৬২ সালে আমার জীবনের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে প্রকৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চাইলাম।" থামল গৌরী।

আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। সে আবার শুরু করে, "শঙ্কুদা, মেয়েরা জীবনে যা চায়, আমি তা সবই পেয়েছিলাম। বোধহয় একটু বেশি করেই পেয়েছিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা রূপ অর্থ ও যশে সে ছিল আদর্শপুরুষ। তার ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। আর তাই হয়তো ভাগ্য বাদ সাধল, অত সুখ আমার কপালে সইল না। বিয়ের দু-বছর পরেই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সে চলে গেল চিরকালের মতো। সে শিবলোক থেকে এসেছিল, শিবলোকেই চলে গেল। তার নামও ছিল বিশ্বনাথ।

তারপর থেকে আমার জীবনের একই ইতিহাস। আমি শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি। শান্তির জন্য লেখাপড়া করলাম, চাকরি করলাম কিন্তু শান্তি পেলাম না। সবসময় আমার মন কেবল সেই একজনকেই কাছে পেতে চাইতো।

এই ভাবে তেরো বছর কেটে গেল। কিন্তু কোথাও শান্তি পেলাম না। অবশেষে আমার দিদিমা একদিন আমাকে কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শনের পরামর্শ দিলেন। তিনি আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

দিদিমার আশীর্বাদ মিথ্যে হয় নি শঙ্কুদা, আমি ১৯৭৫ সালে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখী গিয়েছি। গতবছর আপনাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছি। এবছর বাবার দয়ায় তাঁকে দর্শন করতে পারলাম।"

থামল গৌরী। এখনও যে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। তার পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে। কথায় ব্যস্ত রেখে ওকে আমার পহেলগাঁও নিয়ে যেতে হবে। তাই আবার বলি, "যাত্রাপথে তোমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলো।"

গৌরী আবার শুরু করে, "এবারে কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে আমাকে এক সন্ন্যাসিনী আশীর্বাদ করলেন—গৌরী, অমরনাথে তোমার কি দর্শন হয়, দেখো।

কলকাতা থেকে পহেলগাঁও আসার পথে তাই বারবার ভেবেছি—কি দর্শন হবে আমার? কাকে দর্শন করব অমরনাথের পথে?

আপনার মনে আছে শঙ্কুদা, সেদিন পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি আসবার সময়ও আমি এমনি পেছিয়ে পড়েছিলাম? অনেকক্ষণ আপনাদের সঙ্গে পথ চলি নি?"

"হ্যাঁ, আমরা তোমার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।"

"তখুনি তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

"কাদের সঙ্গে?"

"আপনারা এগিয়ে গিয়েছেন। আমি তখন একা একা পথ চলেছি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে সামনে পথ চলেছেন কৌপিন পরা তিনজন সন্ন্যাসী। তাঁদের দু-জন মধ্যবয়সী আর একজন বছর তিরিশের যুবক। তিনি দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। তাঁর উন্নত নাসিকা, টানাটানা চোখ ও ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল।

তিনি হঠাৎ পেছিয়ে এলেন আমার কাছে, মধুর স্বরে আমাকে উৎসাহিত করে পথ চলতে থাকলেন। কথায় কথায় জানালেন তিনি মির্জাপুরের মানুষ। ডাক্তারী পড়তে পড়তে হঠাৎ সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কয়েকদিন আগে তিনি বৈষ্ণোদেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে অমরনাথ দর্শনের স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন। তিনি চলতে চলতে আমাকে বৈষ্ণোদেবীর মাহাত্ম্য শোনালেন।

কিছুক্ষণ বাদে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খেতে ডাকলেন। তাঁরা একটা ঝরণার ধারে বসে রুটি খাচ্ছিলেন। যুবক সন্ন্যাসী আমাকে বললেন—তোমারও তো খিদে পেয়েছে, তুমিও এসো না! আমাদের সঙ্গে ভোজন করবে।

জনবিরল পথ। আমি একা। আমি ভয় পেলাম। বললাম—না। আমি এগিয়ে যাই। চন্দনবাড়িতে আমার খাবার রয়েছে। তিনি হেসে বললেন—আচ্ছা, যাও। সাম্‌কো ফির মিলেঙ্গে।

আমার ভয় ভাঙল না। ভাবলাম এঁরা কাঁরা, সন্ন্যাসী না ভণ্ড?

খাওয়া-দাওয়ার পরে চন্দনবাড়িতে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম। সেই সন্ন্যাসী, একেবারে তাঁবুর ভেতরে চলে এসেছেন। মেয়েদের তাঁবু। আমার সঙ্গীরাই বা কি ভাবছেন?

তবু আমি তাঁকে বসতে বললাম। তিনি বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বললেন কিছুক্ষণ। তারপরে জানালেন—আমরা আজই শেষনাগ চলে যাচ্ছি।

অবাক হলাম! বর্ষাকাল, ওঁদের কাছে আলো নেই। পিস্থু চড়াই সহ আট মাইল দুর্গম পথ পেরোতে হবে। অথচ সেই সন্ধ্যেবেলা ওঁরা শেষনাগ রওনা হচ্ছেন? কিন্তু জানতাম 'না' করে কোন লাভ হবে না। ওঁর মা ও বোনেরা নিশ্চয়ই ওঁকে সন্ন্যাসী হতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি তাঁদের কথা শোনেন নি।

আমি শুধু তাঁকে প্রণাম করলাম। বললাম—তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট, তবু আমাকে আশীর্বাদ করো।

তিনি একটু হাসলেন। মধুর স্বরে বললেন—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বোধহয় বড় হব।

এবারে আমি হাসলাম। বললাম—তোমার বয়স কত?

তিনি সহাস্যে জানালেন—পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে।

বিস্মিত হলাম। কারণ দেখে তাঁকে তিরিশ বছরের যুবক বলে মনে হয়। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল। তারপরে বললাম—তুমি তো যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী, তুমি নিশ্চয়ই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার অতীত ও ভবিষ্যতের সবকথা বলে দিতে পারো?

তিনি আবার একটু হাসলেন। শুধু বললেন—ফির মিলেঙ্গে। তারপরে সেই গোধূলি বেলাতেই সঙ্গীদের সঙ্গে খালিপায়ে ও খালিগায়ে শেষনাগের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

পরদিন আমাদের পদযাত্রার সঙ্গী হলেন, "অশীতিপর এক বৃদ্ধ বাঙালী সন্ন্যাসী।..."

"সেই তারাপীঠের সাধুবাবা?" জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ।" গৌরী উত্তর দেয়। সে বলতে থাকে, "মনে তখন একটাই ভয়—শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে তাঁর চরণে পৌঁছতে পারব তো? সেই সাধুবাবাকেও প্রশ্নটা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন—পারবি না কিরে? তুই আমার মা, আমার তারা-মা। তোর কাছে তো তিনি সহজলভ্য। তুই আমাকে আশীর্বাদ করে যা মা, আমি যেন তাঁর দর্শন পাই।

পরন্তু পঞ্চতরণীর পঞ্চনদীর কাছে নেমে দেখি আমি একা, আপনাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। হঠাৎ কোথা থেকে সেই সুপুরুষ সন্ন্যাসী এসে সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি সেদিন সকালে পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়ে অমরনাথজীকে দর্শন করে ফিরে চলেছেন শেষনাগ। সারাদিন খাওয়া হয় নি কিছু, শেষনাগ পৌঁছে আটা যোগাড় করে রুটি বানিয়ে খাবেন। আমার সঙ্গে একটা আপেল ছিল। প্রণাম করে সেটি তাঁর হাতে দিলাম। খেতে খেতে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন—তোমার জয় হোক। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—বৈষ্ণোদেবী স্বপ্নে তোমাকে যেভাবে বাবাকে দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে কিছু মিলল কি? তিনি উত্তর দিলেন—সব মিলে গিয়েছে। আমি ঠিক সেইভাবে তাঁকে দর্শন করেছি।

তিনি কিন্তু বিদায় নিলেন না। আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁবুতে এলেন। বললেন—তুমি পরিশ্রান্ত। খাটিয়ায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি তাঁকে খাটিয়ায় বসতে বললাম। তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে মাটিতে বসে পড়লেন। মনে করার কিছু নেই ওঁরা যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী।

যাই হোক, আমি ওঁকে কিছু দান দিতে চাইলাম। উনি বললেন—বোনের কাছ থেকে দান নিতে নেই। অনেক অনুরোধের পর, হয়তো আমাকে শান্তি দেবার জন্যই, তিনি অনুগ্রহ করে টাকা-কয়টি গ্রহণ করলেন। তারপরে নিজের কমণ্ডলু থেকে অমরনাথের অমৃতবারি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন—ইত্‌ নাহি কহনা হ্যায় যাহা ভী যানা হ্যায় উঁহা যাও। একটা লালসুতো আমার বাঁহাতের কব্জিতে বেঁধে দিয়ে আবার বললেন—মঙ্গলবার তক্‌ পেঁয়াজ-লহ্‌সুন মৎ খানা। কিসী না কিসী রূপ মে ভগবান কা দর্শন পাওগে।

সেদিন বিকেলে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল। সন্ধ্যার একটু আগে হঠাৎ তাঁবুতে বসে শুনতে পেলাম—আমার তারা-মা! কোথায় আমার তারা-মা? তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে বেরুতেই তারাপীঠের সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সামনে পড়ে গেলাম। আর তিনি আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে আমার পা-দুখানি জড়িয়ে ধরলেন।

ওখানে আরও অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি কোনমতে পা ছাড়িয়ে নিলাম। লজ্জা ভয় ও দুঃখে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি একি করলেন বাবা? তিনি হাসতে হাসতে বললেন—কিরে বেটি? পারলি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে, শেষ পর্যন্ত ধরা তো পড়ে গেলি। আমি সব জানি। তুই আমার তারা মা!

গতকাল যখন পবিত্র গুহায় পৌঁছলাম, তখন সহসা এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতিতে আমার মন ভরে উঠল। মনে হলো আমি একা হলেও একা নই। আমি আছি, অমরনাথ আছেন। আর অমরনাথের মাঝেই মিশে আছে আমার বিশ্বনাথ। শুধু সে আছে, আর কেউ নেই। রয়েছে আমার মনের মন্দিরে—গুহাতীর্থ অমরনাথে।

গুহা থেকে নেমে এলাম নিচে। দেখা হল অমলাদি ও অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে। অমলাদি বললেন—সেই সন্ন্যাসী সত্যি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন। আমি প্রশ্ন করলাম—তারাপীঠের সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী? তিনি বললেন—না গো না, তোমার সেই মির্জাপুরের সন্ন্যাসী, যাঁকে কাল তুমি দান দিলে। আমি বললাম—তাঁকে আবার আজ কোথায় দেখলেন? অমলাদি উত্তর দিলেন—কেন, গুহায়। তিনিই তো দু-বাহু দিয়ে ভিড় আগলে রেখে তোমাকে অতক্ষণ বসে পুজো করবার সুযোগ করে দিলেন। আমি প্রশ্ন করলাম—আপনি ঠিক দেখেছেন? —নিশ্চয়। অমলাদি বললেন—আমি কেন, সবাই দেখেছে। তুমি জিজ্ঞেস করো এদের।

না। কাউকে জিজ্ঞেস করি নি কিছু। তবে তারপর থেকে মনে মনে সেই একই কথা ভেবে চলেছি—তাঁর যে সেদিনই পঞ্চতরণী থেকে শেষনাগ চলে আসার কথা! তাছাড়া তিনি তো দর্শন করেই এসেছিলেন, তাহলে আবার কেন অমরনাথ গেলেন? আর গেলেনই যখন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল না কেন? এমনকি গুহাতেও আমি দেখতে পাই নি তাঁকে। অথচ তিনি নাকি আগাগোড়া আমাকে আগলে রেখেছেন।

সারাপথে আমি তাই তাঁর কথাই ভেবে চলেছি শঙ্কুদা! বার বার মনে পড়ছে সেই সন্ন্যাসিনীর আশীর্বাদ—গৌরী, অমরনাথে তোমার কি দর্শন হয় দেখো।

দেখেছি। কিন্তু কিছুই যে বুঝতে পারছি না। কেবলই ভাবছি—কে এই সন্ন্যাসী? পবিত্র গুহায় স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর দর্শন পেয়েছিলেন, তিনিই কি সেই সুপুরুষ সন্ন্যাসীর রূপে আমাকে করুণা করে গেলেন?"

পহেলগাঁও। সেই পরিচিত পহেলগাঁও। আমরা ফিরে এসেছি।

সেই পুল পেরিয়ে রামজী মন্দির আর ময়দান। সেই বাজার ছাড়িয়ে ট্যুরিস্ট অফিস আর বাসস্ট্যাণ্ড।

তারপরে পাইনবনের পাশে পাশে সেই মসৃণ পথ, আস্তে উঠে গিয়েছে নিউ পাইন ভিউ হোটেলে—পাঁচদিন আগে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল পরমপ্রার্থিত পদযাত্রা। আর কয়েক মিনিট পরে আজ সেখানেই শেষ হবে আমার অমরতীর্থ অমরনাথ পদপরিক্রমা।

কিন্তু ওভাবে ছুটে আসছে কে?

অজিত নয়!

হ্যাঁ। অজিতই তো! চন্দনবাড়ি থেকে আমি আর গৌরী আস্তে আস্তে পথ চলেছি। ওরা তাই অনেক আগে পৌঁছে গিয়েছে হোটেলে। কিন্তু সে অমন করে ছুটে আসছে কেন? উৎরাই পথ। অজিত যে ব্লাডপ্রেসারের রোগী! কার কাছে ছুটে আসছে সে? আমার কাছে কি?

অজিত আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাত বাড়ায়। বলে, "ঘোষদা! আপনার টেলিগ্রাম। খুলে দেখুন তো। মনে হচ্ছে গৌতমের খবর।"

টেলিগ্রাম! গৌতমের খবর! কি খবর? আমার হাত কাঁপছে।

গৌরী আমার হাত থেকে টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নেয়। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে। পড়ে—

'MYSELF WILL BE ATTENDING SCHOOL FROM NEXT WEEK (.) FOLLOW YOUR PROGRAM

—GOUTAM'

টেলিগ্রামটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিই। আবার পড়ি, ভাল করে দেখি। একবার নয়, দু-বার নয়, বারবার।

ভাল হয়ে গিয়েছে। আমার গৌতম ভাল হয়ে গিয়েছে। সে নিজেই টেলিগ্রাম করেছে। আমাকে আমার ভ্রমণসূচী অনুসরণ করতে লিখেছে। সে আগামী সপ্তাহ থেকে স্কুলে যাবে।

আগামী সপ্তাহ? আবার টেলিগ্রামটা দেখি। ১৯শে আগস্ট টেলিগ্রাম করেছে, এখানে এসে পড়েছিল এতদিন। আমরা যেদিন এখান থেকে পদযাত্রা শুরু করেছি, সেই শুক্রবারেই সে টেলিগ্রাম করেছে। আজ ২৩শে অগাস্ট মঙ্গলবার। তার মানে সে গতকাল থেকে স্কুল করছে।

চোখদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। গতকাল সুধালিঙ্গের সামনে যেমন করে কেঁদেছিলাম, তেমনি করে কাঁদতে কাঁদতে আজ আবার তাঁকে বলি—ঠাকুর! তুমি আমার কথা রেখেছো। যেদিন এখানে বসে আমি তার ভাল-মন্দের সব দায়িত্ব তোমার ওপরে ন্যস্ত করেছিলাম, সেদিনই তুমি তাকে ভাল করে

ভুলেছো। নইলে পরদিন সে আমাকে টেলিগ্রাম পাঠাবে কেমন করে? আমি বুঝতে পারি নি ঠাকুর! আমি তোমাকে তেমন করে বিশ্বাস করতে পারি নি বলেই তোমাকে বারবার বিরক্ত করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

অমিত অমরনাথ! গতকাল তোমার সুধালিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে কামনা করেছিলাম—পহেলগাঁয়ে ফিরে এসে আমি যেন তার কুশল সংবাদ পাই। তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছো। গতকাল থেকেই সে স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

অমিয় অমরনাথ! তুমি স্বামী বিবেকানন্দজীকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলে। তোমার সুধালিঙ্গ দর্শনের পরে তাই স্বামীজী বলেছিলেন—'The effects will come.' তাঁর সেই অমরবাণীও অমরতীর্থ অমরনাথে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। জীবনে আমি তোমার আরও অনেক তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু এমন প্রত্যক্ষভাবে আর কোন তীর্থদর্শনের ফল লাভ করি নি।

অমৃতময় অমরনাথ! তুমি আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম গ্রহণ করো। তোমার স্নেহময় পুণ্যস্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে রইল।

অমরনাথ যাত্রার পথপঞ্জী

পহেলগাঁয়ের পথে

১/৩ দিন কলকাতা থেকে পহেলগাঁও (৭,৫০০´) রেল ও বাসযোগে

৪ „ পহেলগাঁয়ে বিশ্রাম ও যাত্রার আয়োজন

৫ „ পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি (৯,০০০´) হাঁটাপথে ১০ মাইল

৬ „ চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ/বায়ুযান (১২,৫০০´) হাঁটাপথে ৮ মাইল
(পথে পিসু চড়াই)

৭ „ বায়ুযান থেকে পঞ্চতরণী (১১,৫০০´) হাঁটাপথে ৮ মাইল
(পথে মহাগুণাস গিরিবর্ত্ম ১৪,৫০০´)

৮ „ পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথ (১৩,৫০০´) হাঁটাপথে ৪ মাইল
অমরনাথ থেকে বায়ুযান হাঁটাপথে ১২ মাইল

৯ „ বায়ুযান থেকে পহেলগাঁও হাঁটাপথে ১৮ মাইল

১০ „ পহেলগাঁয়ে বিশ্রাম

১১/১৩ „ পহেলগাঁও থেকে কলকাতা

যাত্রাকাল—মূল-যাত্রা হয় শ্রাবণী পূর্ণিমায়। আষাঢ়ী ও ভাদ্র পূর্ণিমাতেও যাওয়া যেতে পারে। তখন কোন সরকারী ব্যবস্থা থাকে না তবে ঘোড়া ডাণ্ডি ও কুলি পাওয়া যায়।

যাঁরা কখনও কাশ্মীর যান নি, তাঁরা ফেরার পথে শ্রীনগর ও সন্নিহিত কাশ্মীর উপত্যকা দেখে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে ৮ম দিনে অমরনাথ দর্শনের পরে বলতালের পথে সোজা শ্রীনগর চলে আসা যেতে পারে। তাতে শ্রম সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। পরবর্তী পথপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

বলতালের পথে

১/৩ দিন কলকাতা থেকে শ্রীনগর রেল ও বাসযোগে
৪ „ শ্রীনগরে যাত্রার আয়োজন
৫ „ শ্রীনগর থেকে সোনামার্গ বাসপথে ৫০ মাইল
সোনামার্গ থেকে বলতাল হাঁটা কিংবা বাসপথে ১০ মাইল
৬ „ বলতাল থেকে অমরনাথ (১৩,৫০০´) হাঁটাপথে ৯ মাইল
৭ „ অমরনাথ থেকে বলতাল
বলতাল থেকে শ্রীনগর বাসপথে
৮ „ শ্রীনগরে বিশ্রাম
৯/১১ „ শ্রীনগর থেকে কলকাতা

এ পথেও আষাঢ় থেকে ভাদ্র পূর্ণিমা পর্যন্ত ঘোড়া ও কুলি পাওয়া যায়।

শ্রীনগর থেকে নিজেদের গাড়িতে গেলে এবং বলতাল থেকে ঘোড়া নিলে একদিনেই অমরনাথ দর্শন করে শ্রীনগর ফিরে আসা যায়। তবে শ্রীনগর থেকে শেষরাতে বেরিয়ে পড়তে হয় এবং ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে যায়।

বর্ণনাক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয়

অনন্তনাগ ৩০

অভেদানন্দ, স্বামী ২৫

অমরগঙ্গা ১৬৭

অমরনাথ (ইতিহাস) ২৫, ৪৪, ৭৫

অমরনাথ (গুহা) (১৩,৫০০´) ১৭১

অমরনাথ (ছড়ি) ৪২

অমরনাথ (তীর্থমাহাত্ম্য) ১৫৭

অমরনাথ (যাত্রা) ৪৩, ৪৭, ৫১, ৬৯

অমরনাথযাত্রা সম্পর্কে সহযাত্রীগণ ১৮১

আপার-মুণ্ডা ২৬, ৩০

ইয়ংহাজব্যাণ্ড, স্যার ফ্রান্সিস ৫৮, ১৭৩

উধমপুর ১২

ওয়াব্‌বল টপ্‌ (১৩,৫০০´) ১৩২

কালিদাস রায় গোষ্ঠীপতি ১৫৩

কাশ্মীর ২৯

কুদ ১৭

কোলাহাই (১১,০০০´) ৩২, ৬১

খানাবল ৩১

চন্দনবাড়ি (৯,০০০´) ৮৪

চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ ৯২-১০৮

জম্মু-তাওয়াই ১০

ট্যানান ৫৯

দানিকেন, ডঃ এরিক ফন ৩১

নিবেদিতা, ভগিনী
১২, ৩৬, ৮৬, ৯৬, ১৭৭

নেভে, আর্থার ১০৩, ১২০, ১৬১

বিষয়

পঞ্চতরণী (১১,৫০০´) ১৩৯

পঞ্চতরণী থেকে অমরনাথ ১৬০—১৭০

পহেলগাঁও (৭,৫০০´) ৩২, ৫৮, ৭১

পিস্থু (১১,২০০´) ৯৫, ১৯০

পৌষপাত্থর (১২,৫০০´) ১৩৩

প্রবোধকুমার সান্যাল ২৫, ৪৯, ৬৯, ৮৬

বলতাল থেকে অমরনাথ ১৪৭—১৫২

বাইসুর‍্যান ৫৯

বাটোট ২০

বানিহাল ২৪, ২৬, ২৮

বায়ুযান (১২,৫০০´) ১০৫

বিবেকানন্দ, স্বামী
১২, ৪৯, ৬০, ৬৯, ১৩৮, ১৭৭

ভৈরবঘাটি (১৩,৫০০´) ১৬৬

মণিমহেশ (১৩,৫০০´) ৪৩

মহাগুণাস গিরিবর্ত্ম (১৭,৫০০´) ১২৮

মার্তণ্ড মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ ৩১

যোজিপাল (১১,৫০০´) ১০২

রামবান ২৪

লিডার ৩২, ৬০, ৭২, ৯০, ১০৬

লিডারওয়াট (৯,৭২০´) ৩২

শেষনাগ হ্রদ (১২,২০০´) ১০৫

শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণী ১২৪—১৪০

সান্তসিংহ (১৩,৫০০´) ১৬৬

সোনাসর হ্রদ ও গিরিবর্ত্ম ১০২

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি—

মহাকবি কল্‌হন	রাজতরঙ্গিনী
নগেন্দ্রনাথ বসু	বিশ্বকোষ
স্বামী অভেদানন্দ	কাশ্মীর ও তিব্বতে
প্রবোধকুমার সান্যাল	দেবতাত্মা হিমালয়
স্বামী দিব্যাত্মানন্দ	পুণ্যতীর্থ ভারত
দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত	একই আকাশ ভুবন জুড়ে
সাক্ষরতা প্রকাশন	বিশ্বকোষ
নবপত্র প্রকাশন	সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ	ভারতকোষ
Sister Nivedita	Notes of some wanderings with Swami Vivekananda
Sir Francis Younghusband	Kashmir
Arthur Neve	The Tourist Guide to Kashmir..
R. C. Arora	New Guide to Kashmir
Fodor India	1976/77

Gazetteer of Kashmir & Ladak

District Census Handbook—1951 & 1971

Handbook of Jammu & Kashmir State and other Tourist Literature

---